প্রেমানন্দ-প্রেমকথা



প্রেমানন্দ-প্রেমকথা

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সারদাসপ্তমী, ১৯৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : আর সাহা, প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী (ব্লক কে-ওয়ান) কলিকাতা-৬

মুখপত্র

লীলাপ্রিয় ভগবানের দুই নিত্যসাথী শ্রীরাখাল ও শ্রীবাবুরাম—ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগলীলায় দুই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাখালকে লইয়া ঠাকুরের বাৎসল্যরসের সম্ভোগ; বাবুরামকে দরদীরূপে পাইয়া তাঁহার মহাভাবোত্থ মাধুর্যরসের আস্বাদন। রাখালকে ঠাকুর ব্রজমণ্ডলের ভিতর দেখিয়াছিলেন; শ্রীবাবুরামও যে ব্রজমণ্ডল হইতেই আসিয়াছিলেন ঠাকুরের উক্তির মধ্যে ইহার ইঙ্গিত বিদ্যমান।

'ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা' প্রকাশিত হইবার পরে 'প্রেমানন্দ-প্রেমকথা' লিখিবার অনুপ্রেরণা আসে। শ্রীবাবুরামের স্বরূপমহিমার অপাবরণকারী, চিত্তচমৎকারী কতিপয় ঘটনাও সেই সময়ে জানিতে পারি। স্বামী গৌরীশানন্দ ঘটনাগুলি জানাইয়া দিয়াছিলেন।

৺কাশীর প্রবীণ সাধুদের কেহ কেহ আমাকে আদেশ করিয়া ও উপকরণ দিয়া দুইবার দুইটি প্রবন্ধ লিখাইয়াছিলেন (১৯২৬-২৭), বাবুরাম মহারাজের জন্মদিনে পাঠ করিবার জন্য। দুইটি প্রবন্ধই উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়। ঐ দুই প্রবন্ধের যাবতীয় উপকরণ এবং অন্যান্য লেখকগণের রচনার বিশেষ বিশেষ অংশ প্রেমকথায় গৃহীত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। তথাপি ইহার অনেক উপাদানই নূতন, এবং শ্রীবাবুরামের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিবার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। নূতন উপাদানগুলিকে সংরক্ষণ করিবার জন্যও প্রেমকথা লেখার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের অনেক অপূর্ণতা দূর করিয়াছেন আমার স্নেহশীল শিক্ষক ও গুরুভ্রাতা শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার অন্তর্মুখ জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দিয়া; আর ইহার প্রকাশন-ব্যাপারে নানাভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন বন্ধুবর শ্রীশশিভূষণ রায় তাঁহার উদার মনের অনুপম উৎসাহ নিয়া।

লেখার মাধ্যমে মহাপুরুষচরিতাস্বাদনের দুর্লভ সৌভাগ্য আমার জীবনে আর আসিবে বলিয়া মনে হয় না। আয়ু-সূর্য অস্তাচল-অভিমুখে ছুটিয়াছেন সকল শক্তির উপসংহার সূচিত করিয়া। বিপর্যস্ত জীবনের বত্রিশ বছর ধরিয়া যাঁহাদের গুণমহিমা স্মরণ-কীর্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, শেষের দিনগুলিতে তাঁহাদের কৃপাবিন্দু একমাত্র ভরসা। নিবেদনমিতি।

শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য

সূচীপত্র

প্রেমানন্দ-প্রেমকথা

পরিচয়

'বাবুরামকে দেখলুম দেবীমূর্তি—গলায় হার, সখী সঙ্গে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'ও নৈকষ্য কুলীন, হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।' আরও বলিয়াছেন, 'ও রত্নপেটিকা।' সূত্রাকারে ইহাই শ্রীপ্রেমানন্দের স্বরূপ-পরিচয়।

তাঁহার তিরোভাবের পর শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসূত্রের ভাষ্যকার শ্রীসারদানন্দ বলিয়াছেনঃ ঠাকুরের মহাভাবের সময় বাবুরাম মহারাজ ভিন্ন আর কেউ তাঁকে ছুঁতে পারতেন না। স্বামিজী, মহারাজ এঁরা সকলেই বীরভাবের সাধক। বাবুরাম মহারাজের মনে পুরুষোচিত কোন ভাব ছিল না, তাই হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। ঠাকুরের লীলাসহচররূপে বাবুরাম মহারাজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে স্বামিজীও নাই, আমাদের কা কথা। তোমরা বাবুরাম মহারাজের কথা যত বেশী চিন্তা করবে ততই তোমাদের কল্যাণ হবে।

সৌভাগ্যবশতই মরুদা (ভাগবতানন্দ) কিছুদিনের জন্য পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের সেবাধিকার পাইয়াছিলেন। কারণ, স্বভাবতই শ্রীবাবুরাম কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। অনুরুদ্ধ হইয়া এই সেবক তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ভক্তসভায় বলিয়াছিলেনঃ একদিন সন্ধ্যাকালে মঠের ঠাকুরঘরে বাবুরাম মহারাজ আরতি করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম—এক দেবীমূর্তি! দেখিয়াই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ি ও কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া নিয়া মন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসি। আহা, সে কী দর্শন! সমস্ত মনপ্রাণ শীতল হইয়া গেল। পরে এই দর্শনের কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, একথা আর কাউকে বোলো না

একদিন রাসলীলা পাঠ হইতেছিল, ভগবানের প্রতি গোপীদের গভীর প্রেমের বর্ণনা শুনিয়া মন খুব উদ্বেলিত হইল। তাঁহারা ভগবানের জন্য লজ্জাকুলমান সবই ত্যাগ করিয়াছিলেন, নানাভাবে তাঁহার সেবা করিতেন। আমার তখন বাবুরাম মহারাজকে খুব ভাল সন্দেশ খাওয়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। মনে হইল তাহা হইলে আমার প্রাণটি শীতল হইবে। তখন বয়স কম, হাঁটিয়া কলিকাতায় গিয়া ভীম নাগের উৎকৃষ্ট সন্দেশ কিনিয়া হাঁটিয়াই মঠে ফিরিলাম। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছি, দেখি বাবুরাম মহারাজ নীচে নামিতেছেন। আহা, প্রাণের সে কী আবেগ! এসব কথা বলিয়া বোঝানো যায় না, যাহার হইয়াছে সেই বুঝে। বলিলাম, আপনার জন্যে সন্দেশ এনেচি, আপনি গ্রহণ করুন। 'দাও' বলিয়া হাতে নিয়া তিনি সেই সন্দেশের কিছুটা খাইলেন ও বাকিটা আমাকে ফেরত দিলেন। 'প্রসাদ সকলকে দেব' বলিতেই কহিলেন, আর কাউকে দিয়ো না, তুমি খেয়ে ফেল। এইদিন তাঁহাকে সন্দেশ খাওয়াইয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত।

বাবুরাম মহারাজের বেশভূষা অতি সাধারণ ছিল, চটিজুতা পায়ে দিতেন। এখানে মায়েরা অনেকে আছেন, জানি না তাঁহাদের পদতল কেমন। কিন্তু একদিন তাঁহার পদতলে দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম, অতি সুন্দর লাল টুকটুকে কোমল সেই পা-দুখানি। দেখিলে মন জুড়াইয়া যায়। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তিনি অতি সাধারণ চটিজুতা পায়ে দেন, পায়ে ব্যথা লাগে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কলিকাতা হইতে খুব দামী একজোড়া সুন্দর নরম চটিজুতা কিনিয়া আনিলাম। ইচ্ছা, মনের সাধে তাঁহাকে পরাইব। কিন্তু জুতা দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দেখ, আমি অত ভাল জুতা পরি না, সাধারণ জুতাই পরি, তুমি এটা ফেরত দিয়ে এস। তাঁহার পাশে পূজনীয় হরি মহারাজ বসিয়াছিলেন, আমি ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে তাকাইতেছি, যদি তিনি আমার একটু সহায়

হন, যদি বাবুরাম মহারাজকে কিছু বলেন। তাহাই হইল, তাঁহার কথায় বাবুরাম মহারাজ আর আপত্তি না করিয়া নূতন জুতা পরিলেন, আর আমি তাঁহার পুরাতন জুতা সরাইয়া নিয়া লুকাইয়া রাখিলাম।

বেলুড় মঠে সকলের সঙ্গে আহারে বসিয়া ও নিজের তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন: মথুরায় দর্শনাদি করে বৃন্দাবন যাই। প্রেমের লীলাভূমি বৃন্দাবন—মনের মধ্যে উন্মাদনা! রাধা-কুণ্ডে স্নান করে তীরে বসে ধ্যান করচি, সেই সময় একটি পরমাসুন্দরী বালিকা, বিচিত্রবসনভূষণপরিহিতা, একথালা মিষ্টান্নাদি খাদ্য এনে সামনে রাখলে, আর দর্শন দিয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখন পাণ্ডাদের ডেকে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলুম। তারা বল্লে: আমরা গরীব লোক, খেতেই পাইনা; আমাদের ঘরের মেয়ে এসব উত্তম খাবার কোথায় পাবে? তার গায়ের ওসব গয়নাই বা কোথা থেকে আসবে? বাবাজী, চিনতে পারলে না তুমি মেয়েটিকে? বোধ হয় রাধারাণীই কৃপা করে তোমাকে দর্শন দিয়ে গেলেন! আমি তখন 'প্যারীজী' 'প্যারীজী' বলতে বলতে উন্মাদের মত কুণ্ড পরিক্রমা করতে লাগলুম![১]

স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের আত্মীয় নিকুঞ্জবিহারী মল্লিক পরবর্তী কালে বৃন্দাবনে বলিয়াছিলেন: বাবুরাম মহারাজের বৃন্দাবনে আসার আগেই আমি এখানে আসি। তিনি গোকুল-দর্শনে যাইতেছেন শুনিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে চলি। রাধাবাগের আগেই হাঁটিয়া যমুনা পার হইয়া আমরা সোজা চলিয়াছি গোকুলের অভিমুখে। গরমের দিন, চলিতে চলিতে অবসন্ন হইয়া তিনি এক আমবাগানে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে 'প্যারীজী, প্যারীজী' বুলি। অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সেই বাগান পাহারা দিতেছিল ও বানর তাড়াইতেছিল। এত ধূপে কেন বাহির হইয়াছেন

১। গৌরীশানন্দ-কথিত।

তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তারপরে আমের ডাল ভাঙ্গিয়া ও কূয়ার জলে ভিজাইয়া নিয়া, কতকগুলি ডাল বিছাইয়া তাঁহাকে শোয়াইল, আর নিজেরা প্রত্যেকে এক একটি ডাল হাতে নিয়া হাওয়া করিতে বসিল। তাঁহার মুখে 'প্যারীজী, প্যারীজী' শুনিয়া তাহারা বলিতে লাগিল, 'আপ হি তো লালীকা মাফিক হ্যায়!' সেই সময় আমি নিকটে যাইতেই বিরক্ত হইয়া 'তুম্ কোন্ হ্যায়? হট হিঁয়াসে' বলিয়া আমাকে তাহারা ধমক দিল। আহা, সে কী দৃশ্য! এতকাল পরেও আমি ভুলিতে পারি নাই![1]

শ্রীমতী রাধারাণীর অংশে বাবুরাম মহারাজের জন্ম, তিনি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি—একথা ঠাকুরের পার্ষদেরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছেন। 'ও রত্নপেটিকা' এই একটিমাত্র কথার দ্বারা শ্রীবাবুরাম যে শ্রীরাধার সখীস্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণে মধুররতিসম্পন্ন, ইহাই প্রতীত হইতেছে। শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত 'উজ্জ্বলনীলমণিঃ' গ্রন্থের সখী-প্রকরণে বলা হইয়াছে ঃ প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী, বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ। অতি নিগূঢ় মাধুর্যপ্রেমের যত বিচিত্র লীলাবিলাস, যত বিচিত্র সম্ভোগ, মহাভাবে তাহা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, এবং নর্মসখীরূপ বিশ্বস্ত আধারে ন্যস্ত হইয়া আস্বাদনের চরমোৎকর্ষ লাভ করে। সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধো হ্লাদিনী-নাম-শক্তেঃ। সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ॥[2] শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারংশকে প্রেম বলে। শ্রীরাধা সেই প্রেমের ঘনীভূত প্রতিমা, আর তাঁহার সখীরা সেই প্রেমেরই অংশভূতা। সখীরা যেন শ্রীরাধারূপ প্রেমলতিকার পত্রপুষ্পাদিতুল্য, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণলীলা-মৃতরসে সিক্ত হইয়া লতিকায় যখন উল্লাস ঘটে, পত্রপুষ্পাদিতে সেই উল্লাস স্বতই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মহাভাবে বিভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণকে বাবুরাম ধরিয়া রহিতেন, স্পর্শের দ্বারা সেই মহাভাবের উল্লাস বাবুরামেও সঞ্চারিত হইত,

---

১। গৌরীশানন্দ-কথিত।

২। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ ১০।১৬

এবং এইরূপে ইহার আবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর ক্রমশঃ সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেন। মনে হয়, এই অতি অন্তরঙ্গতার জন্যই বাবুরামকে ঠাকুর তাঁহার দরদী বলিতেন, আর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই গানটিও গাহিতেন ঃ

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না ॥
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,
সে দুইএক জনা।
ভাবে ভাসে রসে ডোবে, ও সে উজানপথে করে আনাগোনা
(মনের মানুষ) (ভাবের মানুষ) ॥

ঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও বলিয়াছেন, 'বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে আছে ঃ

সুন্দর গড়ন, হাসি সর্বদা বয়ানে।
কৃষ্ণপদে রতিমতি অতুল ভুবনে ॥
স্বভাবসুলভ কিবা আঁখি ঠেরে কথা।
পশ্চাতে সময়ে পাবে তাঁহার বারতা ॥
... ... বাবুরাম নাম তাঁর।
কৃপায় যাঁহার হয় ভক্তির সঞ্চার ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে অন্য কোথাও শ্রীবাবুরামের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায় না। আর কেবল বাবুরামেরই নহে, ঠাকুরের অন্যান্য লীলা-সহচরগণেরও ইষ্টস্বরূপের, ইষ্টে সমর্পিত ভাবের ও ভাবাশ্রিত রসাস্বাদনের উল্লেখযোগ্য বর্ণনা প্রায় নাই বলিলেই হয়। কেবলমাত্র গোপালের মার বাৎসল্যরসাস্বাদনের অতি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে বিধৃত হইয়া ভক্তজনের মনোরঞ্জন করিতেছে ; এবং শ্রীরাখালের সখ্যপ্রেম

—যাহা তাঁহার তিরোভাবের প্রাক্কালে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিলেই হয়—তাঁহার লীলাপটে অঙ্কিত থাকিয়া ভাবুক দ্রষ্টার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিতেছে।

পরবর্তী কালে ভক্তগণের সংস্পর্শে আসিয়া প্রেমানন্দ ক্বচিৎ ব্রজগোপী-দের অনুরাগের কথা কহিয়াছেন,[১] ক্বচিৎ শ্রীরাধার অনুপম প্রেমমহিমাও কীর্তন করিয়াছেন।[২] সময়ে সময়ে অন্তর্মুখ অবস্থায় অনুচ্চস্বরে তিনি 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলিতেন। শেষরাত্রে জাগিয়া পুনঃপুনঃ গোবিন্দ-নাম —একএক শ্বাসে যতবার সম্ভব ততবার করিয়া—উচ্চারণ করিতেন। তথাপি কৃষ্ণকথা না কহিয়া তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতেন। গোপালের মার গোপাল ও রামকৃষ্ণ যেমন আখেরে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন, বাবুরামের কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ তেমনি অভেদে মিলিত হইয়াছিলেন। 'এযুগের মানুষ ঠাকুরের পূজা করবে না তো কার পূজা করবে?' তিনি বলিতেন। যুগপ্রয়োজনে যুগাবতারের সান্নিধ্যেই তিনি সকলকে লইয়া যাইতে চাহিতেন।[৩]

শ্রীবাবুরামের প্রাগ্‌জন্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের কোন উক্তি না থাকিলেও তাঁহার ভাবাবস্থায় দৃষ্ট দেবীমূর্তি যে ব্রজদেবী বা ব্রজগোপী, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। অন্যথা বাবুরামের লোকাতীত রাধাপ্রেম দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। 'গোপীদের ভাব কী, জান? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।' ঠাকুর বলিয়াছেন।[৪] শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বলিয়াছেন, যারা সব এসেছিল তারাই এসেচে।[৫]

১। 'আমাদের চাই রাগমার্গের ভজনসাধন, যেমন ছিল ব্রজগোপীদের।'—পত্রাবলী

২। 'একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা—এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্যধন, পরম নিধি। এস, এই রত্ন লুটে নিয়ে আণ্ডিল হয়ে যাই।' —পত্রাবলী

৩। 'আমরা চাই মাধুর্যময় ঠাকুরকে, মাধুর্যময় ভক্তদের, মাধুর্যময় শাস্ত্র। জগৎ মধুময় হ'ক ভগবৎকৃপায়, ইহাই প্রার্থনা।' [স্বামী প্রেমানন্দের পত্র : উদ্বোধন—পৌষ, ১৩৫০]

৪। কথামৃত ৩।৯।৩

৫। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৫৬ পৃঃ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হুগলী জেলায় আঁটপুর গ্রামে, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশে, ১২৬৮ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর) মঙ্গলবার রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিট সময়ে, শুভক্ষণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 'দরদী' পার্ষদ শ্রীবাবুরাম জন্মগ্রহণ করেন।[১]

আঁটপুরে ঘোষ ও মিত্র বংশ-দুইটি কয়েক পুরুষ ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল। বাবুরামের পিতা শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মিত্রবংশের দুহিতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনীর পাণিগ্রহণ করেন। রত্নগর্ভা মাতঙ্গনী কৃষ্ণভাবিনী নামে কন্যা এবং তুলসীরাম, বাবুরাম ও শান্তিরাম নামে তিনটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। বাবুরামের জন্মের কিছুকাল পরে, তারাপ্রসন্ন তাঁহার অসামান্যরূপগুণশালিনী কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীকে আঁটপুরের পার্শ্ববর্তী তড়া গ্রামের শ্রীবলরাম বসুর করে সমর্পণ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বালক বাবুরাম একটা সাত্ত্বিক পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ও ৺গঙ্গাধর শিবলিঙ্গের সেবাপূজা না হওয়া পর্যন্ত পরিবারস্থ শিশু বা বৃদ্ধ কেহই জলগ্রহণ করিতে পাইত না। বাবুরামও অসাধারণ শুভসংস্কার নিয়া সংসারে আসিয়াছিল; কখনও সে তাহার সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করিত না। তাহার গৌরবর্ণ সুন্দর দেহকান্তি লক্ষ্য করিয়া যদি কোন পল্লীবাসিনী বলিয়া বসিতেন,—বাবুরাম,

---

১। প্রাচীন পঞ্জিকার মতে জন্মসময়ে শুক্লপক্ষের নবমী তিথি ছিল। এফেমেরিস অনুসারে জন্মের কয়েক মিনিট পূর্বে দশমী তিথি পড়িয়াছে।

তোমার জন্যে একটি রাঙা টুকটুকে বৌ আনব, অমনি সে তাহার কচি হাত দুইখানি নাড়িয়া বলিত,—ও কথা বোলো না—মরে যাব, মরে যাব।

বাবুরাম মহারাজের মুখে কখন কখন তাঁহার বালচাপল্যের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। বেলুড় মঠে বলিয়াছিলেন : মাছের ঝোল না হলে ভাত খেতে চাইতুম না, মাকে বলতুম, পুকুর থেকে গেঁড়ি তুলে এনে ঝোল করে দাও, তবে ভাত খাব।[১] রাঁড়িখালে বলিয়াছিলেন : আমি ছোট বেলায় খুব দুষ্টু ছিলুম। দেখ আমার মাথায় এখনো কেমন দাগ রয়েচে। স্বামিজী বলতেন, যার মাথায় দাগ নেই সে আবার ছেলে! মার খুব কঠোর শাসন ছিল, মিথ্যা বল্লেই মার দিতেন।[২]

গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুকাল পডাশুনা করিয়া জননীর ইচ্ছানুসারে বাবুরাম কলিকাতায় তাঁহার জ্ঞাতিকাকা গুরুচরণ ঘোষের বাসায় আসেন। গুরুচরণ সেই সময়ে চোরবাগানে থাকিতেন পরে কম্বুলেটোলায় বাসা পরিবর্তন করেন। বাবুরাম কলিকাতায় যদু পণ্ডিতের বঙ্গবিদ্যালয়ে, এরিয়ান স্কুলে ও মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের শ্যামবাজার শাখায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গবিদ্যালয়ে শ্রীকালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) ও মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে শ্রীরাখালচন্দ্র (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন শেষোক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

দেবকার্যার্থে যাঁহাদের জন্ম, অলক্ষিতে একটা দৈবশক্তি তাঁহাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। মহাপুরুষগণের জীবনালোচনায় একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাবুরাম পাঠ্যবিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না; গঙ্গার তীরে তীরে সাধু খুঁজিয়া বেড়াইতেন, আর কোনও সাধুর দেখা পাইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে থাকিতেন। কোনদিন

১। বরদানন্দ-কথিত।

২। প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত।

ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা, কোনদিন বা হরিসভায় ভাগবতশাস্ত্রাদি পাঠ ও নামসংকীর্তন শুনিতে যাইতেন, শুনিয়া তন্ময় হইয়া পড়িতেন। প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয় ছাত্রদিগকে—সৌম্যদর্শন বাবুরাম তাঁহার খুবই প্রিয় ছিলেন—ঈশ্বরীয় কথা শুনাইতেন, ভাল ভাল বই পারিতোষিক দিতেন।

এইরূপে বাবুরামের ঈশ্বরীয় তত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই চলিল। তাঁহার গর্ভধারিণীর তপোনিষ্ঠ জীবনও এই জিজ্ঞাসাবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছিল। ছুটির দিন বাড়ীতে যাইয়া বাবুরাম হয়তো শুনিতেন, তাঁহার জননী জপধ্যানে ডুবিয়া আছেন, অহোরাত্র জপের সংকল্প নিয়া, দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া। সেইদিন তাঁহাকে ও তাঁহার সহোদরদিগকে অন্য এক বাড়ীতে থাকিতে হইত, পরদিন সকালে জননীর দর্শন মিলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার যোগদৃষ্টিতে বাবুরামের ভগিনীপতি শ্রীবলরামকে শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনদলের মধ্যে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিবামাত্র চিনিতেও পারিয়াছিলেন। বলরামকে ঠাকুর তাঁহার অন্যতম রসদ্দার বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ঠাকুরের সেবায় ও সাহচর্যে স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়া হৃদয়বান বলরাম একে একে তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলকেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে লইয়া যান। এইরূপে বাবুরামের জননী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা তুলসীরামও ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

বাবুরামকে সাধুর অন্বেষণে যত্রতত্র ঘুরিতে দেখিয়া একদিন তুলসীরাম তাঁহাকে বলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তাঁর মহাপ্রভুর মত হরিনাম কীর্তন করতে করতে ভাব হয়, ভগবানের কথা কইতে কইতে তিনি সমাধিস্থ হন—একদিন তাঁকে দেখতে যাবি?

সহপাঠী রাখালের সঙ্গে বাবুরামের প্রণয় ছিল। পরদিন বিদ্যালয়ে রাখালের সঙ্গে তাঁহার এইরূপ কথাবার্তা হইল: 'ভাই, দক্ষিণেশ্বরে নাকি একজন সাধু আছেন?' 'আছেন, তুমি তাঁকে দেখতে যাবে?' 'যাব, তুমি

তাঁকে দেখেচ ? কেমন লোক ?' 'হ্যাঁ দেখেছি, একদিন গিয়ে দেখে এস না।' 'আচ্ছা, কাল কি তিনিই জোড়াসাঁকো পালেদের বাড়ী ভাগবত শুনতে এসেছিলেন ?' 'তা হতে পারে, যেখানে ভগবৎকথা হয় তিনি সেখানেই যান। আসচে শনিবার তাঁর কাছে যাবে ?'

বাবুরাম সম্মত হইলেন, দুইজন একসঙ্গে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন স্থির হইল। বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে দুই বন্ধু আহিরীটোলার ঘাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন, নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইবেন। পথে যাইতে যাইতে উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথা হইতে লাগিল: 'আজ সেখানে থাকবে ?' 'থাকবার জায়গা হবে তো ?' 'তা হতে পারে।' 'সেখানে কী খাওয়া যাবে ? দোকান টোকান আছে কি ?' 'তা যা হয় একরকম হবে এখন।'

আহিরীটোলার কাছাকাছি আসিয়া তাঁহাদের রামদয়াল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হইল। রামদয়াল বলরামবাবুদের পুরোহিতপুত্র, নানাবিধ উত্তম ভোজ্যদ্রব্য নিয়া তিনিও ঠাকুরের কাছে যাইতেছিলেন। তিনজন এক নৌকায় যাত্রা করিলেন, দক্ষিণেশ্বরে পেঁীছিতে সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর সেই সময়ে নিজের প্রকোষ্ঠে ছিলেন না। 'তিনি কালীমন্দিরে গেছেন, আমি তাঁকে ডেকে আনি', বলিয়াই রাখাল দ্রুতপদে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। ভাবে বিভোর ঠাকুর মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতেছেন, আর রাখাল তাঁহাকে ধরিয়া 'এখান উঁচু, এখান নীচু' বলিয়া সাবধানে আনিতেছেন। ঘরে আসিয়া তিনি ছোট খাটটির উপর বসিলেন ও সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নবাগত ভক্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদয়ালের কথায় পরিচয় পাইয়া ঠাকুর কহিলেন,—বটে ? বলরামের কুটুম্ব, তবে তো আমাদেরও কুটুম্ব ! তা বেশ বেশ। তোমাদের বাড়ী কোথায় ? বাবুরাম উত্তর দিলেন,—আজ্ঞে, তড়া-আঁটপুর।

ঠাকুর। বটে ? তবে তো তোমাদের দেশেও একবার গেছি। ঝামা-পুকুরের কালী-ভুলুর বাড়ীও সেইখানে না ?

বাবুরাম। হঁ্যা। আপনি তাঁদের কেমন করে জানলেন ?

ঠাকুর। তারা যে রামপ্রসাদ মিত্রের ছেলে। যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তখন দিগম্বর মিত্রের বাড়ী আর ওদের বাড়ী যখন তখন যেতুম। এস, আলোয় এস, তোমার মুখখানি দেখি।

একটু দূরে একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিতেছিল, বাবুরামের হাত ধরিয়া প্রদীপের নিকটে গেলেন এবং মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, হুঁ হুঁ। তারপরে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, বাবুরামের একখানি হাত নিজের হাতের উপর রাখিয়া উহার ভার অনুভব করিতে করিতে প্রফুল্লমুখে বলিলেন, হুঁ হুঁ, তা বেশ বেশ! তারপরে রামদয়ালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরেন কেমন আছে জান ? শুনেছিলুম তার একটু অসুখ করেছিল।

রামদয়াল। তিনি ভাল আছেন শুনেচি।

ঠাকুর। দেখ, সে অনেকদিন আসে নি! তাকে দেখবার বড় ইচ্ছে হয়েচে, একবার তাকে এখানে আসতে বোলো। মনে থাকবে তো ?

রামদয়াল। আজ্ঞে অবিশ্যি মনে থাকবে। বলব, ভুলব না।

কথায় কথায় প্রায় দশটা বাজিল। রামদয়াল যে সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য আনিয়াছিলেন উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাকি সমস্তটাই তিনজনকে খাওয়াইলেন। খাওয়া শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় শোবে, ঘরের ভিতর না বারান্দায় ? রাখাল বলিলেন, আমি ঘরে শোব। রামদয়াল বলিলেন, আমি বারান্দায় শোব। বাবুরাম বলিলেন, আমিও বাইরে শোব। ঠাকুর তিনজনকেই ঘরে শুইতে বলিলেও রাম-দয়াল ও বাবুরাম ঘরে শুইতে চাহিলেন না, পূর্বদিকের ভিতরের বারান্দায় শয়ন করিলেন।

চৈত্রমাস (১৮৮২), শীত তো ছিলই না, গ্রীষ্মও তেমন ছিল না।

শয়নের পরে প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছে এমন সময় ঠাকুর পরিধেয় কাপড়খানি বগলে করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিয়া রামদয়ালকে ডাকিয়া কহিলেন, হ্যাঁগা, ঘুমুলে? 'আজ্ঞে না' বলিয়া দুইজনেই শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

ঠাকুর। দেখ, তাকে একবার আসতে বোলো। তার জন্যে আমার বুকের ভিতরটা (বগল হইতে কাপড় লইয়া মোড়া দিয়া) এইরকম মোড়া দিচ্চে, যেন গামছা নিংড়ুচ্চে! তুমি একবার তাকে আসতে বোলো।

রামদয়াল। আজ্ঞে, আমি কালই তার সঙ্গে দেখা করে বলব আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বলব, তিনি আপনার জন্যে অস্থির হয়েচেন, একবার গিয়ে দেখা করে আসুন।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তার জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হয়েচে, একটিবার দেখা করে যেতে বল।

রামদয়াল। আমি রাতটা পোহালেই তাঁর কাছে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না, তিনি ভাল আছেন। আর আপনি অস্থির হয়েচেন শুনলেই তিনি আসবেন।

বাবুরাম ভাবিতে লাগিলেন, এ কী ভালবাসা! এত অস্থির! এঁর এত ভালবাসা. আর সে লোকটা কেমন? একবার আসে না! তাঁহার কোমল প্রাণে ব্যথা বাজিল।

ঠাকুর নিজের ঘরের দিকে কয়েক পদ গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তবে বোলো, একবার তাকে আসতে বোলো। বারবার ঐ একই কথা বলিয়া টলিতে টলিতে ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। প্রায় একঘণ্টা পরে পুনরায় পরিধেয় কাপড়খানি বগলে করিয়া টলিতে টলিতে রামদয়ালের নিকট আসিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—নরেন বড় শুদ্ধসত্ত্ব, সাক্ষাৎ নারায়ণ! তাকে না দেখলে থাকতে পারি নি। তার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্ করচে, সে একবার যেন আসে। সমস্ত রাত্রি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠাকুর এইরূপ করিলেন। নিশাবসান হইল।

প্রাতঃকালে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আসিয়া বাবুরাম দেখিলেন, তাঁহার রাত্রের ন্যায় ভাব এখন আর নাই, যেন সেই লোকই নহেন। ঠাকুর তাঁহাকে শৌচাদি সারিয়া পঞ্চবটী দেখিয়া আসিতে বলিলেন।

বাবুরামের বয়স এখন কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর, যদিও দেখিলে পনর ষোলর অধিক মনে হয় না। যখন তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র, তাঁহার মনে হইত, বেশ একজন সাধু সঙ্গী পাই তো গঙ্গার ধারে গাছপালার মধ্যে নির্জন কুটিরে সাধু হয়ে থাকি, সন্ন্যাসী হই। এখন পঞ্চবটী ও পঞ্চবটী-সংলগ্ন কুটির দেখিয়া তাঁহার পূর্ব স্মৃতি উদ্দীপিত হইল। হুবহু এই স্থানটিই যে তিনি মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন! ফিরিয়া আসিতে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন পঞ্চবটী দেখলে? মনোভাব গোপন করিয়া বাবুরাম কহিলেন, বেশ মশাই।

ঠাকুরের আদেশে মা-কালী দর্শন করিয়া ও ঠাকুরের পদধূলি লইয়া বাবুরাম গমনোদ্যত হইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার আসবে তো? বাবুরাম কহিলেন, আজ্ঞে হাঁ, আসব।[১]

মিলনের সূচনাতেই, চাঁদের আকর্ষণে উত্তাল সমুদ্রের মত, প্রিয়জন-বিরহে উদ্বেলিত এক প্রেমমহোদধি বাবুরাম দেখিয়াছিলেন। আর কেবল দূরে দাঁড়াইয়া দেখাই নহে, উহার তরঙ্গাভিঘাতে নিজেও আহত হইয়াছিলেন। সেই আঘাত বিস্মৃতির আগল অপসারিত করিয়া তাঁহাকে এক মধুময় স্মৃতির দেশ দেখাইয়া দিয়াছিল কি? সোনার প্রতিমা, রূপে গুণে অনুপমা এক বিরহোন্মাদিনী তাঁহার মানসলোক উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিয়াছিলেন কি? কে বলিবে! বাহিরের লোকে ভিতরের সব খবর কেমন করিয়া পাইবে? প্রথম আলাপেই ঠাকুর যাঁহাকে 'কটুম্ব' বলিয়া গ্রহণ করিলেন, দিন কয়েক পরেই যাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে 'দরদী' বলিয়া উল্লেখ

১। ঠাকুরের সহিত বাবুরামের প্রথম মিলনের বিবরণ গুরুদাস বর্মন্-কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত' হইতে সঙ্কলিত।

করিতে থাকিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে এসব কথা মনে না হইয়া পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা ভূলোকে থাকিয়া গোলোকের ছবি দেখিতেছি। সেখানকার সব কথা, সব ভাষা এখানকার মত নয়; অনেক কিছুই আভাসে বুঝিয়া নিতে হয়, আর তাহাও যে যেমন পারে।

পরের রবিবার বাবুরাম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন তখন বেলা আটটা। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর খুশী হইলেন, সস্নেহে কহিলেন,—তুমি এসেচ? বেশ হয়েচে। পঞ্চবটীতে ওরা সকলে চড়িভাতি করবে, নরেন্দ্র এসেচে, তার সঙ্গে আলাপ করগে। রাখাল নরেন্দ্র, ভবনাথ, লাটু, হরীশ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে বাবুরামের পরিচয় করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কথায় কথায় হাসিতেছেন, সর্দার পাচকের মত রন্ধনের বিষয় বলিয়া দিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে গল্প করিতেছেন। শেষে একটি গান ধরিলেন। সেই মধুর স্বরলহরী যেন আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিল। নরেন্দ্রের রূপে গুণে বাবুরাম মুগ্ধ হইলেন। সমস্ত দিনটি মহানন্দে কাটিয়া গেল, ঠাকুরের ভক্তগণকে তাঁহার বড়ই মিষ্টি বোধ হইল।

ইহার পরে একদিন অপরাহ্ণে বাবুরাম যখন ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন, ঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন,—বাবুরাম, তুই এসেচিস বেশ হয়েচে। (একজনকে দেখাইয়া) দেখ্, ইনি কলকাতা থেকে এসেচেন, বড় ভাল লোক। এঁর জ্বর হয়েচে, বাড়ী যাবেন। তা একলা কেমন করে যাবেন, তুই এঁকে একখানা নৌকা করে এঁর বাড়ী পোঁছে দে। বাবুরাম কত সাধ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইয়া গেল। সানন্দ মনে তিনি উপস্থিত কর্তব্য বরণ করিয়া নিলেন, এবং বাঙাল মাঝির টাপুরে নৌকার ব্যবস্থা করিয়া অসুস্থ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে লইতে ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। স্মিতমুখে বাবুরামের হাত ধরিয়া ঠাকুর কহিলেন,—দেখ্, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে! তুই আজ এঁকে এঁর বাড়ী পোঁছে দে, আর একদিন আসিস, তোর সঙ্গে অনেক কথা কইব। তাঁহার পদধূলি

লইয়া বাবুরাম যখন নৌকায় উঠিতে গেলেন, ঠাকুর আবার কহিলেন, আর একদিন আসিস, অনেক কথা আছে। দেবেন্দ্রনাথকে আহিরীটোলায় তাঁহার আত্মীয়ের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া বাবুরাম বাসায় ফিরিলেন।

ইহার পরে বাবুরাম যেদিন ঠাকুরের কাছে আসেন, ঠাকুর সেদিন অনেক কথা কহিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। আর সেই অনেক কথাও যে একদিনেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। অন্যূন চারি বৎসর ধরিয়া কথার জের চলিয়াছিল। প্রিয়জনের সহিত কথা কহিষা কে কবে কথার ইতি করিতে পারিয়াছে ?

বাবুরাম এইরূপে, বিশেষতঃ ছুটির দিনে, ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের যেসব স্থলে তাঁহার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে সেই স্থলগুলি সময়ের ক্রম অনুসারে উদ্ধৃত করিতেছি।

ডিসেম্বর, ১৮৮২

বাবুরাম, রামদয়াল ও মাষ্টার আজ রাত্রে থাকিবেন।...

সন্ধ্যার পর...ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। ক্রমে ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাব উপশমের পর বলিতেছেন,— মা, ওকেও টেনে নাও, ও অত দীনভাবে থাকে, তোমার কাছে আসা যাওয়া কচ্চে। ঠাকুর বাবুরামের কথা কি বলিতেছেন ?

৫ই জানুয়ারী, ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, যারা আপনার তারা হল পর—রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর তারা হল আপনার। দেখ না, বাবুরামকে বলচি, বাহ্যে যা, মুখ ধো। এখন ভক্তরাই আত্মীয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ।...এক একবার নিজের স্বরূপকে দেখতে পেয়ে মানুষ অবাক্ হয় আর আনন্দে ভাসে। হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয়। (মাষ্টারের

প্রতি) সেদিন সেই গাড়ীতে আসতে আসতে বাবুরামকে দেখে যেমন হয়েছিল।

২০শে জুন, ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে ? বাবুরামকে বল্লাম, তুই লোকশিক্ষার জন্য পড়্।...

বাবুরামকে দেখলাম দেবীমূর্তি—গলায় হার, সখী সঙ্গে। ও স্বপ্নে কী পেয়েচে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।

কি জানো, দেহরক্ষার অসুবিধা হচ্চে। ও এসে থাকলে ভাল হয়।...তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়ীতে হাঙ্গাম হতে পারে। (সহাস্যে) আমি যখন বলি, চলে আয় না, তখন বেশ বলে, আপনি করে নিন না! রাখালকে দেখে কাঁদে, বলে, ও বেশ আছে।

৩০শে জুন, ১৮৮৪

আজকাল ঠাকুরের সেবার কষ্ট হইয়াছে। রাখাল আজকাল থাকেননা।... ঠাকুর সঙ্কেত করিয়া বাবুরামকে বলিতেছেন—হ—ছু না, রা— ছু। এ অবস্থায় আর কাকেও ছুঁতে দিতে পারি না। তুই থাক্, তা হলে ভাল হয়।...

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাবুরামের এখানে থাকবার দরকার পড়েচে। অবস্থা আছে কিনা, তাতে ঐসব লোকের থাকা প্রয়োজন। ও বলেচে, ক্রমে ক্রমে থাকব, না হলে হাঙ্গামা হবে, বাড়ীতে গোল করবে। আমি বলেচি, শনিবার রবিবার আসবে।

৩রা আগষ্ট, ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাবুরাম বলে, সংসার—ওরে বাবা!...(মাষ্টারের প্রতি) তোমার ঐটে ভার রইল ঃ বাবুরামকে বলবে, রাখাল গেলে দুইএক দিন মাঝে মাঝে এসে থাকবে ; তা না হলে আমার মন ভারী খারাপ হবে।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাল অধর সেনের বাড়ী ভাবাবস্থায় একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল ; তাই তো বাবুরামকে নিয়ে যাই—দরদী।...

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন, বাবুরাম, কাছে একটু আয় না? বাবুরাম বলিলেন, আমি পান সাজচি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, রেখে দে পান সাজা।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ অমাবস্যা, মার ঘরে যেয়ো।

আরতির শব্দ শুনিয়া বাবুরামকে বলিতেছেন, চল্‌রে চল্‌—কালীঘরে।... বাবুরামের হাত ধরিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

নাট্যালয়ে চৈতন্যলীলা। ঠাকুরের গাড়ী বীডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা।...ঠাকুরকে দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্‌সে বসানো হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাষ্টার বসিলেন। পশ্চাতে বাবুরাম, আরও দুএকটি ভক্ত।

৫ই অক্টোবর, ১৮৮৪

বাবুরাম নবীন সেনের বাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া কাল রাত্রে এখানে ছিলেন। সকালে ঠাকুরের সঙ্গে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমাদের কী কথা হচ্চে?

মাষ্টার ও বাবুরাম। আজ্ঞা নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্চে। আর সেই গানটির কথা—'শ্যামাপদে আশ, নদীর ধারে চাস।'

বাবুরামকে নারায়ণের বাড়ী গিয়া দেখা করিতে বলিতেছেন।...বলিতেছেন, তুই বরং একখান ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাস।

১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪

ঘরের মধ্যে ঠাকুর...বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ সমাধিস্থ।...বাম পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গ্রীবাদেশ ঈষৎ আকুঞ্চিত। বাবুরামের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কানের কাছে হাতটি রহিয়াছে। ...সমাধিভঙ্গ হইল। গালে হাত দিয়া যেন কত চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব দেখলুম—কার কতদূর এগিয়েচে।…কিন্তু একে (বাবুরামকে) ছুঁয়ে ওরূপ হল।…

ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বসিলেন। ভক্তেরা মেজেতে বসিলেন। বাবুরাম ও কিশোরী তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটটিতে গিয়া ঠাকুরের পাদমূলে বসিয়া একে একে পদসেবা করিতেছেন।

২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪

মাড়োয়ারী ভক্তেরা অন্নকূট করিয়াছেন—ঠাকুরের নিমন্ত্রণ।…ঠাকুর গাড়ীতে বসিয়া, গাড়ী আসিতে পারিতেছে না। ভিতরে বাবুরাম, রাম চাটুজ্যে। গোপাল ও মাষ্টারকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। ঠাকুর গাড়ী থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাষ্টার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন।…

ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন। ভিতরে ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, মাষ্টার, রাম চাটুজ্যে। ছোট গোপাল গাড়ীর ছাদে বসিলেন।…বড়-বাজার দিয়া গাড়ী চলিতেছে। দেওয়ালির ভারী ধুম। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু আলোয় আলোকময়।…ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোশনাই দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন।…ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন, আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে। বলিতে বলিতে হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছেন, ওরে, এগিয়ে পড়্‌না, কী করচিস্?

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫

ভক্তেরা তাঁহার জন্মোমহোৎসব করিতেছেন।…নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম… প্রভৃতি অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে।…ঠাকুর বসিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে আস্তে আস্তে বলিলেন, ঘরে ক্ষীর আছে, নরেন্দ্রকে দিগে যা।

৭ই মার্চ, ১৮৮৫

ঠাকুর বাবুরামের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন। মাষ্টার যে স্কুলে পড়ান বাবুরাম সে স্কুলে Entrance classএ পড়েন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরামের প্রতি)। তোর বই কই? পড়াশুনা করবি না? ও দুদিক রাখতে চায়।

বড় কঠিন পথ, একটু তাঁকে জানলে কী হবে?…অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যেতে হয়।

বাবুরাম (সহাস্যে)। আমি ঐটি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ওরে, দুদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি চাস তবে চলে আয়!

বাবুরাম (সহাস্যে)। আপনি নিয়ে আসুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। রাখাল ছিল সে এক। তার বাপের মত ছিল। এরা থাকলে হাঙ্গাম হবে।

একবার কালীঘরে যাব—এই বলিয়া মাষ্টারের হাত ধরিয়া ও তাহার উপর ভর দিয়া কালীঘরের সম্মুখের চাতালে গিয়া বসিলেন। বসিবার পূর্বে বলিতেছেন, তুমি বরং ওকে ডেকে দাও। মাষ্টার বাবুরামকে ডাকিয়া দিলেন।

৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য এলাম [কলিকাতায়]।

১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬। কাশীপুর।

ঠাকুর যে ঘরে আছেন তাহার পশ্চিমদিকে একটি পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর ঘাটের চাতালে কয়েকটি ভক্ত খোল করতাল লইয়া গান গাহিতেছেন।…

হরি বোলে আমার গৌর নাচে।

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া

বলিতেছেন, তোমরা নীচে যাও, ওদের সঙ্গে গান করবে, আর নাচবে। তাঁহারা নাচে আসিয়া কীর্তনে যোগদান করিলেন।

উপরের উদ্ধৃতিসমূহ হইতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি অনায়াসে করা যাইতে পারে।

(১) ঠাকুরের কাছে প্রথমাগমনের পর, বৎসরকাল না যাইতেই বাবুরাম শ্রীগুরুর স্থায়ী সান্নিধ্য ও সেবাধিকার লাভের জন্য অন্তরে আকুলতা অনুভব করিতেন, কিন্তু ঠাকুরের কৃপা ভিন্ন উহা সম্ভব নহে জানিয়া তাঁহারই মুখ চাহিয়া দীনভাবে থাকিতেন।

(২) ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহার সহজাত ঈশ্বরানুরাগ যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, অপরা বিদ্যা অর্জনের আগ্রহ ততই কমিয়া যাইতে থাকে।

(৩) তিনি স্বপ্নে ইষ্টমন্ত্র প্রাপ্ত হন, এবং শ্রীগুরুর নির্দেশানুয়ায়ী 'একটু কিছু' অর্থাৎ স্বল্প সাধনা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করেন। কারণ, ঠাকুরের শ্রীমুখের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে।

(৪) সিদ্ধাবস্থায় তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে গিয়াছিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পর ঠাকুরের কথিত 'বিজ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

(৫) বিজ্ঞানী বাবুরাম তাঁহার প্রিয়তমের (ঠাকুরের) নিত্য সাহচর্য লাভ করিয়া, এবং স্ব-ভাবে ও সানুরাগে তাঁহার সেবা করিয়া আপ্তকাম হন।[১]

কথামৃতেব বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়, ঠাকুরের কাছে আসার প্রায় দুই বৎসর পরে শ্রীবাবুরাম স্বপ্নদীক্ষা পাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-

---

১। 'একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে; আবার সাধন না করলেও পায়।' 'বিজ্ঞান—কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা।...তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েচেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।' 'বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান এসব তাঁর ঐশ্বর্য।' [কথামৃত]

প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি আছে, খুব সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার দীক্ষালাভের পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

"শ্রীযুত বাবুরামের ইচ্ছা হইল তাঁহার ভাবসমাধি হউক। ঠাকুরকে কান্নাকাটি করিয়া বিশেষভাবে ধরিলেন—আপনি করে দেন। ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, মাকে বলব; আমার ইচ্ছাতে কি হয় রে?—ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুরের সে কথা কে শুনে? বাবুরামের ঐ এককথা—আপনি করে দেন। এইরূপ আবদারের কয়েকদিন পরেই শ্রীযুত বাবুরামকে কার্যবশতঃ নিজেদের বাটী আঁটপুরে যাইতে হইল। সেটা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এদিকে ঠাকুর তো ভাবিয়া আকুল, কী করিয়া বাবুরামের ভাবসমাধি হইবে। একে বলেন, ওকে বলেন—বাবুরাম ঢের করে কাঁদাকাটা করে বলে গেছে যেন তার ভাব হয়—কী হবে? যদি না হয় তবে সে আর এখানকার কথা মানবে নি। তারপর মাকে বলিলেন, মা, বাবুরামের যাতে একটু ভাবটাব হয় তাই করে দে। মা বলিলেন, ওর ভাব হবে না, ওর জ্ঞান হবে। ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বাণী শুনিয়া আবার ভাবনা! আমাদের কাহার কাহার কাছে বলিলেনও—তাই তো, বাবুরামের কথা মাকে বল্লুম, তা মা বল্লে, ওর ভাব হবে নি, ওর জ্ঞান হবে। তা যাই হোক, একটা কিছু হয়ে তার মনে শান্তি হলেই হল। তার জন্যে মনটা কেমন করচে, অনেক কাঁদাকাটা করে গেছে।—ইত্যাদি। আহা সে কতই ভাবনা, যাহাতে বাবুরামের কোনরূপে সাক্ষাৎ ধর্মোপলব্ধি হয়। আবার সেই ভাবনার কথা বলিবার সময় ঠাকুরের কেমন বলা—'এটা না হলে ও আর মানবে নি।'—যেন তাহার মানা না মানার উপর ঠাকুরের সকলই নির্ভর করিতেছে!"

বাবুরাম মহারাজের জীবন একদিক দিয়া অলোকসামান্য বলা যাইতে পারে, যেহেতু তাহাতে আদিম জৈবপ্রেরণার স্থান ছিল না। পুরাণোক্ত মহাপুরুষ শুকদেবের কথা বাদ দিলে, এরূপ মহজ্জীবনের অপর কোন দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নাই।

একদিন বেলুড় মঠের চায়ের টেবিলে বসিয়া বাবুরাম মহারাজ আপন মনে পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতেছিলেন, একটি ঔষধের বিজ্ঞাপন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক অস্বাভাবিক দুষ্ক্রিয়ার পরিণামে যে স্নায়ুবিকার ঘটে, বিজ্ঞাপনটিতে উহার প্রতিকারের কথা ছিল। তিনি পড়িয়া দেখিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্কর্মটি যে কী, বুঝিতে পারিলেন না। নিকটস্থ এক ব্যক্তি যখন বলিয়া বুঝাইয়া দিল তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, এবং গঙ্গা গঙ্গা বলিতে বলিতে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া আসিলেন।

বেলুড় মঠে আসিয়া একদিন এক যুবক স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজের কাছে নিজের অতীত জীবনের দুষ্কৃতির কথা বলিতে থাকে। দয়াপরবশ হইয়া তিনিও শুনিয়া যাইতে থাকেন। বাবুরাম মহারাজ কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, খানিকটা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—এসব কী কথা এ বলচে? এসব কী? মহাপুরুষ প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এর কোন কথাই বুঝতে পার নি? বাবুরাম উত্তর দিলেন, না। তাঁহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, আজ বুঝতে পারলুম ঠাকুর কেন তোমায় হাড়শুদ্ধ বলতেন!

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, বাবুরামের দেহেতে আর কিছু ছিল না, কেবল কাঠামোখানি ছিল!

এমন জৈবসংস্কারবর্জিত যে আধার সেই আধারে শ্রীগুরুপ্রসাদে যদি অচিরে আত্মদর্শন ঘটে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আচার্যমুখে শুনিয়াছি, ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর দর্শনমাত্রে ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়া যাইতে পারে।

বাবুরামরূপ রত্নপেটিকায় মহাভাবোত্থ ভাবরাশিরূপ রত্নরাজি সংরক্ষিত করিবার পূর্বে ঠাকুর জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পেটিকাটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি ভিন্ন জ্ঞান (আত্মজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) সম্ভবে না।

মহাভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে অন্তর বাহির উন্মথিত আপ্লাবিত করিয়া প্রেম

আত্মপ্রকাশ করে; মহাভাব ও প্রেম অভিন্ন। প্রেমের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধাকে ভক্তিশাস্ত্র মহাভাবস্বরূপা বলিয়াছেন।[১]

কথাপ্রসঙ্গে, উপস্থিত ভক্তগণের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়াই হয়তো, বাবুরাম মহারাজ একবার ঢাকায় কাসিমপুরের জমিদারবাড়ীতে (১৯১৬) এবং আর একবার বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাসাড়া গ্রামে (১৯১৭) বলিয়াছিলেন: ঠাকুরের কৃপায় এই দেহে নির্বিকল্প সমাধি, মহাভাব—এসব হয়েচে।[২]

ঠাকুর বলিয়াছেন: 'গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দুটো জিনিস থাকে—অহংতা আর মমতা।' 'মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান দিবার উদ্যোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে আছি। তোমরা কী একটি রূপ কেবল দেখচ! গোপীরা বলে উঠল, কৃষ্ণ, তবে কি আমাদের ত্যাগ করে যাবে তাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছ?'

গুপ্তগোপীদেহ শ্রীবাবুরামেরও প্রেমাভক্তি। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: ঠাকুর যখন বল্লেন, আমি পরে সূক্ষ্ম শরীরে লক্ষমুখে খাব, বাবুরাম বলেছিল, তোমার লক্ষটক্ষ আমি চাইনে—আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে, আর আমি এই মুখটিই দেখব।

নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে।' 'ওদের কেমন জান? ফল আগে, তারপর ফুল। আগে দর্শন, তারপর গুণমহিমা শ্রবণ, তারপর মিলন।' ঠাকুর বলিয়াছেন।

শ্রীবাবুরামের সাধনভজন সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। পরবর্তী কালে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ব্রাহ্মমুহূর্তে ও সন্ধ্যায় এবং যখনই কর্ম হইতে কিছুক্ষণের জন্য অবসর পাইতেন সেই সময়টায় তিনি মালা লইয়া জপে বসিতেন। অসুখের সময়েও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। নৌকায় করিয়া যাইবার সময় চাদরের নীচে মালা রাখিয়া জপ করিতেন। মালা

১। 'মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী।'—উজ্জ্বলনীলমণিঃ।

২। অতুলচন্দ্র চৌধুরী কথাটি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, উভয় স্থানেই।

তাঁহার জামার পকেটে থাকিত। 'আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত।...ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।'

গভীর রাত্রে নিজের ঘরে ঠাকুর কখন কখন তান্ত্রিক চক্রের অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহার ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে লইয়া। বাবুরাম তাহাতে থাকিতেন। ঐ অনুষ্ঠানের পরেই তাঁহাদের কাহাকেও পঞ্চবটীতে, কাহাকেও নাটমন্দিরে বা অন্যত্র ধ্যানাদি করিতে পাঠাইতেন; বেলতলায় কাহাকেও পাঠাইতেন না। রাখাল ও বাবুরামকে দূরে পাঠাইতেন না, নিজের কাছে কাছে রাখিতেন। এই বিষয়টি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চক্রানুষ্ঠানের সময় উপস্থিত থাকিতেন।

বাবুরাম মহারাজ রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করিতেন। রুদ্রাক্ষমালায় শক্তি-মন্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্র দুইই জপ করার বিধান আছে। শ্রীবাবুরামের বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত শক্তিমন্ত্র থাকাও কিছু অসম্ভব নয়। ব্রজগোপীরাও ৺কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবেন বলিয়া।[১]

কেবলমাত্র কতকগুলি কঠোর অনুশাসনের বাঁধনে না রাখিয়া, রঙ্গরস কৌতুকাভিনয়ের মধ্য দিয়া শুভসংস্কারসমূহকে জাগ্রত ও সক্রিয় তথা অশুভসংস্কাররাশিকে নিস্তেজ ও পরিক্ষীণ করিয়া ঠাকুর তাঁহার বালক শিষ্যদিগকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করিতেন। অন্তরে ও বাহিরে সকল অশুভ শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যাহাতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে সেই বিষয়েও অবহিত থাকিতেন।

বসু-ভবনে মধ্যাহ্নভোজনের পর ঠাকুর আঁচাইতেছিলেন দোতলার বারান্দার নর্দমায়, বাবুরাম তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছিলেন। নীচে

১। মন্ত্ররহস্য দুর্জ্ঞেয়। লক্ষ্মীর শীতলার অংশে জন্ম, ঠাকুর তাঁহার ভাইঝি শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মী শক্তিমন্ত্র নিয়াছেন শুনিয়া ঠাকুর বলেন, 'তোরাই তো শক্তি, তোদের আবার শক্তিমন্ত্র কী? শক্তিরা সব কৃষ্ণমন্ত্রী।' ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় কৃষ্ণমন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

একতলায় তখন ছোট ছেলেমেয়েদের একটি পাঠশালা বসিত। টিফিনের সময় নাচিতে নাচিতে একটি মেয়ে তাহার অঁাচলে বাঁধা চাবির গোছাটি বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরাইতেছিল। চোখে পড়িতেই ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, দেখ্‌ দেখ্‌, মহামায়া ঠিক অমনি করেই জীবকে তাঁর আঁচলে গেঁথে নিয়ে ঘুরপাক খাওয়ান।

একরাত্রে বাবুরাম ঠাকুরের ঘরে শুইয়াছিলেন, জাগিয়া দেখেন ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় পরিধেয় বগলে করিয়া ঘরময় পায়চারি করিতেছেন, আর 'দিস নি মা, দিস নি মা, লোকমান্য—হ্যাক্‌ থু, থু!' বলিতে বলিতে থুথু নিক্ষেপ করিতেছেন। বাবুরামের মনে হইতেছিল—জগন্মাতা যেন মানযশের ধামা লইয়া ঠাকুরের পিছনে পিছনে যাইতেছেন আর বলিতেছেন, বাবা তোমার জন্যে এনেচি গ্রহণ কর। যে মানযশের কাঙ্গাল সারা পৃথিবীর মানুষ, সেই মানযশের উপর ইঁহার কী ঘৃণা!

ময়মনসিংহে ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেনঃ একদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতেই ঠাকুর বল্লেন, তোকে আজ ছুঁতে পারচি না, বল্‌ তুই আজ কী করেচিস? আমি বল্লুম, আজ কিছু অন্যায় করেচি বলে তো মনে পড়ে না। ঠাকুর বল্লেন, নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় করেচিস, তা না হলে তোকে ছুঁতে পারচি না কেন? আমি ভাবলুম ঠাকুর যদি ছুঁতে না পারেন তো মৃত্যুই ভাল। খানিক চিন্তা করার পর মনে হল, প্রাতঃকালে এক বয়স্যকে ঠাট্টা করে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলুম। ঠাকুর শুনে বল্লেন, তাই হবে, তাই তোকে ছুতে পারছিলুম না। ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা কত গভীর, এই ঘটনায় তা বুঝতে পারলুম; আর তাঁর সন্তানদের পূর্ণসত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁর কতখানি আগ্রহ তাও সেদিন হৃদয়ঙ্গম হল।

ডাফ কলেজের ছাত্র বিভূতি ঘোষের সঙ্গে বাবুরাম মহারাজের এইরূপ কথাবার্তা হয়ঃ

'হ্যাঁরে, তোদিকে moral philosophy (নীতিশাস্ত্র) কে পড়ায়?'

'Urquahart (আকু'য়াহার্ট্‌) সাহেব।'

'আমি মনে করেছিলুম মোহিত সেন। ঠাকুর আমাদিকেও moral philosphy পড়িয়েচেন।'

'সে কিরকম ?'

'একদিন রাত্রি দেড়টা, আমাকে বল্লেন, তামাকের কল্‌কেতে আগুন নিয়ে আয় তো। হাজরা মশায় বারান্দায় রয়েচেন, সামনে আগুনের খাপ্‌রা, সেখানে আগুন আনতে গেলুম। একটু দেরী হল। ঠাকুর বল্লেন, হ্যাঁরে, এত দেরী হল কেন ? বল্লুম, হাজরা মশায় রাখালকে বলছিলেন, এখানে কি শুধু রসগোল্লা খেতে এসেচ ? না চাইলে উনি কিছু দেবেন না। ঠাকুর হুঁকোর উপর কল্‌কেটি চাপিয়ে হাতে করে বল্লেন, চল্ তো দেখি, শুনি গিয়ে কী বলচে। তিনি এগিয়ে এলেন। পূবের দরজা পার হয়ে এসে যেমনি ডান পা তুলেচেন, পা-টা আর নাবল না! বল্লেন, আড়ালে-কওয়া কথা শুনতে নাই। নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে বল্লেন : তুই একজন কুলিকে দশটা পয়সা দিলি, সে নিলে না ; বারোটা পয়সা দিলি, সে তাও নিলে না ; দৌদ্দটা পয়সা দিয়ে বল্লি, যাও যাও। যে চায় সে নগ্‌দা বিদায় হয়ে যায়, যে চায় না সে সব পায় !'

চলতি নৌকায় বাবুরাম মহারাজ কলিকাতায় যাইতেছেন, কিংবা কলিকাতা হইতে মঠে ফিরিতেছেন। সেই নৌকায় কয়েক জন পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, গৌরবর্ণ এক গৈরিকধারী চুপচাপ বসিয়া আছেন, তাঁহাদের শাস্ত্রীয় জল্পে অংশ গ্রহণ করিতেছেন না। একজন প্রশ্ন করিলেন, ভেক তো দেখচি, মশায়ের প্রস্থানত্রয় পড়া আছে ? কথার মধ্যে একটা অবজ্ঞার ভাব। সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—আজ্ঞে না। আমি নিজে মূর্খ, তবে এক মহাপুরুষচরিত চোখের সামনে রাত্রদিন দেখেচি ![১]

শৈশবে পিতৃহীন বাবুরাম তাঁহার জননীর অশেষ যত্নে মানুষ হইয়াছিলেন।

১। নির্লেপানন্দ-কথিত।

আজীবন তিনিও মায়ের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন, মায়ের আদেশ পালনে তৎপর থাকিতেন। 'মা প্রত্যক্ষ দেবতা' এই বলিয়া পরবর্তী কালে যুবকদিগকে তিনি মাতৃভক্তি শিক্ষা দিতেন।

দিদি কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত ভক্তিমতী এবং বয়সেও অনেক বড় ছিলেন। মায়ের পরেই দিদি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তির স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। একদিন বসু-ভবনের বৈঠকখানার বারান্দায় বাবুরাম মহারাজ বসিয়াছিলেন, এমন সময় পূজনীয়া যোগীন-মা অন্দরমহল হইতে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। 'কর কী বাবা, কর কী বাবা, ভক্ত-অপরাধ—ভক্ত-অপরাধ—ভক্ত-অপরাধ !' বলিতে বলিতে যোগীন-মা তাঁহাকে জোড়হাতে বারবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, যোগীন-মা, তুমি আমাদের দিদির বন্ধু, তোমাকে প্রণাম করব না ?

ভাইদের প্রতি তাঁহার প্রীতি বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরামকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়া কোনও সময়ে এলাহাবাদ হইতে তিনি যে পত্র লিখেন তাহাতেই ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[১]

১। পত্রখানির কিয়দংশ এইরূপ : ভাই শান্তিরাম,···তুমি কেন ঐরূপ হুতাশ ও আক্ষেপ করিয়া পত্র লিখিয়াছ ? জান্তে বা অজান্তে পরশ পাথরকে ছুঁলে লোহা সোনা হবেই হবে। দেখছ না, কত মহাপাপী প্রভুর নাম করে দেবতা হয়ে গেল ? তুমি তাঁকে দর্শন করে বল কিনা, শয়তান ধরেছে ! মাভৈঃ মাভৈঃ—শয়তানের বাবার সাধ্য নাই যে তোমায় স্পর্শ করে। যে গর্ভে জন্মেছ, যে সঙ্গে বর্ধিত হয়েছ ও হচ্ছ, নিশ্চয় জেনো জন্মমৃত্যুর হাত এড়িয়ে গেছ।···জগতের বেশী লোকের সহিত মেশো নাই, তাই শয়তান শয়তান করছ। অর্থে, মদ্যে, মিথ্যায়ও দ্যূতক্রীড়ায় কলির অবস্থিতি। উহার কোনটিতেই ত তোমার আসক্তি নাই।···

···মাকে সামান্য জেনো না। উনি মদালসার ন্যায় ছেলের বন্ধন কামনা না করে মুক্তি কামনা করেন। ভাই, তাঁর কথা শুনো···দেখিবে সব ফরসা। আশ্রমধর্ম পালন করিবার চেষ্টা করিও। সবাই ত ফকির হয় না।···

দিদিকে প্রণাম···তুমি আমার ভালবাসা জানিবে।···ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—বাবুরাম

মা, দিদি ও ভাইরা সকলেই ভগবদ্ভক্ত এবং ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়ায় সংসারে বাবুরামকে খুব বেশী প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বরং ঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া অনিত্য মায়িক সম্পর্কগুলি ক্রমশঃ এক অমায়িক নিত্য সম্বন্ধে উন্নীত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

বাবুরামের প্রতি জননী মাতঙ্গিনী সমধিক স্নেহপরায়ণা ছিলেন। বিবাহবিষয়ে পুত্রের আবাল্য উদাসীনতা কখনও তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ হয় নাই। বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেনঃ ঠাকুর মাকে বলেছিলেন 'বিদ্যাশক্তি'। ভাইদের নানারূপ ঘরে বিয়ে হয়েছিল, তাদের জন্যে মাকে মাঝে মাঝে কথা শুনতে হত। তাই আমাকে বলেছিলেন, তোর জন্যে তো আমায় কিছু শুনতে হয় না।

তথাপি গণ্ডীবদ্ধ সংসারের খাঁচায় শ্রীবাবুরামের মত মুক্তাত্মার মন-পাখী কোনদিনই আবদ্ধ থাকিতে চাহে নাই। দীর্ঘকাল সাধুসন্ন্যাসীর খোঁজে খোঁজে থাকিয়া অবশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপনীত হইলেন, আর সেখানেই দেখিতে পাইলেন চির-আকাঙ্ক্ষিত মনের মানুষটিকে যিনি তাঁহার 'জনম মরণ কী সাথী'। সেই আপনহারা মনের মানুষটিও কিছুমাত্র ছল না করিয়া ধরা দিলেন হাতে হাতে, ধরা দিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছিলেন! ঠাকুরের অতিলৌকিক প্রেমের কাছে আত্মীয়স্বজনের স্বার্থগন্ধী মায়িক ভালবাসা তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর বাহিরে আসিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল, কিন্তু ইচ্ছামাত্রেই হইয়া উঠিল না।

পড়াশুনায় মন বসে না, তবু পড়িবার চেষ্টা করিতে হয় সংসারের চাপে। তাঁহার জননীকেও চলিতে হয় পাঁচজনের কথা শুনিয়া, সকল দিক রক্ষা করিয়া। এমন অবস্থায় বাবুরাম স্কুলে যাইতেন, শনিবার ছুটি পাইবামাত্র দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে ছুটিতেন। অন্যান্য ছুটির দিনেও তাহাই করিতেন। মাঝে মাঝে স্কুল কামাই করিতেন কিংবা স্কুলে খানিক পড়ার অভিনয় করিয়া কৌশলে ছুটি নিতেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহাতে বাধা দিতেন না বরং আনুকূল্য করিতেন। কোনদিন বা নিজেও সেই অভিসারের সঙ্গী

হইতেন। বৃন্দাবনের প্রেমলীলায় ছলাকলা উচ্চ মর্যাদা পাইয়াছে, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই হয়তো তখন তাহাতেও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

বাবুরাম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন (১৮৮৪), কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন কয়েক পরে বাবুরাম ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল যখন ঠাকুরের কাছে আছেন, বৈকুণ্ঠনাথ কহিলেন, ও পাস্ হয় নাই। ঠাকুর উত্তর দিলেন, ভালই তো, ও পাশমুক্ত হল—যার য-টা পাস্, তার ত-টা পাশ। তৎসত্ত্বেও বাবুরাম পড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। তাঁহাকে আরও কিছুকাল পড়া চালাইয়া যাইতে হইল, স্কুলে অনুপস্থিতির দিনসংখ্যাও বাড়িল।

তিনি আর একবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন কি? কথামৃতে ১৮৮৫, ৭ই মার্চের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে ঐ সময় পর্যন্ত বাবুরামের পড়ার কথা আছে, এবং আরও পড়াশুনা করিতে অনিচ্ছা এবং ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে স্থায়িভাবে বাস করার আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন নাই।

অতঃপর বাবুরাম একদিন যখন তাঁহার জননীকে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, ঠাকুর বাবুরাম-জননীকে কহিলেন, তোমার এই ছেলেটিকে ইখানকে দাও। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী উত্তর দিলেন, বাবা, আপনার কাছে বাবুরাম থাকবে এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! এই ভিক্ষা—ভগবানে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আর আমাকে যেন পুত্রকন্যার শোক না পেতে হয়। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে অভয়বাণী নির্গত হইল,—তাই হবে।

বন্ধনমুক্ত হইয়া বাবুরাম ইচ্ছামত ঠাকুরের কাছে থাকিবার ও আশ মিটাইয়া সেবা করিবার সুযোগ পাইলেন। এখন হইতে ঠাকুরের তিরোভাব পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি করিয়াছিলেন। সিদ্ধপুরুষ না হইলে সেবা করিতে পারে না, সেবা নিতেও পারে না। পূজনীয় হরি মহারাজ (তুরীয়ানন্দ) এই কথাটি বলিতেন। এখানে সেব্য

ও সেবক উভয়েই কেবল সিদ্ধই নহেন, পরন্তু, ঠাকুরের উক্তি অনুসারে 'সিদ্ধের সিদ্ধ'। সিদ্ধের সিদ্ধত্বের অনুভূতি বা বিজ্ঞানীর অবস্থাপ্রাপ্তি শ্রীবাবুরামের এই সময়ের মধ্যেই হইয়াছিল এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

পান সাজা, তামাক সাজা, বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া এই সমস্তই সেবার অঙ্গ। প্রয়োজন হইলে বাবুরাম এই সমস্তই করিতেন। কিরূপে নিখুঁতভাবে এই সব কাজ করিতে হয় ঠাকুরই তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। স্নানের পূর্বে ঠাকুরকে তিনি তেল মাখাইয়া দিতেন, গ্রীষ্মের দিনে পাখা নিয়া হাওয়া করিতেন। রাত্রে ঠাকুরের শয়নের পর হাওয়া করিতে করিতে যখনই তিনি ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতেন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া মশারির ভিতর নিজের বিছানায় শয়ন করাইতেন।

লীলাপ্রসঙ্গে আছে ঃ "ভাবাবেশ হইলে ঠাকুরের শরীরজ্ঞান না থাকায় হাত, মুখ, গ্রীবা ইত্যাদি বাঁকিয়া যাইত এবং কখনও বা সমস্ত শরীরটা হেলিয়া পড়িয়া যাইবার মত হইত। তখন নিকটস্থ ভক্তেরা এসকল অঙ্গাদি ধরিয়া ধীরে ধীরে যথাযথভাবে সংস্থিত করিয়া দিতেন এবং পাছে ঠাকুর পড়িয়া গিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হন এজন্য তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতেন। আর যে দেবদেবীর ভাবে ঠাকুরের ঐ অবস্থা সেই দেবদেবীর নাম তখন তাঁহার কর্ণকুহরে শুনাইতে থাকিতেন। যথা—কালী কালী, রাম রাম, ওঁ ওঁ বা ওঁ তৎসৎ, ইত্যাদি। এরূপ শুনাইতে শুনাইতে তবে ধীরে ধীরে ঠাকুরের আবার বাহ্য চৈতন্য আসিত।"

ঠাকুরের ভাবাবেশের সময় তাঁহার বিকারপ্রাপ্ত অঙ্গসমূহ যথাযথভাবে সংস্থিত করিয়া দেওয়া, তাঁহাকে ধরিয়া থাকা, নাম শুনাইয়া তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা আনয়ন করা—এইগুলিই ছিল শ্রীবাবুরামের মুখ্য সেবাকার্য। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কখন যে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িবেন তাহার স্থিরনিশ্চয়তা ছিল না। সেইজন্য সেবককে অবহিত থাকিতে হইত সকল সময়েই। "ভাবে আবার একটা অবস্থা হয়, তখন খালি (শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজকে দেখাইয়া) ওকে ছুঁতে পারি। ও যদি তখন ধরে তো কষ্ট হয় না, ও খাইয়ে দিলে তবে

খেতে পারি।" ঠাকুর বলিয়াছেন। আর সেইজন্যই তিনি যখন যেখানে উৎসবাদিতে যোগদান করিতে যাইতেন, বাবুরাম তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়াই বাবুরাম ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা ও প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয় দেখিয়াছিলেন।

ঠাকুর ও তাঁহার বাবুরাম ইঁহারা দুইজনেই ছিলেন যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের মানুষ। ঠাকুরের কথা-প্রমাণে বলিতে হয়, তাঁহাদের দৃষ্টিতে—বিজ্ঞানীর চোখে—সে দেশ ও এদেশের মধ্যে কোন ব্যবধানই ছিল না। বাঙ্গলার কোন মরমী কবি বলিয়াছেন :

সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর জানয়ে সকল লোকে।
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে একথা কয়ো না কাকে ॥

আর ঠাকুরও গাহিয়াছেন : মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা। কহিতে মানা বলিয়াই তাঁহাদের মনের সব কথা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহারা বলিলেও হয়তো বুঝিতে পারিতাম না, কিংবা উল্টা বুঝিতাম। যেমন গোপীপ্রেমকে দেহসর্বস্ব লোক উল্টা বুঝিয়া থাকে। আমাদের কাজে লাগিবে বলিয়া, আমাদের মত করিয়া, ঠাকুর শ্রীবাবুরামের উপস্থিতিতে, বা তাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া, যাহা কিছু করিয়াছেন বা কহিয়াছেন সেই সবই যে আমরা জানিতে পারিয়াছি এমন নহে।

বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন : দক্ষিণেশ্বরে দেখেচি, ঠাকুরের কাছে কোন ভক্ত গেলে তিনি তাকে কতভাবে আপ্যায়িত করতেন। বলতেন, পান খাবেন? পান না খেলে জিজ্ঞাসা করতেন, তামাক খাবেন? আমাদেরও তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

পত্রে কাহাকেও লিখিয়াছিলেন : 'আজকাল বড় কেহ সামাজিক ও লৌকিক সদাচার ও শিষ্ট ব্যবহার শিখিতে চায় না। ঠাকুর আমাদিগকে হাত ধরিয়া বহু যত্নে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতেন। জগৎ শিক্ষার স্থান বলিয়া জানিবে।'[১]

১। বিপ্লবী দলের সতীশ (সত্যানন্দ) মঠে যোগদানের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত পুলিশের কড়া নজরে ছিলেন। প্রথম প্রথম থানায় গিয়া হাজিরা দিতে হইত; তারপরে পুলিশের

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন ঃ বাবুরামের জ্বর। রাত্রি বারোটা। আমি এক টুকরো মিছরি তার হাতে দিতে গেলুম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, কী দিচ্ছ? আমি বল্লুম, মিছরি। বল্লেন, দিয়ো না, দিয়ো না, সাধু হতে এসেচে![২]

সাধুর পক্ষে অত্যাবশ্যক-শিক্ষার খাতিরে ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকিলেও ঠাকুর তাঁহার বাবুরামকে অতি কঠোরতা না করিতেই বলিয়াছিলেন। বাবুরামের নাতিকৃশ ও সম্ভবতঃ পিত্তপ্রধান শরীরে উপবাস সহ্য হইত না; তাঁহাকে উপবাস করিতে বারণ করিয়াছিলেন। একবার ঠাকুর বড়বাজারে মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন ব্রাহ্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য; সঙ্গে বাবুরাম। সেখানে গান গাহিতে গাহিতে বাবুরামের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। তখনই নিজে খাইবেন বলিয়া কতকগুলি সন্দেশ ও এক গেলাস জল আনয়ন করাইলেন এবং নিজে কণামাত্র গ্রহণ করিয়া উহার অধিকাংশ বাবুরামকে খাইতে দিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুই পাতায় খাবি না, কাঁসার থালায় খাবি। বাবুরাম মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন তখন তাঁহার মায়ের দেওয়া থালায় আহার করিতেন। ঠাকুরের নির্দেশে তিনি বেশীদিন মাধুকরীও করেন নাই।

তাঁহার মুখে নিম্নোক্ত ঘটনাটি অনেকেই শুনিয়াছেন। শ্রীযোগীন (যোগানন্দ) ঠাকুরের সেবার জন্য প্রত্যহ একটি করিয়া পাতিনেবু নিজেদের বাগান হইতে আনিয়া দিতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহার আনীত নেবু

লোক মঠে আসিয়া রোজ তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। লোকটি মঠের কাঁঠালতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, তিনি গিয়া দেখা করিতেন। একদিন সে নিয়মভঙ্গ করিয়া যে ঘরে সতীশ থাকিতেন উহার জানালা দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে থাকে। তিনি বাহির হইয়া যথাস্থানে আসিয়া ঐ লোকটিকে তিরস্কার করিতে থাকিলে বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—তিনি অলক্ষিতে পেছনে পেছনে আসিয়াছিলেন—তুই ওকে বকচিস কেন? ওর দোষ কী? আগে ভদ্র হও, তারপর সাধু হবে।

২। বিভূতি ঘোষ-কথিত।

স্পর্শ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, নেবুতে কোন দোষ স্পর্শ করেচে। যোগীন বাড়ীতে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ঐ বাগান তাঁহাদের লীজ নেওয়া ছিল, লীজের মেয়াদ আগের দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কতিপয় যুবককে তিনি বলিয়াছেন ঃ ঠাকুরের কাজ কি কিছু বুঝতে পারা যায়? একজন বিয়ে করেচে, সে এসে ঠাকুরের পায়ে ধরে বল্লে, স্ত্রীকে ভালবাসতে ইচ্ছা হচ্চে—এই তো মায়া!! ঠাকুর বল্লেন, তুই একদিন কিছু মিষ্টি নিয়ে আসিস, তোর মায়াটা খেয়ে দেব। সে এক চেঙারি জিলিপি নিয়ে আসে। সেইদিন রাত্রে খাওয়ার পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, অমুক কিছু এনেছিল? চেঙারি থেকে দুখানা জিলিপি তাঁর পাতে দেওয়া হল। জিলিপিতে যেই হাত দিয়েচেন অমনি যেন বিচ্ছুর কামড়ের মত জ্বালা অনুভব করে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপরে হাত ধুয়ে নিয়ে, আবার আসনে বসে জিলিপিতে হাত দেবার চেষ্টা করলেন। হাত জিলিপি পর্যন্ত গেল না। তখন বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত ধরে টানচেন আর বলচেন,—ছাড়্ মা ছাড়্, ছাড়্ মা ছাড়্, আমি যে কথা দিয়েচি! তাতেও কিছু হল না। তখন বল্লেন, এ জিলিপি তোদের খেয়ে কাজ নেই, ফেলে দিস্। সেই লোকটির বিবাহিত জীবন নানাভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিল।[১]

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিবার কালে শ্রীবাবুরামের একবার জ্বর হয়, ইহা একটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এই সাধারণকে উপলক্ষ করিয়া যে অসাধারণ ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল তাহা ভক্তজনের অনুচিন্তনীয়।

ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বাবুরাম শুইয়া আছেন জ্বর গায়ে নিয়া; নিজের খাটটিতে ঠাকুর বসিয়া আছেন আপন ভাবে মগ্ন হইয়া। গভীরা রজনী। শ্রীশ্রীমা নহবতে ধ্যানমগ্না ছিলেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার বাবুরামের অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, ক্ষুধার তাড়নায় সে ঘুমাইতে পারিতেছে না। জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, আর এক

১। সন্তোষানন্দ-কথিত।

টুকরা মিছরি হাতে করিয়া ঠাকুরের ঘরে ছুটিয়া গেলেন—যে কাজ ঐরূপ সময়ে তিনি আর কখনও করিয়াছেন কিনা জানা যায় না। একদিকে শান্ত-সমাহিতমূর্তি ঠাকুর, আর একদিকে স্নেহকাতরা জননী—দুই জনের এই দুই অনুপম ছবি বাবুরাম দেখিতেছেন আর দেহবিস্মরণ হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত লোকে তাঁহার মন চলিয়া যাইতেছে! সেই নিশীথ সময়ে ঠাকুরের শ্রীমুখোচ্চারিত 'দিয়ো না, দিয়ো না' ইত্যাদি শব্দগুলি ধ্বনিসামর্থ্যে সেই দিব্য ভাবটিকে আরও গভীর করিয়া তুলিতেছে, সাধু হইতে যে আসিয়াছে তাহার পক্ষে ঐহিক বস্তুমাত্রের তুচ্ছতা ব্যক্ত করিয়া। নতুবা, যে ঠাকুর কতবার নিজের হাতে তাঁহার প্রাণাধিক বাবুরামকে কত রাজভোগ রসগোল্লা খাওয়াইয়াছেন তিনি সামান্য এক টুকরা মিছরি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

'দিয়ো না' ইত্যাদি কথার ঈদৃশ ব্যাখ্যা যাঁহাদের মনঃপূত হইবে না, যাঁহাদের মনে হইবে যে, ঠাকুর পরোপদেশে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন মাত্র, যাহার ফলে ক্ষুধার মুখে একজন খাইতেই পাইল না, তাঁহারা এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন যে, বাবুরাম মিছরি খাইতেও পাইয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত তনয়কে খাওয়াইতে আসিয়া অন্নহাতে অন্নপূর্ণা ফিরিয়া যাইতে পারেন না।

দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠ হইতে ঠাকুর যখন কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন ব্যাধিচিকিৎসার ছলে, আরও অধিকসংখ্যক লোককে দর্শনাদি দানে কৃতার্থ করিবেন বলিয়া, শ্রীবাবুরামও তখন পূর্ববৎ তাঁহার সেবায় নিরত রহিলেন কলিকাতায় থাকিয়া, অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত মিলিত হইয়া। পালাক্রমে তাঁহারা ঠাকুরের সেবাকার্য নির্বাহ করিতেন শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধসুদ্ধ একটা বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ তো গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে

ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলচেন,—তাই তো বাবুরাম, এখন কী হবে—খাওয়ার উপায় কী হবে? কে আমায় খাওয়াবে? তখন মণ্ড খেতেন।...আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলচেন, ও বাবুরাম, ঐ যে—ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস? ঠাকুরের কথা শুনে নরেন, বাবুরাম তো হেসে খুন! এমনি রঙ্গ তিনি এদের সঙ্গে করতেন। ...তিনদিন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা আমাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যেত, আমি খাইয়ে আসতুম।[১]

বুড়োগোপালের ইচ্ছা হইয়াছিল সাধুদিগকে বস্ত্রদান করিবেন। তিনি নির্দিষ্টসংখ্যক গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া আসিলে ঠাকুর তাঁহার এগারোজন সেবক-শিষ্যকে নিজের হাতে ঐ বসন ও মালা দান করেন। শ্রীবাবুরাম ঐ এগারোজনের একজন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে লেখা আছে যে, ঠাকুর ঐ এগারোজন শিষ্যকে ক্রিয়াপূর্বক সন্ন্যাসও দিয়াছিলেন। ইহা তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস বা পূর্ণাভিষেক।

এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি।
যার তার খাস্ তোরা হইবে না হানি॥

যাহার তাহার অন্ন খাইয়া অনিষ্ট যাহাতে না হয় সেইজন্য ঠাকুর তাঁহাদিগকে ক্রিয়াবিশেষ শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

অচ্ছেদ্য প্রেমের ডোরে ভক্তগণকে একত্র গ্রথিত করিয়া ঠাকুর নিত্য-লীলায় অনুপ্রবেশ করিলেন (১৮৮৬, ১৬ই আগস্ট)। 'তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ছাড়তে একটু কষ্ট হচ্চে'—একথা ভক্তবৎসল প্রভু আগেই তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই কাঁদিবার দিন আসিল। বিরহজনিত খেদে তিন দিবস একভাবে অতিবাহিত হইল।

১। শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

থাকিবার স্থানাভাব হেতু শ্রীনরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ গুরুভ্রাতাদের মত শ্রীবাবুরামও গৃহে যাইয়া রহিলেন। তিনি কখনও কম্বুলেটোলার বাসায়, কখনও বা আঁটপুরে স্বীয় জননীর কাছে থাকিতেন। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পত্তন হইল, ভূতের বাড়ী বলিয়া কথিত জীর্ণ পুরাতন এক দ্বিতল অট্টালিকা ভাড়া করিয়া। বাবুরাম তখন মঠে যাতায়াত করিতে এবং মাঝে মাঝে রাত্রিতেও থাকিয়া যাইতে লাগিলেন।

কথামৃতকার শ্রীম'র মুখে শুনিয়াছি, বরাহনগর মঠে যোগদান করার পরেও বাবুরাম মহারাজ তাঁহার জননীর আহ্বানে কখন কখন তাঁহাদের আঁটপুরের বাড়ীতে যাইয়া থাকিতেন। ঠাকুরের মাতৃভক্তি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে লিখিত আছে, মায়ের সন্তোষ আর মাতৃপদে মন। সাধনার মধ্যে তাঁর এ এক সাধন ॥ শ্রীবাবুরামের মাতৃভক্তি সম্বন্ধেও একথাটি বলিতে পারা যায়।

বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হওয়ার কিঞ্চিদধিক দুইমাস পরে স্বামিজী যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই হঠাৎ আঁটপুরে যাইতে অভিলাষী হইলেন এবং আটজন গুরুভ্রাতা[১] ও তুলসীরামবাবুকে সঙ্গে নিয়া হরিপাল ষ্টেশন হইতে ছেকড়া গাড়ীতে করিয়া আঁটপুরে পৌঁছিলেন। তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। বাবুরাম-জননী তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; এবং ঘরে অন্য স্ত্রীলোক না থাকায় একাই কোমর বাঁধিয়া তাঁহাদের জন্য আহার্য প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন। দশ এগারো দিন ঠাকুরের সংসারত্যাগী সন্তানগণের সেবা তিনি করিয়াছিলেন।

ঘোষদের খিড়কী-পুকুরের পাড়ে কয়েকটি পুরাতন তেঁতুল গাছের কুঁদো পড়িয়াছিল, স্বামিজী ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া সেই কুঁদোগুলি পূজার দালানের প্রাঙ্গণে আনিয়া জড় করিলেন এবং ধুনী প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মমাখা দেহে সেই ধুনী বেষ্টন করিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইতে কয়েক ঘণ্টা

১। নিরঞ্জন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালীপ্রসাদ, সারদাপ্রসন্ন, গঙ্গাধর।

ধ্যান-ভজন-ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর কেবলই ভগবান যীশুখৃষ্টের কথা হইতে লাগিল। তাঁহার ত্যাগ-পবিত্রতা-প্রেমধর্মের ও তাঁহার শিষ্যগণের শ্রীগুরুর কার্যে আত্মদানের প্রসঙ্গ করিতে করিতে সকলে গভীর তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়টা ছিল যীশুর আবির্ভাব-সন্ধ্যা, কিন্তু পূর্বে ইহা কাহারও মনে ছিল না। যখন মনে পড়িল, সকলেই চমকিত হইলেন; আর ঠাকুরের ইচ্ছাতেই যে ঐরূপ হইয়াছে ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। অতঃপর তারকেশ্বরে যাইয়া সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য বাবা তারকনাথের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া সকলে বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঠাকুরের মানসপুত্র ও বাবুরামের বাল্যবন্ধু রাখাল সেই সময়ে আঁটপুরে আসিতে না পারায় বাবুরাম-জননী দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে একদিন তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া নরেন্দ্রনাথ ও বাবুরাম আঁটপুরে আসেন, বুড়োগোপালও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

বরাহনগর মঠে বিরজাহোম করিয়া ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন (১৮৮৭, জানুয়ারী)। সন্ন্যাসে আশ্রমোচিত নাম গ্রহণের বিধি আছে। শ্রীরাধার অংশে বাবুরামের জন্ম, ঠাকুরের এই উক্তি স্মরণ করিয়া স্বামিজী তাঁহাকে প্রেমানন্দ নামে অভিহিত করেন।

বরাহনগরে মঠের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও প্রেমানন্দের আবির্ভাবভূমি আঁটপুরেই একই সঙ্কল্পসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিলেন ঠাকুরের সংসারত্যাগী সন্তানেরা। প্রেমই তাঁহাদের বন্ধনডুরি, আর প্রেমকলেবর প্রেমানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসমষ্টিরূপ মণিমালিকার মধ্যমণি।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে, প্রেমানন্দ তাঁহার দুই গুরুভ্রাতা সারদানন্দ ও অভেদানন্দের সঙ্গে ৺পুরী যাত্রা করেন। হাঁটাপথে তাঁহারা পুরী যান এবং পুরীর এমার মঠে বাস ও

ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকেন। ছাত্রজীবনে ব্যায়ামচর্চা করিয়া শ্রীবাবুরাম তাঁহার দেহযন্ত্র সুগঠিত ও কষ্টসহনক্ষম করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ললনাসুলভ দেহলতিকা অতিরিক্ত কঠোরতার চাপ সহ্য করিতে পারিত না।[১] পুরীতে মাসাধিক তপস্যা করিবার পর তিনি সান্নিপাতিক জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। যাহা হউক, দুই গুরুভ্রাতার সস্নেহ সেবায় বিগতাময় হইয়া ক্রমশঃ তিনি পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। আগষ্ট মাসের শেষের দিকে তাঁহারা বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার পথে গরুর গাড়ীতে করিয়া আসিয়া ভুবনেশ্বরে ৺লিঙ্গরাজ-দর্শনাদি করিয়াছিলেন। এই তীর্থযাত্রার অতি সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ স্বামী অভেদানন্দ এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ঃ পুরীতে বাবুরামের সহিত ভ্রমণ—রামানুজাচারী বৈষ্ণবদের এমার মঠে বাস —সেখানে দীর্ঘ তপশ্চর্যা—কোণারকে সূর্যমন্দির দর্শন—বালুকাময় সমুদ্র-সৈকত দিয়া চিল্কাহ্রদে গমন—খণ্ডগিরি উদয়গিরি দর্শন—...সম্রাট অশোকের ধাউলি পর্বতের অনুশাসন দর্শন—অরণ্যে ব্যাঘ্রদুগ্ধ পান—যোগী সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানকালে বাচ্চা সহ অবস্থিত ব্যাঘ্রীর কবল হইতে অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা।[২]

পরবর্তী বৎসরের কোন সময়ে বাবুরাম মহারাজ ৺কাশীধামে গমন করেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা প্রায় সকলেই তখন তীর্থ-পর্যটনে ও তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। কাশীতে তিনি স্বামিজী, মহাপুরুষ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে মিলিত হন।

১। শ্রীবাবুরামের কোন কোন অঙ্গে নারীজনোচিত লক্ষণও ছিল। তাঁহার হাতে পায়ে বুকে লোম ছিল না; মাথায় ঘনকৃষ্ণ চুল (ছোট করিয়া ছাঁটা); কণ্ঠস্বর কমনীয়। তাঁহার কথাবার্তায় আবেগ উত্তেজনা প্রকাশ পাইত। একটি ফতুয়া কিংবা চাদর দিয়া তিনি প্রায় সর্বক্ষণ নিজের অঙ্গ আচ্ছাদিত রাখিতেন। চাদবের কিয়দংশ মাথায় রাখিয়া যখন তিনি চলাফেরা করিতেন সেই সময় দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলে নারী বলিয়া ভ্রম জন্মিত।

২। স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা।

১৮৯০, মার্চ মাসে গাজীপুরে গিয়া তাঁহার জ্বর হয়। স্বামিজী সেই সময়ে গাজীপুরে ছিলেন। ৩১শে মার্চ কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামিজী লিখিয়াছেন ঃ 'অভেদানন্দ ভায়া কাশীতে প্রিয় ডাক্তারের নিকট আছেন। আর একটি গুরুভাই (বাবুরাম) আমার নিকট ছিলেন, তিনি অভেদানন্দের নিকট গিয়াছেন। তাঁহার পৌঁছা সংবাদ পাই নাই। তাঁহারও শরীর ভাল নহে। তজ্জন্য চিন্তিত আছি।' স্বামী অভেদানন্দ তখন রক্তামাশয়ে ভুগিতেছিলেন, কাশীতে আসিয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সেবায় ব্রতী হন।

ঐ বৎসর ১৩ই এপ্রিল তারিখে ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত ও তাঁহার ত্যাগী সন্তান-গণের একান্ত সুহৃদ বলরাম বসু মানবলীলা সম্বরণ করেন। সংবাদ পাইয়া স্বামিজী কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং শান্তিরাম তাঁহার মধ্যমাগ্রজকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য সহসা কাশীধামে যাইয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে বাবুরাম মহারাজ প্রথমতঃ বরাহনগর মঠে আসেন এবং তারপরে স্বীয় ভগিনী ও গর্ভধারিণীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য স্বামিজী, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইদিগকে সঙ্গে নিয়া বসু-ভবনে যান।

এই ঘটনার স্বল্পকাল পরে, ২৫শে মে, ঠাকুরের অন্যতম রসদ্দার সুরেশচন্দ্র মিত্র দেহত্যাগ করিলে মঠের আর্থিক দুরবস্থা চরমে উঠে। অনাহারে অর্ধাহারে থাকিয়া, নুনভাত, শাকভাত বা তেলাকুচাপাতার ঝোল সহকারে ভাত খাইয়া নবীন সন্ন্যাসীরা তপস্যাময় জীবন যাপন করিতেন। 'সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত!' বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায়ও যদি কোনদিন কোন গৃহী ভক্ত উত্তম ভোজ্যদ্রব্য লইয়া মঠে আসিতেন, ঠাকুরকে ভোগ দিয়া উহার অধিকাংশ ভক্তসেবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত ও বাকিটা নিজেরা ভাগ করিয়া খাইতেন। চিরদিন স্বল্পাহারী ও ভোগসুখে উদাসীন বাবুরাম মহারাজ নিজের ক্ষুদ্র অংশটুকুও খাইতে চাহিতেন না, শশী মহারাজ কিংবা নিরঞ্জন মহারাজ তখন জোর করিয়া উহা তাঁহার মুখে গুঁজিয়া দিতেন। এই দুঃসময়ে ঠাকুরের সেবা চালাইবার জন্য শশী মহারাজ বরাহনগরে ধনীর

সন্তান নারায়ণ দত্তকে পড়াইয়া—অঙ্ক ও ইংরাজী শিখাইয়া—মাসে ত্রিশ টাকা সংগ্রহ করিতেন।

এই বৎসর আগষ্ট মাসে স্বামিজী দীর্ঘকালের জন্য পরিব্রাজকবেশে বহির্গত হন। যাইবার সময় বসু-ভবনে শান্তিরামবাবুকে বলিয়াছিলেন, শান্তিরাম, আমি চল্লুম, বাবুরামকে দেখো।

বাবুরাম-জননী তাঁহার পৌত্র হরেরামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিহিটা ষ্টেশনের নিকটবর্তী কাঁটিয়া গ্রামে যান ও কয়েক মাস তথায় বাস করেন (১৮৯২)। বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ ও শান্তিরামবাবু তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।[১]

অতঃপর মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয় (১৮৯৩)। বাবুরাম মহারাজের তৎকালীন মানসিক অবস্থাটি পরবর্তী কালে (২০।১১।১৫) তাঁহাকে লিখিত পূজনীয় হরি মহারাজের এক পত্রে অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন: তোমাতে প্রভু ভিন্ন অন্য কিছুর তো আর স্থান নাই। মনে পড়ে মঠের একদিনের কথা। সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্ছলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়াছিলাম তোমার 'যথা যথা দৃষ্টি যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরে।'...এমন বস্তুটি দেখিলে না যাহা হইতে প্রভুর স্মরণ না করিলে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না; আমার কিন্তু উহা চিরদিনের

১। কাঁটিয়ায় চৈত্র মাসের গরমে অসুস্থ হইয়া পড়িলেও বাবুরাম-জননী ঔষধ খাইতে চাহিতেন না। পত্রে সে কথা জানিতে পারিয়া নিরঞ্জন মহারাজ ঐ মাসের ১২ই তারিখে বাগবাজার হইতে লিখিয়াছিলেন: ভাই শান্তিরাম,...তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বলিবে যে, ঔষধ খাইতে কোন পাপ নাই, বরং না খাইলে দোষ। বুঝাইয়া বলিবে যে, শ্রীগুরু মহারাজ নিজে ঔষধ খাইতেন এবং অপরে পীড়িত হইলে তাহাকে ঔষধ খাইতে বলিতেন। দোষ থাকিলে কি তিনি বলিতেন? তোমার মাতা যেন কোন মতে ঔষধ খাইতে অমত না করেন।

জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল, হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই নাম তাঁহাতে মগ্ন (ডাইলিউট) হইয়া যাওয়া।

শ্রীরাখাল ও শ্রীহরি (ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ) ঠাকুরের এই দুই সন্ন্যাসী সন্তান বৃন্দাবনে তপস্যানিরত ছিলেন। আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হওয়ার পরেই ঠাকুরের কাজের জন্য আহূত হইয়া হরি মহারাজ মঠে চলিয়া আসেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে মহারাজও[১] চলিয়া আসেন। ব্রজের রাখালের বৃন্দাবনবাস সম্পূর্ণ হইলে ব্রজগোপীর পালা আসিল, বাবুরাম মহারাজ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনের পুণ্যরজঃ স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্মান্তরস্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া থাকিবে, তিনি রাধাপ্রেমে বিভোর ও সময়ে সময়ে দেহবোধশূন্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। 'প্যারীজী, প্যারীজী' বলিতে বলিতে তিনি বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিতেন, রাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর প্রত্যক্ষ দর্শনও পাইয়াছিলেন—এ কথা আগেই বলা হইয়াছে।

বৃন্দাবনের পথে মথুরায় আসিয়া তাঁহার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন ঃ হাতরাস থেকে হেঁটে বৃন্দাবন যাই। মথুরায় গিয়ে ভাবলুম, শুনেচি এদেশের লোক খুব সাধুভক্ত, কাউকে তো দেখচি না! এমন সময় একটি লোক এসে আহ্বান করে নিয়ে গেল শহরের উপকণ্ঠে তার ঘরে। ঘরের মধ্যে দুটি খাটিয়া, একটিতে বসতে দিলে। দুটি ভাত করেছিল, খেতে দিলে। খাবার পর তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলুম সে জাতিতে বাসফোট্—ডোম, যারা মড়া ফেলে।[২]

বৃন্দাবনবাস সম্পূর্ণ করিয়া ফিরিবার পথে যখন তিনি আবার মথুরায় আসেন, এক পাঞ্জাবী ডাক্তার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঘরে নিয়া যায় ও

১। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে স্বামী বিবেকানন্দ 'স্বামিজী' এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'মহারাজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

২। গৌরীশানন্দ-কথিত।

কিছুদিন রাখিয়া সাধুসেবা করিতে চায়। নিষেধ সত্ত্বেও উত্তম উত্তম সুখাদ্য সে তাঁহাকে খাইতে দিত—এমন সাধু সে আর কখনও দেখে নাই! বাবুরাম মহারাজের আমাশয় ছিল, বাড়িয়া গিয়া রক্তবাহ্যে হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় তিনি এটোয়ায় তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীহরি[illegible]ন্নের কাছে চলিয়া আসেন। হরিপ্রসন্ন এটোয়ায় সরকারী উচ্চপদে কার্য করিতেন, ঔষধপথ্যের সুব্যবস্থা করিয়া বহুযত্নে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলেন। ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ (বিরজানন্দ) এই সময়ে বৃন্দাবনে ছিলেন, তাঁহার অসুখের খবর পাইয়া সেবা করিতে আসেন। কালীকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন (১৮৯৭, ফেব্রুয়ারী)।[1]

বৃন্দাবনে ঠাকুরের ভাবাবেশ ও আচরণ সম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) জানিতে পারেন ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুজ্যের নিকট হইতে। পরপর দুইখানি পত্র লিখিয়া (১৮৯৫, ২৬শে ও ৩০শে ডিসেম্বর) সেই ঘটনাগুলি তিনি জানাইয়া দিয়াছিলেন তৎকালে বৃন্দাবনবাসী তাঁহার গুরুভ্রাতা বাবুরাম মহারাজকে, তাঁহার স্মরণমননরূপ তপস্যার আনুকূল্য করিবার জন্য।[2]

১। গৌরীশানন্দ-কথিত।

২। পত্র দুইখানির অধিকাংশ এইরূপ : শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রথমতঃ মথুরায় নামিয়া ধ্রুবঘাট প্রভৃতি দর্শন করেন। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে থাকেন।...বৃন্দাবনে তিনি সর্বদাই ভাবাবেশে থাকিতেন। এক পা-ও হাঁটিতে পারিতেন না, পাল্কী করিয়া লইয়া যাইতে হইত। পাল্কীর দ্বার খোলা থাকিত, তিনি দর্শন করিতে করিতে যাইতেন। যখন ভাবে অধীর হইয়া পাল্কী হইতে লাফাইয়া পড়িতে চাহিতেন তখন হৃদয় নিবারণ করিত। হৃদয় পাল্কীর বাড় ধরিয়া যাইত। তিনি ঐরূপ হৃদয়ের সহিত শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দর্শনে যান।...পথে যাইতে যাইতে শ্বেত ময়ূরের পাল তিনি অগ্রে দর্শন করেন ও হৃদয়কে দেখান এবং ভাবে অধীর হইয়া পাল্কী হইতে লাফাইয়া পড়িতে চান। পরে হরিণের দল দেখিয়া তাঁহার খুব ভাবোদয় হয়। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন করত তাহাদের সমীপবর্তী সমুদয় দেবালয়গুলি দর্শন করেন। মথুর প্রায় ১৫০ টাকার

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দলভুক্ত হইয়া (১৯০৪), এবং মহারাজের সঙ্গে ভদ্রক হইয়া (১৯০৬, জুন), বাবুরাম মহারাজ দুইবার পুরী গিয়াছিলেন।[১] ইহার পরেই স্বীয় গর্ভধারিণীকে সঙ্গে নিয়া সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসেন।[২]

পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে দুইবার তিনি পুরী গিয়াছিলেন, শশী মহারাজকে লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্র হইতে জানা যায়। পুরী হইতে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন (১৯০৭, ৫ই মে): 'যদি ভক্ত আলাসিঙ্গাকে বলে

সিকি ও দুআনি বিতরণের জন্য হৃদয়ের হস্তে দিয়াছিল, তিনি সাধুবৈষ্ণব দেখিলেই হৃদয়কে কিছু কিছু দিতে বলিতেন। পরে গোবর্ধন দর্শনে যান। তথায় উলঙ্গ হইয়া একেবারে গিরিরাজের উপর উঠিয়া পড়েন। পাণ্ডারা ধরিয়া নামাইয়া আনে। তৎপরে নিধুবনে গঙ্গামাতার নিকট যান।...তাঁহার নিকট প্রায় ৬।৭ দিন ছিলেন।...

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ রাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী চতুরাপাণ্ডা নামে একজনের নিকট ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দর্শনের সময় তাঁহার হাতে সর্বদাই একটি কাঁচা কঞ্চির ছড়ি থাকিত। তাহা যদি হৃদয় কখন কখন কাড়িয়া লইত তিনি তাহাতে অতিশয় কাতর হইতেন এবং যতক্ষণ না ফিরিয়া পাইতেন ততক্ষণ স্থির হইতেন না। এক পা-ও হাঁটিতে পারিতেন না—এমনকি পাল্কীর ভিতর বসিয়া যমুনায় স্নান করিতেন। [উদ্বোধন—পৌষ, ১৩৪৯]

১। ৺রথযাত্রার পূর্বে (১৯০৬) মহাপুরুষ ও গঙ্গাধর মহারাজ (অখণ্ডানন্দ) পুরীতে আসেন। চারি গুরুভ্রাতা মিলিয়া আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামী অভেদানন্দকে অভ্যর্থনা করিতে যান পুরী ষ্টেশনে (২৩শে আগষ্ট)। ইহার দুইদিন পরে শশী মহারাজও পুরীতে আসেন স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে করিয়া। এইরূপে পুরীর 'শশী নিকেতনে' ছয় গুরুভ্রাতার একত্র মিলন সংঘটিত হয়।

২। ১৯০৭, ২৮শে জানুয়ারী নিউইয়র্ক হইতে স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন: ভাই শশী, বহুদিন তোমার পত্রাদি না পাইয়া ভাবিত আছি।...বসন্তের মুখে শুনিলাম যে তুমি ৺রামেশ্বর-দর্শনে গিয়াছিলে বাবুরাম ও তাঁহার মাকে লইয়া। আশা করি নির্বিঘ্নে ৺রামেশ্বর দর্শন করিয়া মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিয়াছ।

১৯০৮, ২৪শে ডিসেম্বর বেলুড় হইতে শশী মহারাজকে বাবুরাম মহারাজ লিখিয়াছেন: মহারাজজী যদি কাঞ্চীপুর যান তবে কামাখ্যামায়ীর মন্দিরে সেই ব্রাহ্মণটির দ্বারা দেবীর সহস্রনাম-স্তোত্র অবশ্য অবশ্য শুনাইবে। সে ভাবটি কখনও ভুলিব না, অতি সুন্দর!

আমার জন্য ২।৪ খানা স্বামিজীর বই পাঠাও পরম বাধিত হইব। একা আছি তাই পড়িতে ইচ্ছা হয়।' অন্যপত্রে লিখিয়াছেন (১৯০৭, ২৭শে নভেম্বর): 'আমি গত শনিবার রাজার ইচ্ছায় এখানে এসেছি। বোধ হয় আগামী রবিবারের মধ্যেই মহারাজ প্রভৃতি সকলকেই কলিকাতা অভিমুখে যাইতে হইবে। মধ্যে ভুবনেশ্বর ও ভদ্রকে কিছুদিন কাটাইবার ইচ্ছা।'

মহাপুরুষ ও হরি মহারাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া বাবুরাম মহারাজ কাশ্মীরে ৺অমরনাথ দর্শন করিতে যান। এই তীর্থযাত্রায় স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ও ব্রহ্মচারী গুরুদাস তাঁহাদের সঙ্গী ছিলেন। অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করিয়া আসিয়া তাঁহারা শ্রীনগরে হাউসবোটে এক মাস বাস করেন। তারপরে কনখলে কয়েকদিন ও কাশীতে প্রায় তিন মাস কাটাইয়া বাবুরাম মহারাজ মঠে চলিয়া আসেন (১৯১০, ডিসেম্বর)। কাশীতে জ্বর হইয়া তিনি মাসাধিক কষ্ট পাইয়াছিলেন।

দেবদৃষ্টিতে রক্তমাংসের মানুষও দেবতারূপে প্রতিভাত হন। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরের মেয়েরা সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। মঠে ফিরিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, কাশ্মীরে দেখলুম, সব দেবী! ইহার পরেও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি দুইবার কাশীতে (১৯১৩, ১৯১৬), এবং একবার পুরীতে (১৯১৫) গমন করিয়াছিলেন।

·

১৮৯৭, ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার আদেশে শশী মহারাজ ঠাকুরের ভাবধারা প্রচার করিবার জন্য মাদ্রাজে যান এবং বাবুরাম মহারাজ মঠে ঠাকুরের সেবাপূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন (মার্চ, ১৮৯৭)। ইহার এগারো মাস পরে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে এগারো মাস থাকিয়া নবনির্মিত নিজস্ব বাড়ীতে উঠিয়া আসে (২রা জানুয়ারী, ১৮৯৯)। নিয়মিতভাবে কিছুকাল ঠাকুরের সেবাপূজা করিয়া বাবুরাম মহারাজ দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, মঠ-প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্বে ফিরিয়া আসেন।

এই পরিভ্রমণকালে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। স্বামিজী সদলবলে নৈনিতালে আসিলে বাবুরাম মহারাজ আলমোড়া হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান ও তাঁহার হাতে চোট লাগে। বাল্যকালেও একবার বৃক্ষ হইতে পড়িয়া তিনি বাঁ হাতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, হাতটিও আর সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হইতে পার নাই।[১]

মঠ-প্রতিষ্ঠার সাত আট মাস পরে স্বামিজী দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী হইতে তিনি তাঁহার আমেরিকা-প্রবাসী গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দকে লিখিলেন: গঙ্গাধর ও তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা—এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কর্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন।

স্বামিজী তাঁহার মর্ত্য জীবনের অবসান সন্নিকট জানিয়াই নিজেকে সব রকমে প্রস্তুত করিয়া নিতেছিলেন। দেশে ফিরিবার মাস কয়েকের মধ্যে তিনি বেলুড় মঠ ঠাকুরবাটী দেবোত্তর করিয়া ও গুরুভাইদের এগারো জনকে সেই দেবোত্তর সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করিয়া দলিল নিষ্পন্ন করেন। বাবুরাম মহারাজ অছিগণের অন্যতম।

কিরূপে মঠ পরিচালনা করিতে হইবে, কিরূপে জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে হইবে, স্বামিজী বাবুরাম মহারাজকেই বিশেষ-ভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মটে নিত্য শাস্ত্রচর্চা হয় ও একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, স্বামিজী তাঁহার এই দুইটি ইচ্ছাও বিশেষভাবে বাবুরাম মহারাজের কাছে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন, স্বামিজীর প্রথম ইচ্ছাটির প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিতেন, আর মঠে একটি টোল সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছাটিও আংশিকভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

১। দক্ষিণেশ্বরে রেলিঙের উপর পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের বাঁ হাতের হাড় স্থানচ্যুত হওয়ার ঘটনাটি এস্থলে স্মরণীয়।

১৯০২, ৪ঠা জুলাই। সেদিন ঠাকুরের ভোগের জন্য গঙ্গার একটি ইলিশ ক্রয় করা হয়, এবং বাবুরাম মহারাজকে পাশে বসাইয়া ঐ মাছের ভাজা-ঝোল-অম্বল দিয়া স্বামিজী পরম তৃপ্তির সহিত আহার করেন। এইরূপে তাঁহাকে পাশে করিয়া স্বামিজী মাঝে মাঝে আহারে বসিতেন এবং উভয়ে উভয়ের থালা হইতে প্রসাদান্ন তুলিয়া খাইতেন। আহারের কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে কহিলেন, 'Fish wants water to swim (মাছ জল চায় সাঁতার কাটবার জন্যে), দে, এক গ্লাস জল দে।' বিকালে তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া প্রায় এক মাইল বেড়াইয়া আসিলেন; মঠে ফিরিয়া তাঁহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস শুনাইলেন; আর সেই দিনই রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিট সময়ে সত্যসঙ্কল্প স্বামিজী সমাধিযোগে মরদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্বামিজীর আকস্মিক দেহত্যাগে বাবুরাম মহারাজ এতই অভিভূত হন যে, ঠাকুরের প্রাত্যহিক সেবাপূজা করিতেও অক্ষম হইয়া পড়েন। তাঁহার আদেশে স্বামিজীর সন্ন্যাসশিষ্য আত্মানন্দ (শুকুল মহারাজ) ঠাকুরের নিত্যপূজা করিতে থাকেন। প্রায় দুই বৎসর অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি ঠাকুরপূজা করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর তাঁহার ত্যাগী সন্তানেরা আঁটপুরে মিলিত হইয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার অভিপ্রেত কার্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিবেন। স্বামিজীর তিরোধানের পর সেই সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকিয়া নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। আমেরিকা-প্রবাসী গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দকে বাবুরাম মহারাজ লিখিলেন: 'আমাদের যার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু স্বামিজীর কার্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। এই আমাদের সঙ্কল্প।'

ইতঃপূর্বে ঠাকুরের গৃহী ও ত্যাগী সন্তানগণের মধ্যে কিছুটা মনান্তর ঘটিয়াছিল। বাবুরাম মহারাজের কার্য দেখিয়া মনে হয়, তিনি সেই মনান্তর মুছিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে

জানুয়ারী ঠাকুরের গৃহী ভক্ত মনোমোহন মিত্র দেহরক্ষা করেন তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে। মুমূর্ষু গুরুভ্রাতার অন্তিম শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন তিনদিন ধরিয়া, এবং মঠে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটিও সুনিষ্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া।

ঠাকুরের জন্মোৎসবের পরে, তাঁহার মানসপুত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ 'মহারাজ' সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হন ও চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় বসু-ভবনে স্থানান্তরিত করা হয় (১৯০৪)। দীর্ঘ একচল্লিশ দিন পরে জ্বরত্যাগ হইলেও এই অসুখ হইতেই মহারাজের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বালক-ভাবটিও প্রকট হইয়া উঠে। তাঁহাকে কাজের ঝঞ্ঝাট হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে দেওয়াই গুরুভ্রাতারা—বিশেষতঃ মঠ ও মিশনের সম্পাদক শরৎ মহারাজ কর্তব্য বিবেচনা করেন। তখনকার দিনে বেলুড়ে খুব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল, একসঙ্গে অধিকদিন মঠে থাকিলে মহারাজের শরীর ভাল থাকিত না। মিশনের কাজ, উদ্বোধন-সম্পাদনা ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবা পরিচালনার জন্য শরৎ মহারাজকেও প্রায়শঃ কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইত। এইরূপ অবস্থায় মঠ-পবিচালনার কাজটি আপনা হইতেই বাবুরাম মহারাজেব উপব আসিয়া পড়ে, আর উহাই ঠাকুরের অভিপ্রায় জানিয়া তিনিও বিনা প্রতিবাদে প্রাপ্তকর্তব্য করিয়া যাইতে থাকেন। দিনে দিনে কর্তব্যের প্রসার ঘটে। এক কর্তব্যের সঙ্গে আর এক কর্তব্য আসিয়া দিবাবাত্রির প্রায় সর্বক্ষণ তাঁহাকে ব্যাপৃত করিয়া রাখে। সেই কর্তব্যসমূহকে নিম্নোক্ত প্রধান চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ঠাকুবসেবা।

(২) মঠে যোগদানকারী ও যাতায়াতকারী যুবকদের চরিত্র গঠন, বা মানুষ তৈরি করা।

(৩) যেসকল নবনারী একবারও মঠে আসিতেন তাঁহাদিগকে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াইয়া ও কথামৃত পরিবেষণ করিয়া আপ্যায়ন—অন্যকথায়, ভক্তসেবা।

(৪) মঠের ভিতরে ও বাহিরে উৎসবাদি করিয়া ও উৎসবাদিতে যোগ দিয়া জনসাধারণকে ঠাকুরের ভাবে অনুপ্রাণিত করা।

শেষোক্ত কাজটি করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ দূরবর্তী স্থানসমূহে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছেন। ইহার ফলে ঠাকুরের ভক্তসংখ্যা বাড়িয়াছে, বহু যুবক মঠে আসিয়া ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়াছে, স্থানে স্থানে মুসলমানেরাও ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িক উদার ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' বলিতে বলিতে নিরভিমান নিরহঙ্কার সন্ন্যাসী এই সমস্ত কর্তব্যের গুরু দায়িত্ব বহন করিয়াছেন অম্লানে চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া। মানুষের মঙ্গলসাধন-ব্রতে প্রেমানন্দ তাঁহার প্রেমের সম্পুট সকলের কাছেই উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন, আপন-পর উচ্চ-নীচ বিচার না করিয়া। সেই আত্মদানের শ্রবণমঙ্গল স্মরণমঙ্গল কাহিনী প্রেমলেশহীন অক্ষমের লেখনীমুখে বর্ণিত হইবার নহে। তথাপি মহাজনবাক্য অনুসরণ করিয়া—আপনাকে শোধন করিবার জন্য—যথাশক্তি বলিয়া যাইতেই বা বাধা কোথায়?

ঠাকুরসেবা

মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্বধর্মসমন্বয়মূর্তি সর্বভাবময়বিগ্রহ ঠাকুর। তিনি অপ্রকট হইলে তাঁহার সেবাপূজাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন, অনেক গুরুভাইয়ের স্পষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও, দাস্যভক্তির মূর্তবিগ্রহ শশী মহারাজ। আর আঁকড়াইয়া ছিলেন বলিয়াই, জগদ্‌গুরুকে কেন্দ্র করিয়া এত সহজে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল। গুরুভাইদিগকে অছি করিয়া স্বামিজী অর্পণনামা করিয়াছিলেন বেলুড় মঠ ঠাকুরবাটীর ঠাকুরসেবা পরিচালনার জন্যই।

শশী মহারাজ কৌল সাধকের সন্তান; তাঁহার রচিত ঠাকুরের পূজাবিধিতে শাস্ত্রীয় অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার স্থান পাইয়াছে। বাবুরাম মহারাজ বৈষ্ণব-ঘরের ছেলে; তাঁহার কৃত ঠাকুরপূজায় ভাবের দিকটাই প্রাধান্য লাভ করিত।

দেবতা হইয়া দেবতার পূজা কর—ইহাই পূজাবিধির সব চেয়ে বড় কথা; আর সেইজন্যই পূজার পূর্বকৃত্যসমূহের মধ্যে ভূতশুদ্ধিই প্রধান। এই ভূতশুদ্ধির জন্য মন্ত্রাত্মক, ক্রিয়াত্মক ও ভাবনাত্মক বিধানসমূহ রহিয়াছে। ভক্তিপথের সাধকেরা ভাবনাত্মক দিকটার উপরেই জোর দিয়া থাকেন—ইষ্ট-সম্বন্ধী নিজের চিন্ময়রূপ বা সিদ্ধরূপ ধারণায় আনিবার চেষ্টা করেন। পূজার আসনে না বসিতেই দেবী-ভাবে মগ্ন হইয়া পূজ্যদেবতার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে যিনি নিবেদন করিয়া দিতেন তাঁহার অত বিধি পালন করিবার অবসর কোথায়? উহার প্রয়োজনই বা কী থাকিতে পারে?

পূজাবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাবুরাম মহারাজ লিখিয়াছেন:

'বাহ্য আড়ম্বর একেবার ছেড়ে কেবল মনপ্রাণ এক করে মার পায়ে ফুলজল দিলেই মা গ্রহণ করেন। যখন মনপ্রাণ দিতে ভুলতে লাগল তখনই মন্ত্রতন্ত্রের সৃষ্টি সুরু হল।'

'ঠাকুরকে মনে মনে পূজা করবে। মন-ফুলে নয়নজলে কর তাঁর অর্চনা। ঠাকুর মন দেখেন, অত ফুলটুলের দিকে তিনি নজর দেন না।'

বাবুরাম মহারাজের ঠাকুরসেবা দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন এমন দুইজনের বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

কমলেশ্বরানন্দের লেখা ঃ

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া···মহারাজের ঘরে আসিতেন এবং করজোড়ে 'দণ্ডবৎ মহারাজ, দণ্ডবৎ' বলিয়া প্রণাম জানাইতেন। মহারাজ প্রত্যুত্তরে মৃদুহাস্যে বলিতেন, 'এস বাবুরামদা, এস।' এই সম্ভাষণের মধ্যে একটা অমৃতময় প্রেমপ্রবাহ বহিয়া যাইত। মহারাজের অনুমতি লইয়া নামিয়া মঠের কাজকর্মে মন দিতেন। ···ঠাকুরের ভোগাদির আয়োজনে তিনি প্রথম মন দিতেন। একবার বাগানের দিকে গিয়া গাছপালা ফুলফল সব দেখিয়া আসিয়া সেদিন কী রন্ধন হইবে স্থির করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেন। অনেকদিন কুটনো কোটার সময় উপস্থিত থাকিয়া আমাদের লইয়া কুটনো কুটিতেন।···আমাদের শিক্ষা দিতেন—ওরে, তোদের practical (কর্মকুশল) হতে হবে। ঠাকুরের সব জিনিসপত্রের উপর আত্মীয়তা বোধ করতে হবে। ঠাকুরের কোন জিনিসের অপচয় যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।···

কুটনো কুটিবার পর একটু তেল মাথায় দিয়া অতি দ্রুতগতিতে গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিতেন। কাপড় পরিয়া, কমণ্ডলু ভরিয়া জল লইয়া দ্রুতপদে ঠাকুরঘরে যাইতেন। পূজার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত। সামান্য একটু মন্ত্র দ্বারা সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া ঠাকুরের স্নান সমাপন করিতেন এবং জলখাবার প্রদান করিতেন। বেদী পুষ্পসজ্জিত করিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পদরজপূর্ণ কৌটাটি পূজা করিয়া শিবপূজাতে পূজা শেষ করিতেন। ঠাকুরের শ্রীপাদুকার উপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, স্বামিজীর ও যোগানন্দস্বামীর পূজা করিয়া পাত্রাবশিষ্ট পুষ্প লইয়া গঙ্গাপূজার জন্য বাহির হইতেন। কখন কখন লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি পূজাকালে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বিলুণ্ঠিতকায়ে আত্মনিবেদন করিতেন।···তিনি যখন

পুষ্পপাত্রটি লইয়া গঙ্গামায়ীর পূজার জন্য উপর হইতে নামিয়া আসিতেন তাঁহার তখনকার মুখশ্রী অপূর্বভাব ধারণ করিত।[১]

রামেশ্বরানন্দের কথা :

সকাল হইতে শয়ন পর্যন্ত সবটুকু সময় বাবুরাম মহারাজের ঠাকুরসেবায় ভক্তসেবায় কাটিত—যেন মূর্তিমতী সেবা।

তাঁহার ঠাকুরসেবা ছিল জীবন্ত। ঠাকুর এই ঘুম হইতে উঠিলেন, মুখ ধুইলেন, বিশ্রাম করিতেছেন, এইবার আহার করিবেন, এখন ফুলবাগানে একটু বেড়াইতে গেলেন। দেখিস তাঁহার চলাফেরার কোন কষ্ট না হয়। রাস্তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে গোলাপের কাঁটায় ভরা ডালগুলি ; ওগুলি কেটে দে, ঠাকুরের কাপড়ে লাগিবে। পানটি ভাল করিয়া সাজিস, দেখিস বাবা, চূণে তাঁহার মুখ না পুড়িয়া যায়। ঠাকুর গরম ভাত খাইতে ভালবাসিতেন, ঠাণ্ডা না হইয়া যায়। চন্দনে যেন খিচ্ না থাকে। সুগন্ধি পুষ্পে ও ধূপে ঠাকুরঘর যেন আমোদিত থাকে; দক্ষিণেশ্বরে তিনি ফুল ধূপধূনা ভালবাসিতেন। এইসব প্রীতির সেবা ব্রহ্মচারীদের দ্বারা করাইয়া নিতেন। ঠাকুরকে শয়ন দিয়া মশারি ফেলিয়া মানসে তাঁহার পদসেবা করাইতেন। ঠাকুরের শয়নঘরের পাশে টুলের উপর একগ্লাস জল, দুইটি পান রাখিয়া দিতে হইত, যদি হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায় তো উঠিয়া খাইবেন। ভোরে ঠাকুরকে শয়ন হইতে তুলিয়া আস্তে আস্তে জল গাড়ু হইতে ডাবরে ফেলিতে হইত, তিনি মুখ হাত ধুইবেন। ঠাকুরের ফোটোতে পরানো জামা কাপড় বদলানো, ইঁদুরে কাটিল কিনা দেখা, সব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন।

তখন (১৯১৬-১৭) মঠে ঠাকুরপূজা করি। একদিন ডাকিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে, ঠাকুরের কাপড়চোপড় সব ঠিক আছে তো? দেখ্ বাবা, সব দেখ্

১। ব্রহ্মচারী জ্ঞান বলেন : কত যত্নে একটি ফুল বেছে নিয়ে বক্ষে ধারণ করে, ধ্যান করে, কত যত্নে সেটি নিবেদন করতেন। পূজাশেষে যখন নেমে আসতেন, মুখের সে কী গম্ভীর ভাব!

ভাল করে। আমি একখানি নূতন কাপড় ঠাকুরকে নিবেদন করে পরতে যাচ্ছি, ঠাকুর এসে আমায় বল্লেন, হ্যাঁরে বাবুরাম, তুই নূতন কাপড পরচিস. আর আমার জামা যে কেটে দিয়েচে! আমায় তুই কি আর ভালবাসিস না? উভয়ে তখন ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি, সত্যই ঠাকুরের জামা (ছবিতে পরানো) ইঁদুরে কাটিয়া দিয়াছে।

একবার সেবকেরা গোপনে দুইটি ফতুয়া তৈরি করাইয়া আল্‌নায় রাখিয়া দিয়াছে। বাবুরাম মহারাজও সেই ফতুয়া গায়ে দিয়াছেন, খেয়াল করেন নাই নূতন কি পুরাতন। ঠাকুর দেখা দিয়া বলিলেন, বাবুরাম, আমার একটা জামা, আর তোর দুটো? তবে কি আমার দিকে তোর মন কমে যাচ্চে? পরদিন তিনি একটি ফতুয়া ফেরত দিলেন, আর ঠাকুরের জন্য দুইটি জামা তৈরি করাইলেন।

বর্ষাকালে মাঠ চোরকাঁটায় ভরিয়া যাইত, আর যেখানে সেখানে গোবর পড়িয়া থাকিত, ইটের টুকরাগুলিও থাকিত। নূতন সাধুদিগকে বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, দেখ্, রাত্রে ঠাকুর বেড়ান এই মাঠে, তাঁর কাপড়ে চোরকাঁটা ধরবে, গোবর লাগবে, খোয়া ইটের চোট লাগবে তাঁর পায়ে। সাধুরা চোরকাঁটা তুলিয়া ও গোবর কুড়াইয়া মাঠ পরিষ্কার করিতেন, দুর্মুস দিয়া খোয়াগুলি মাটিতে বসাইয়া দিয়া মাঠ সমতল করিতেন।

লক্ষ্মণ মহারাজ তখন পূজা করেন, একদিন পূজা করিতে যাইবার সময় বলিলেন, কী পূজা করব, ফলটল কিছুই নাই। বাবুরাম মহারাজ শুনিতে পাইয়া বলিলেন, ফলটল নাই—কী পূজো তবে করিস? যা, তোকে পূজো করতে হবে না, আজ আমিই পূজো করব। মঠবাড়ীর দক্ষিণ দিকের রোয়াকে তাঁহার স্নানের জন্য ব্রহ্মচারী নেপাল দুই বালতি গঙ্গাজল তুলিয়া আনিয়া রাখিতেন। সেদিন তিনি তোলা জলে স্নান করিলেন না, তাড়াতাড়ি গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়াই পূজা করিতে গেলেন। বিকালে ফলমিষ্টি নিয়া এত ভক্ত আসিতে লাগিল যে, তাহাদিগকে প্রসাদ দিতে শালপাতাগুলি নিঃশেষ হইয়া গেল, তবুও প্রসাদ বিতরণ শেষ হয় না। তখন কদমগাছে উঠিয়া কদমপাতা পাড়িতে হইল।

এক ভদ্রলোক কিছু ছানা আনিয়াছেন। ব্রহ্মচারী জ্ঞানকে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ভক্তের জিনিস, রোজ একটু একটু করে ঠাকুরকে দিবি, একদিনে দিস নে—জলে ডুবিয়ে রাখ্।

প্রাচীনদের মুখে শ্রুত একটি ঘটনা :

কলিকাতার এক ধনী ব্রাহ্মণপরিবার হইতে অনেক জিনিস ঠাকুরের ভোগের জন্য আসিত। বাবুরাম মহারাজকে দেখা দিয়া ঠাকুর বলেন, হ্যাঁরে, ওদের জিনিস আমাকে দিস কেন? আমি যে খেতে পারি না! তখন স্বামিজী আছেন মঠে, তাঁহার কাছে গিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, নরেন, আমি কী করি বল দেখি? ওদের বাড়ী থেকে রোজ এক ঝুড়ি ফলমিষ্টি আসে, আজ ঠাকুর বলচেন তিনি খেতে পারেন না। স্বামিজী উত্তর দিলেন, ঝুড়িটা এনে আমার ঘরে রেখে দিয়ো, দুইএকটা যা পারি আমি খাব, নিজের শিষ্যকে তো ফেলতে পারব না। আর ঠাকুর যখন খাবেন না তখন তোমরাও খেয়ো না, ছেলেদেরও দিয়ো না।

খুদুদা (শ্যামানন্দ) কলিকাতার লোক, কলিকাতার ভক্তদিগকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি বলিয়াছেন: থিয়েটারের মাগীরা ঠাকুরের জন্য মিষ্টি আনিত। আমি ঠাকুরকে দিতাম না, প্রসাদঘরে রাখিয়া দিতাম। মাগীরা সেকথা বাবুরাম মহারাজের কানে তুলে। আমাকে বলিলেন,—আমি তো মন্ত্র দিই না, আয় তোকে মন্ত্র শিখিয়ে দি। যখন ঠাকুর শরীরে ছিলেন তখন দেখেছি, কোন জিনিসে হাত দিয়েই ফেলে দিচ্ছেন; আবার কোন জিনিস হাতে করে নিয়ে মুখে দিচ্ছেন। তখন কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন তিনি পটে আছেন, শরীরে নেই—আমরা কী করে জানব কার নেবেন, কার নেবেন না? যে যা আনবে, ঠাকুরের সামনে ধরে দিয়ে বলবি, 'মশায়, অমুক এই জিনিস এনেছে, আপনাকে দিলুম। আপনার ইচ্ছা হয় খান, না হয় না খান।'

কখন কখন ভক্ত-গৃহ হইতে ফিরিবার সময় বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের জন্য কিছু চাহিয়া লইয়া আসিতেন। বলিতেন, শুধু হাতে এলে ঠাকুর কী মনে করবেন?

ভক্তসেবা

'বেলুড়ের বাজারে ভাল শাকসবজী পাওয়া যাচ্চে না। ছুটো টাকা নিয়ে বরাহনগর যা। নারায়ণবাবুকে দিস, ভাল বাজার করে দেবে।' আদিষ্ট ব্যক্তি বরাহনগরে যাইতেই নারায়ণ দত্ত তাহাকে সঙ্গে নিয়া বাজারে গেলেন ও প্রায় চারি টাকা মূল্যের বিবিধ শাকসবজী কিনিয়া, কুটিঘাট পর্যন্ত আসিয়া নৌকায় তুলিয়া দিলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—দেখলি কেমন ভক্ত! কী সুন্দর বাজার করে দিয়েচেন! নে এখন ভাল করে কেটেকুটে রান্না কবে আজ ভাল করে ঠাকুরের সেবা কর্ দিকি। আর ভক্তরা সবও এসেচে। জানিস, ঠাকুর বলতেন, ভাগবত ভক্ত ভগবান—তিন এক। ঠাকুরের একথা কথার কথা নয়—মহাসত্য, বেদবাক্য।[১]

বেলুড় মঠে একদিন সকলে খাইতে বসিয়াছেন। প্রসাদান্ন পরিবেষিত হইভেছে, কিন্তু বাবুরাম মহারাজের জন্য নির্দিষ্ট আসনটি শূন্য পড়িয়া আছে। তিনি কোথায় গিয়াছেন বুঝিতে পারা গেল না। খাওয়া সুরু হইবে এমন সময় তিনি একটি অভুক্ত লোককে সঙ্গে নিয়া আসিলেন, এবং নিজের আসনে বসাইয়া দিয়া সানন্দে 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় মহারাজ, জয় ঠাকুর!' বলিয়া নৃত্যের ভঙ্গী সহকারে তিনবার হাততালি দিয়া সরিয়া পড়িলেন![২]

দ্বিপ্রহরের আহার শেষ হইয়াছে, সকলে বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন এমন সময় শিশুসন্তানাদি সহ এক বৃদ্ধ নৌকা হইতে মঠের ঘাটে অবতরণ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আর তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য আবার রান্না চড়াইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। একটি শিশুর দুধ খাওয়ার সময় হইয়াছে, কিন্তু দুধ কোথায় পাওয়া যাইবে? ঠাকুরের দুধ হইতে খানিকটা আলাদা করিয়া রাখিয়া বাকিটা দেওয়া হইল,

---

১। রামেশ্বরানন্দ-কথিত। ২। গোকুলদাস দে-কথিত

ঝিনুকের বদলে চায়ের চামচে। ইহাদের কেহই মঠের ভক্ত ছিল না, বাবুরাম মহারাজেব আদরযত্নে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।[১]

দক্ষিণেশ্বরে দর্শনাদি করিয়া পূর্ববঙ্গের একনৌকা লোক, স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া দশ বারো জন, মঠে আসিয়াছে। গঙ্গায় জোয়ার থাকায় তাহাদের আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। বেলা তখন প্রায় তিনটা। তাহাদের খাওয়া হয় নাই, মঠে দর্শনাদি করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া খাইবে। বাবুরাম মহারাজ তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা করাইলেন, তাহাদেব আপত্তি সত্ত্বেও। ভাঁড়ারে নারিকেল ছিল, কয়েকটি নারিকেল কুরাইয়া নিলেন। খাবার জায়গায় আসন পাতিয়া শালপাতায় চিড়া, নারিকেল-কোরা, গুড ও ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল যাহা ছিল তাহাদিগকে খাইতে দিলেন। তাহারা কত যে খুশী হইল বলিবার নয়। কয়েকদিন পরে তাহারা বিবিধ সামগ্রী—ফলমূল, দই-মিষ্টি, চাল-ডাল, নুন-তেল, মশলা ইত্যাদি—সঙ্গে নিয়া মঠে আসিল ও দুপুরে প্রসাদ পাইল। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, দেখলি, সেদিন তোরা দুটো চিড়ে ভিজিয়ে নারকেলকোবা আর গুড দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলি, আজ ওরা কত টাকাব ভোগের জিনিস নিয়ে এসেচে! উহাদের অনেকেই পরে মঠে আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করে। কেহ কেহ দীক্ষা নিয়াছিল মহারাজের কাছে। 'বাবুরামদা, তুমি এসব অখদ্দেরকে কোথা থেকে জুটাও বল দেখি?' মহারাজ প্রশ্ন করিলেন। 'তুমি এসব বিষ হজম করতে পার বলেই তোমার কাছে পাঠাই।' বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন।[২]

কলিকাতার এক সমৃদ্ধ পরিবার মোটর গাড়ীতে করিয়া মঠে আসিয়াছে। তাহারা ঠাকুরদর্শন করিয়াই ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, যা যা, শীগ্‌গির ওদের প্রসাদ দিয়ে আয়, প্রসাদ না খেয়ে যেন না যায়। আদিষ্ট ব্যক্তি দৌড়াইয়া গিয়া গাড়ীতে এক বৃদ্ধার হাতে প্রসাদ দিয়া আসিল। পরদিন উহারা নিজেদের ঘরে তৈরি প্রচুর সিঙ্গাড়া-কচুরী-সন্দেশ নিয়া মঠে আসে। মৃদু হাসিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,

১। বিশ্বনাথানন্দ-কথিত। ২। প্রণবানন্দ-কথিত।

দেখ্, ভক্তসেবা করলে ঠাকুর তাদের কেমন সেবা নেন, আবার সাধুদেরও সেবা করিয়ে নেন! তোরা কিন্তু নিষ্কামভাবে প্রসাদ দিবি।

একদিন বাবুবাম মহারাজ যখন কলিকাতায়, সাধুদেরও খাওয়া হইয়া গিয়াছে, এমন সময় নাগ মহাশয়ের স্ত্রী মঠে আসিলেন নৌকায় করিয়া, কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়া। তাঁহাদিগকে খাইতে বলা হইলে নাগ মহাশয়ের স্ত্রী জানাইলেন, ঠাকুরের প্রসাদ না হইলে তিনি খাইতে পারিবেন না। সাধুবা ভিতবে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার খাওয়ার মত অন্নপ্রসাদ আছে, অপর কয়েকজনের জন্য কিছু ভাজা ও খিচুড়ি করিয়া নিলেই হইবে। জ্ঞান মহারাজকে সেকথা বলা হইল, কিন্তু তিনি বাগান্বিতভাবে কহিলেন, ওদের জন্যে কিছু করতে হবে না, যাক্ না চলে। অসময়ে এসে হাজির হবে, আর খাওয়াতে হবে! সাধুবা তাঁহার কথা অমান্য কবিয়াই খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, খাওয়া দাওয়া করিয়া অতিথিবাও চলিয়া গেলেন। বিকালে বাবুরাম মহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিতেই ব্যবস্থাপকরা সকল কথা তাঁহাকে জানাইলেন এবং এই কাজে নিজেদের কিছু অন্যায় হইয়া থাকিলে ক্ষমা করিতেও বলিলেন। প্রসন্ন হইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ক্ষমা কী রে, তোরা ঠিক কাজ করেচিস, আমি থাকিলেও ঐ করতুম।[১]

এক ডেপুটী সস্ত্রীক গঙ্গাস্নান করিতে আসেন বেলুড় মঠে। স্নানের পব তিনি খবর নিতেছিলেন কাছেই কোন হোটেল আছে কিনা। মঠের খাওয়া দাওয়া তখন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী নেপালেব মুখে তাঁহাদেব কথা শুনিয়া বাবুরাম মহাবাজ তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন, এবং ঠাকুরের প্রসাদ যাহা অবশিষ্ট ছিল—ভাত, ডাল, ডেঙ্গো ডাঁটার চচ্চড়ি—তাহাই খাইতে দিয়া করজোড়ে কহিলেন,—আমরা নিজেরা নিজেদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা করি না, যা জোটে ঠাকুবকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাই। আজ শুধু এই ডাল আর ডেঙ্গো ডাঁটা আছে। তাই বলে কম খাবেন না যেন, পেট ভরে খাবেন। তাঁহারা মুগ্ধ আপ্যায়িত হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরে যখন

১। গৌরীশানন্দ-কথিত।

তাঁহারা আবার মঠে আসিলেন তখন বাবুরাম মহারাজ শরীরে নাই। তাঁহার খোঁজ নিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন: জীবনে আমরা এমন খাবার, এত স্নেহপ্রীতিমাখা, খাই নি। আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে কত ভাল ভাল জিনিস খেয়েচি, কিন্তু সে সব এর কাছে কিছুই নয়। ডেঙ্গো ডাঁটার মধ্যে যে এত মিষ্টত্ব, এর আগে জানতে পারি নি। এত অমায়িক ব্যবহার, এমন মাধুর্যময় পুরুষ!

বাবুরাম মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন তখন নিত্যই সেখানে বহু ভক্তের সমাগম হইত। কিন্তু কেহই প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত না হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিত না। দিনে দিনে ভক্ত-সংখ্যা বাড়িতে থাকায় আহারাদি শেষ হইতে দেড়টা দুইটা বাজিয়া যাইত।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর পনর কুড়ি মিনিট মাত্র বিশ্রাম করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িতেন; কে কোথায় ভক্ত আসিয়াছে খবর নিতেন, তাহাদিগকে ঠাকুরের কথা শুনাইতেন। তাঁহার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া ভক্তেরা ঘন ঘন মঠে আসিত।

ঘরে ফিরিবার সময় ভক্তেরা খালি হাতে চলিয়া যায় ইহা তিনি যেন চাহিতেন না। সম্ভবস্থলে মঠের কোন-না-কোন জিনিস সঙ্গে লইয়া যাইতে তাঁহাদিগকে বলিতেন। মঠের জমিতে উৎপন্ন ডেঙ্গো ডাঁটার ঝাড় শিকড়-মাটিসুদ্ধ লইয়া ভক্তেরা আনন্দে বাড়ী চলিয়াছে এমন দৃশ্যও বহুবার দেখা গিয়াছে।[১]

১। মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) আছেন মিহিজামে। জনকয়েক ভক্ত সেখান হইতে মঠে আসিয়াছেন, দর্শনাদি করিয়া সেই দিনই ফিরিবেন। বাবুরাম মহারাজের আদেশে নেপাল একটি কাটোয়ার ডেঙ্গো ডাঁটা তুলিয়া আনিয়া, ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া, তাঁহাদের হাতে দিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের জন্য। কিছুদিন পরে তাঁহারা আবার মঠে আসিয়া কহিলেন: ডাঁটা শুকাইয়া যাইবে মনে করিয়া একদিনেই খরচ করিতে চাহিলে মাষ্টার মহাশয় বলেন, —একদিনে সবটা খরচ কোরো না, একটি করে ডাল রোজ নেবে, বাকিটা ভিজে নেকড়ায় জড়িয়ে রাখবে। খাবার সময় ভাববে—এই ডাঁটা এসেচে স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ

উমেশ সেন লিখিয়াছেন :

বাবুরাম মহারাজ সমাগত ব্যক্তিদের কাহার কী অভাব, কাহার কী কষ্ট, তাহা যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেন, আর দূর করিতেও সচেষ্ট হইতেন। আমার শরীর খারাপ দেখিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। যাহারা নৌকায় যাইবে তাহাদের জন্য চলতি নৌকা হয়তো নিজেই ডাকিয়া দিতেন।

একদিন আমাদিগকে বলিলেন, যা বাগানে পেয়ারাগাছে উঠে খুব করে পেয়ারা খেগে। আর পেড়ে নিয়ে আসবি কোঁচড়ে করে, কলকাতায় ফিরবার সময় নিয়ে যাবি। তরুণ যুবক আমরা তখন, তাঁহার আদেশের পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করিলাম।

প্রসাদ খাইতে বসিয়াও তিনি সকলের সুখসুবিধাব প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। কাহার বসিবার অসুবিধা হইল, ভাত, ডাল, জল, নুন—কাহার কী চাই, সন্ধান নিতেন। নিজে সামান্যই আহার করিতেন। নিজের পাত লইতে প্রসাদান্ন তুলিয়া, বিশেষতঃ উত্তম সামগ্রী কিছু থাকিলে ডাকিয়া ডাকিযা ভক্তদিগকে বিলাইতেন, কখনও বা নিজে উঠিয়া গিয়া কোন কোন ভক্তেব পাতে দিয়া আসিতেন। একদিন কচু-ভাতে খাইয়া এমন গলা ধবিল যে, কেহই সবটা খাইতে পাবিল না। 'তাই নাকি, গলা ধরেচে নাকি ?'—বলিতে বলিতে তিনি সমস্তটুকুই গলাধঃকরণ করিলেন।

প্রেমানন্দেব প্রেমের যাদুস্পর্শে নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, ক্রূব হিংসা ভুলিয়াছে, বিশ্বনিন্দুকও বলিয়াছে, এমন ভালবাসা দেখি নাই। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলিয়াছিলেন : সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরলুম, এমন জায়গা আর চোখে পড়ল না যেখানে কেবল—এস, বস, খাও !

বাবুরাম মহারাজের ভক্ত-আপ্যায়ন উল্টা বুঝিয়া স্বার্থান্ধ লোকেরা নানা কথা কহিত। কিন্তু তিনি বলিতেন: লোকে বাগানবাড়ী বেড়াতে যায়, রং

থেকে, যেখান থেকে ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারিত হচ্চে ; দিয়েচেন বাবুরাম মহারাজ, ঠাকুরের নিত্য পার্ষদ ; চাষ করেচেন মঠেরই সাধুব্রহ্মচারীরা। তখন দেখবে এই ডেঙ্গো ডাঁটা শুধু ডাঁটাই নয়, বহুগুণসম্পন্ন।

তামাসা দেখতে যায়, কিন্তু তা না করে যখন এখানে এসেচে তখন বুঝতে হবে, তার ভিতরে কিছু আছে। না থাকলে এখানে আসবে কেন ? খাওয়া দাওয়ার সুবিধা বলিয়া অনেক রাস্তার লোক আসিয়া পড়ে, এই বলিয়া কেহ আপত্তি করিলে বলিতেন ঃ তা হোক, আমার বিশ্বাস, ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করলে কল্যাণ হবেই—বিশ্বাসভক্তি নিয়ে আসুক বা নাই আসুক, জান্তে অজান্তে ভ্রান্তে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করলে তাদের কল্যাণ হবে। অসময়ে আসাতে সকলের অসুবিধা ও কষ্ট হয় বলিয়া আপত্তি করিলে বলিতেন ঃ আহা ! গৃহীদের কত কাজ, তারা কি সবদিন সময় মত আসতে পারে ?

একবার একটি লোক যদৃচ্ছাক্রমে মঠের প্রাঙ্গণে আসিয়া অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ গেটের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এত শীঘ্র লোকটিকে ফিরিতে দেখিয়া ভাবিলেন, হয়তো সে প্রসাদ না নিয়াই চলিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসিত হইয়া ঠাকুরঘরের ভাঁড়ারী রাসবিহারী (অরূপানন্দ) কহিলেন, সে একটু দাঁড়ালও না, তাকে কী করে প্রসাদ দিই ? বাবুরাম মহারাজ বলিলেন,—তবু ডেকে এনে দিতে হয়, যখন মঠের ভিতর এসে পড়েচে। সংসারে থাকলে না নিজে খেতে পেতিস, না বাছাদের মুখে দুটো দিতে পারতিস। এখানে ঠাকুরের কৃপায় এত আসচে, হাতে ধরে তুলে দিতে পারবি নি ?

যদুনাথ মজুমদার লিখিছেন ঃ

এক বন্ধুর সহিত মঠে বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিতে যাই। মঠে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল ও বলিলেন, তোমাদের ছাতা নেই ? এক একখানা ছাতা রেখো।

মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়াছি, দক্ষিণেশ্বর যাইব। তিনি তখন উপরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমি সাহস করিয়া উপরে গেলাম এবং শায়িত অবস্থায় প্রণাম করা অবৈধ জানিয়াও তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিলাম, আশীর্বাদ করুণ ঠাকুর যেন কৃপা করেন। তিনি উত্তর দিলেন, আশীর্বাদ

করেচি, এখনো করচি, আরও করব ; মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসো। কথাগুলি স্নেহমাখা।

মঠে কখনও রাত্রিবাস করি নাই, আরাত্রিক গানও শুনি নাই। এই দুই সাধ মিটাইবার জন্য মঠে যাই, কিন্তু নৌকার অসুবিধায় পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইয়া পড়ে। মঠের পূর্বদিকের বারান্দায় উঠিতেই এক সাধু আমাকে ভীষণ আক্রমণ করিলেন। আমি মঠে রাত্রিবাস করিতে পাইব না বলিলেন, এবং গোঁয়ার, বাঙ্গাল প্রভৃতি মিষ্ট ভাষণে একঘণ্টারও অধিক-কাল ধরিয়া আপ্যায়িত করিয়া চলিলেন। শীতের রাত্রি গভীর হইতেছে, শ্রীরামপুর যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় বাবুরাম মহারাজ ধ্যান হইতে উঠিয়া নামিয়া আসিলেন এবং একটা আলো আনাইয়া আমার মুখ দেখিয়া কহিলেন, এ যে চেনা মুখ বলে বোধ হচ্চে। তারপরে বাছা, সোনার চাঁদ, ইত্যাদি মিষ্টিকথায় আমার অভিমান যেন বাড়াইয়া দিয়া মাতৃস্নেহে হৃদয়বেদনা মুছিয়া দিলেন। নি— তখন সবে মঠে যোগ দিয়াছেন, তিনি ও আমি একই বিদ্যালয়ে পড়াইতাম জানিয়া কহিলেন, দুজনে বুঝি যোগাযোগ করে এসেচ ? আমরা বলিলাম, না মহারাজ, তেমন কিছু নয়। 'ও আগে এল, তুমি পরে এলে, এ যোগ নয় তো কি বিয়োগ হল ?' এই বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আহারান্তে লেপ-বালিশের বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে শোয়াইয়া তবে তিনি উপরে গেলেন। পরদিন আমি কাশী যাত্রা করিব শুনিয়া কহিলেন, তুমি কাশীতে গিয়ে মহাপুরুষকে বোলো, হয় তিনি এখানে আসুন, না হয় আমায় টেনে কাশী নিয়ে যান—পুরানো মানুষ না হলে ভাল লাগে না।

একবার একটি মাদ্রাজী ভক্ত মঠের দোতলার বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়ে। অধিক রাত্রে বাবুরাম মহারাজ উপরে যাইয়া দেখিলেন তাহার মশারি নাই। তখনই একটি মশারি লইয়া গিয়া ও তাহার উপরে খাটাইয়া দিয়া মশা তাড়াইবার জন্য যেই ধীরে ধীরে হাওয়া করিতেছেন অমনি তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই প্রেমদৃশ্যে সে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল ।

বাহির হইতে কোনও লোক ঘর্মাক্ত কলেবরে মঠে আসিলে বাবুরাম মহারাজ নিজে পাখা নিয়া তাহাকে বাতাস করিতেন। বৃদ্ধ ভক্তেরা পরিশ্রান্ত হইয়া মঠে আসিলে অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারীদের দ্বারা তাঁহাদের পরিচর্যা করাইতেন।

একদিন মঠে অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে, হঠাৎ একখানা কালো মেঘের আবির্ভাব। বর্ষণ আরম্ভ হইবামাত্র এক ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি তাঁহাদের জুতাগুলি মঠবাড়ীর পশ্চিমদিকের বারান্দায় তুলিয়া রাখিতে গেলেন। তাঁহাকে পায়ে করিয়া জুতা তুলিতে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, ভক্তের জুতা মাথায় করে তুলবি।

কমলেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন ঃ

যেসকল ভক্ত মঠে রাত্রিযাপন করিতেন তাঁহাদেব জন্য বাবুরাম মহারাজ বিশেষ দুগ্ধাদির ব্যবস্থা করিতেন। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য বিশেষ শয্যা'দির ব্যবস্থা করিতেন, যেগুলি হয়তো সাধুদের সকলে অনুমোদন করিতেন না। এইগুলি তাঁহার খেয়ালপ্রসূত মনে করিয়া আমরা অনেক সময় তাঁহার সহিত অশিষ্ট ব্যবহারের পরিচয়ও দিয়াছি।...ভক্তসমাগমে তিনি উৎফুল্ল হইতেন, যেদিন ভক্তেরা মঠে কম আসিত বা আসিত না সেদিন যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কখন কখন দেখা গিয়াছে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া তারস্বরে বলিতেন—ভকত আযাও, ভকত আযাও!...স্বল্প পরেই হয়তো একনৌকা লোক মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।...দ্বিপ্রহরে একনৌকা অপরিচিত ভদ্রলোক মঠে আসিয়াছেন। তিনি নিজে পাকশালায় যাইয়া কোন রকমে নির্বাণোন্মুখ চুল্লীতে ইন্ধন দিয়া খিচুড়ি করিতে গেলেন। ভাণ্ডারী গোপাল মহারাজ আসিলেন ও রান্নার ব্যবস্থা হইল। প্রায় তিনটার সময় ভক্তেরা প্রসাদ খাইলেন, ততক্ষণ তিনি তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের কথা আলাপ করিতে লাগিলেন।...তিনি বলিতেন ঃ ওগো, কী দেখি জান—সব প্রভুর জন্যে এখানে আসে। এখানে এই মঠে আসা বড় ভাগ্যের কথা। তিনি টানলে তবে আসতে পারে, নতুবা কার সাধ্য।

বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন, তিনি ভক্তদের বাহ্যিক দুর্বলতাদি মোটেই লক্ষ্য করিতেন না, তাহাদের অন্তরের ভক্তিটুকুই শুধু তাঁহার চোখে পড়িত, আর উহাই তাঁহাকে ভক্তসেবার জন্য আকুল করিয়া তুলিত।

জ্ঞান মহারাজের কথা ঃ

আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে একদিন একজন মঠে আসিতেছিলেন। গানটার প্রথমাংশ হইল, 'সেথায় আছেন জননী দিবসরজনী পথপানে চেয়ে কেবল।' ঐ ব্যক্তি খানিক অগ্রসর হইয়া দেখেন, মঠের ফটকের কাছে বাবুরাম মহারাজ পথপানে চাহিয়া একাকী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন!

এমন কতদিন হইয়াছে, বাবুরাম মহারাজ পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখিতেছেন। ভক্তের আসিতেছে, কি জানি যদি দেরী হইয়া গেলে প্রসাদ না পায়।

কখন কখন বলিতেন, যখন দেখি অনেক জিনিসপত্তর আসচে তখনই বুঝতে পারি ঠাকুর এর পেছনে লোক পাঠাচ্চেন।

একব্যক্তি স্নানের পর মঠবাড়ীর পশ্চিমদিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। উত্তরদিকের ঘরে কয়েকজন ব্রহ্মচারী মুড়ি খাইতেছিল, ভদ্রলোক সেইদিকে তাকাইয়া আছেন। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই বেটারা, নিজেরা খাচ্চিস, এঁকে দিয়েচিস? একজন তাড়াতাড়ি মুড়ি দিতে গেলে বলিলেন, তুই খেতে এয়েচিস, তুই খা, আমি দিচ্চি।

মহাপূজায় একদিন প্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে একজনকে বলিলেন, মা খালি খাওয়াতে ভালবাসেন, নয়?

আর একদিন একজনকে ডাব দিতে বলিলে সেই ভদ্রলোক কহিলেন, আমাকে কেন? আপনি খান। 'তুমি খাও, তা হলেই আমার খাওয়া হবে।' বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন।

একদিন বলিয়াছিলেন ঃ সুমুখে যে সময় আসচে, যারা ঠাকুরকে ধরে থাকবে, যারা ভগবানকে ধরে থাকবে, তারাই রক্ষা পাবে। বাকি সব নাশ

হয়ে যাবে। ঠাকুর যে কুটির উপর থেকে ডেকেছিলেন—'ওরে ভক্তেরা, কে কোথায় আছিস আয়'—সে কেবল আমাদের কয়েকজনকে নয়, তোমাদেরও। আরও অনেককে ডেকেছিলেন। এখনও সব আসে নি—ঠাকুরের অনেক ভক্ত রয়েচে, এখনও সব আসে নি।

একজন মঠে আসিয়া বলিলেন,—উদ্বোধনে গেছিলাম, গণেন মহারাজ বল্লেন, ভক্তসেবার জন্য আপনার ও আর আর সাধুদের অতিরিক্ত খাটুনি হয়। বাগতভাবে দুই বুড়ো আঙ্গুল দেখাইয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—গণেন কী বুঝে? এখান থেকে একটু প্রসাদ পেয়ে যায়, তাই না লোকের একটু ভক্তি হয়, আর ওর বইগুলো বিক্রি হয়ে যায়?[1]

কিন্তু তাঁহার ভক্তসেবা অর্থকরী ছিল না। ৺কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমের মোহন্ত চন্দ্র মহারাজকে তিনি বলিয়াছিলেন: দেখ চন্দুরে, সাধুর থলে দুমুখো হবে। তুমি বেটা, যে দেবে থোবে তাকে যত্ন করবে, আর যে দেবে না তাকে দেখবে না, তা হবে না। এই কথার মধ্যেই তাঁহার ভক্তসেবার আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই আদর্শ রক্ষার খাতিরে এই প্রেমসর্বস্ব সন্ন্যাসীকে সময়ে সময়ে ভিক্ষায় বাহির হইতেও হইয়াছে।

বেলুড মঠের অছিদের সভা বসিয়াছে, মহারাজ সভাপতি। আয়-ব্যয়ের হিসাব পড়া হইলে দেখা গেল, ভক্তসেবায় চারিশত টাকা ধার হইয়াছে। সুধীর মহারাজ (শুদ্ধানন্দ) প্রশ্ন করিলেন, এই টাকাটা কোথা থেকে আসবে? মহারাজ বলিলেন, বাবুরামদা, সুধীর বলচে এই টাকাটার কী হবে? বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন, মহারাজ, এই টাকা ভক্তসেবায় আমিই খরচ করেচি, আমিই ভিক্ষে করে এনে দেব।[2]

বেলুড় মঠে তখন নিয়ম হইয়াছে, যদি কেহ প্রসাদ পাইতে চায় তাহাকে বেলা দশটার মধ্যে আসিয়া জানাইতে হইবে। শ্রীরামপুর হইতে একটি ছেলে

১। বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত-কথিত।

২। প্রণবানন্দ-কথিত।

বাবুরাম মহারাজের কাছে আসিত, সেদিন তাহার আসিতে একটু বিলম্ব হয়। বাবুরাম মহারাজ তখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তাঁহার কথায় সে যখন খাবার জায়গায় গিয়া বসিল, 'এ কি হোটেল পেয়েচ ?' বলিয়া জনৈক সাধু তাহাকে পাত হইতে উঠাইয়া দিলেন। সে চোখের জল ফেলিয়া ও বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে দেখা না করিয়াই চলিয়া গেল। যখন সেকথা তিনি শুনিতে পাইলেন কাহাকেও অনুযোগ করিলেন না, তাঁহার দুই চোখ দিয়া ধারা বহিতে লাগিল ![১]

১। সত্যানন্দ-কথিত।

ভক্তদের প্রতি বাৎসল্য

বরাহনগরের নারায়ণ দত্তের কথা আগেই বলা হইয়াছে। বেলুড় মঠে যখনই জিনিসপত্রের অভাব হইত, বাবুরাম মহারাজ ওপারে নারায়ণবাবুর বাড়ীতে কোন ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া দিতেন, নারায়ণবাবু সঙ্গে সঙ্গে জিনিসগুলি কিনিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া পাঠাইতেন। ভুবন-ভূষণ-নারায়ণ তিন বন্ধুতে মিলিয়া লোহার কারবার করিতেন। নীলামের ডাকে জাহাজ-বোঝাই মাল ধরা ছিল তাঁহাদের তখনকার কাজ। তাহাতে ঝুঁকি অনেক—হয় প্রচুর লাভ, নয়তো ভরাডুবি। একবার নিজেদের বুদ্ধিতে থৈ না পাইয়া তাঁহারা তিনজনেই মঠে আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, আমরা তো কিনারা পাচ্চি না মহারাজ, এ জাহাজটা ধরব না ছাড়ব, আপনি আমাদের হয়ে ঠাকুরকে একটু জানান, কী করব বলে দিন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি কী জানি ওসব? তাঁহারা পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আপনাকে বলতেই হবে, আপনার কথা বেদবাক্য বলে মানি। তিনি স্থির হইয়া চক্ষু বুজিলেন, মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, দুই হাত উত্তোলিত ও আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, 'ধরগে যা—ধরগে যা—ধরগে যা।' সেই জাহাজ ধরিয়া তাঁহাদের অসম্ভব লাভ হইয়াছিল।[১]

শালিখার পঞ্চানন ঘোষ পুরাতন ভক্ত। একদিন তিনি মঠে আসিয়া প্রণাম করিতেই বাবুরাম মহারাজ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। 'কী আর বলব মহারাজ, সেদিন মেয়েটার বিয়ে দিলুম, জামায়ের এমন অসুখ যে, ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েচে।' বলিয়াই পঞ্চাননবাবু চোখ মুছিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ গম্ভীর হইয়া গেলেন ও খানিক পরে কহিলেন, আপনি কাল সকালে আসবেন, কিছু ভয় নেই। 'কী হবে মহারাজ?' অসহায়ের মত পঞ্চাননবাবু

১। নির্লেপানন্দ-কথিত।

প্রশ্ন করিলেন। 'আপনি আসবেন কাল সকালে।' বাবুরাম মহারাজ আবার কহিলেন।

পরদিন সকালে তিনি বলিলেন, আজ ঠাকুরের পূজা আমিই করব। পূজা হইয়া গেলে ছোট একটি তামার ঘটীতে ঠাকুরের স্নানজল লইয়া বাবুরাম মহারাজ নীচে নামিয়া আসিলেন ও পঞ্চাননবাবুকে কহিলেন, চলুন, আপনার জামাইকে দেখতে যাব। নগ্নপদে নগ্নগাত্রে বাবুরাম মহারাজ চলিয়াছেন—কাঁধে উত্তরীয়, হাতে ঠাকুরের স্নানজল। খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া বরাহনগরে আসিলেন ও পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন। রোগীর ঘরে আসিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। তারপরে অচৈতন্য রোগীর মুখে স্নানজল দিয়া এবং তাহার মাথায় ও গায়ে স্নানজল বুলাইয়া চলিয়া আসিলেন। ইহার পর হইতেই রোগীর অবস্থা ফিরিল, ক্রমশঃ সে সুস্থ হইয়া উঠিল। পূর্বে ঠাকুরের এক ভক্তের—পোষ্ট মাষ্টার বা ষ্টেশন মাষ্টার—একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন বাবুরাম মহারাজকে, রাখাল কিংবা তুমি যদি ঠাকুরের পূজা করে স্নানজল দিয়ে আসতে, তা হলে কখনই ছেলেটা মরত না।[১]

যোগেশ ঘোষ বলেন ঃ

মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও অন্যান্য অনেকে যখন ঢাকায় আসিলেন (১৯১৬), আমি তখন চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছি। স্বামিজীর ভ্রাতা মহিমবাবু সেই সময়ে নীরদ মজুমদারের বাড়ীতে ছিলেন, তাহার মার কথায় আমাকে দেখিতে আসেন। আমার অবস্থা দেখিয়া—বাঁ পা অচল, ছয় ইঞ্চি খাটো হইয়া গিয়াছে, সর্বদা অসহনীয় যন্ত্রণা—মোহিনীবাবুর বাড়ীতে যাইয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন। মধ্যাহ্নে আহারের পরেই পায়ে চটি ও হাতে ছাতা নিয়া বাবুরাম মহারাজ যখন রাস্তায় বাহির হইতেছেন, বীরেন বসু দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাচ্ছেন মহারাজ? উত্তর দিলেন, যোগেশ ছোকরাকে দেখতে যাব। 'তা হলে আমিও আসি' বলিয়া বীরেন

১। প্রণবানন্দ-কথিত।

গাড়ী করিল। আরও কয়েকজন আসিলেন তিনচারিখানা গাড়ী করিয়া। বীরেন আশুবাড়ী আসিয়া আমাকে বলিল, যোগেশবাবু, আপনি অস্থির হবেন না, বাবুরাম মহারাজ আপনাকে দেখতে আসচেন। ঘরের মধ্যে ক্যান্‌ভাসের একখানা ডেক্ চেয়ার ছিল, তাহার উপর সিল্কের এক চাদর বিছাইয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম। বসিয়াই বলিলেন, তুই কি মরবি বলে ভয় পাচ্চিস ? আর বলিয়াই গান ধরিলেন ঃ

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী ॥

তিনি সম্পূর্ণ গানটি গাহিয়া চলিয়াছেন, এই ফাঁকে আমি চুপি চুপি কলমার ভূপতিবাবুকে বলিলাম, আপনি মহারাজকে বলুন আমাকে আশীর্বাদ করতে —হয় আমি মরি, আর না হয় সেরে উঠি—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। ভূপতিবাবু একথা নিবেদন করিতেই তিনি নিজের পা হইতে জুতা খুলিয়া রাখিয়া আমাকে ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড় করাইলেন—ছবিখানি কুলুঙ্গীর মধ্যে ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখা ছিল—এবং তাঁহার দুই হাত, এক হাতের উপরে অন্য, আমার মাথায় রাখিয়া, কয়েক মিনিট স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপরে হাত সরাইয়া নিয়া বলিলেন, তুই খুব হাস্, তুই খুব দৌড়া। সেইদিন হইতে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হইতে লাগিল। এক মাসের মধ্যেই আমি দৌড়াইতেও সক্ষম হইলাম।

গৌরীশানন্দ বলেন ঃ

যেবার বাবুরাম মহারাজ প্রথম ঢাকায় আসেন (১৯১৪), এখানে পুরাতন ভক্ত কে কে আছে জানিতে চাহিলেন। আমি নিত্যগোপাল গোস্বামী ও হরপ্রসন্ন মজুমদারের নাম করিতেই কহিলেন, কাল খুব ভোরে উঠে আমার কাছে আসবি। ভোরে তিনিই আগে উঠিয়া আমাকে তুলিয়া নিলেন ও বলিলেন, চল হরপ্রসন্নবাবুর বাড়ী যাব। বাড়ীর দূরত্ব, সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়া গেলে, আধ মাইলের মত হইবে। তিনি, কৃষ্ণলাল মহারাজ ও আমি তিনজন সেই রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছি। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া আমি আগে

যাইবার চেষ্টা করিলে কহিলেন, না, আমিই আগে থাকব। তিনি জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। তখনও সকলে শয্যা ত্যাগ করে নাই, ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, কে, কে? মুখে তর্জনী ঠেকাইয়া আমাদিগকে তিনি উত্তর দিতে মানা করিলেন এবং আরও জোরে দরজায় ঘা দিতে লাগিলেন। হরপ্রসন্নবাবু দরজা খুলিয়া দেখিয়াই যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। 'এ কী, আপনি এসেচেন। আমি গরীব বলে প্রবঞ্চনা করে এলেন!' বলিয়াই তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন। নীরদের মা ছুটিয়া আসিলেন ও বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়াই দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, বাবা, বাবা, গরীব মেয়েকে এমনি করে ছলনা করতে হয়? তাঁহার দুই চোখে তখন ধারা বহিতেছিল। তারপরে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই দণ্ডবৎ পতিত হইয়া বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। সে কী দৃশ্য! 'শীঘ্রি খেতে দাও, আমার বড় খিদে পেয়েচে!' বলিয়া বাবুরাম মহারাজ নিজেই কিছু খাইতে চাহিলেন। ঘরে নারিকেলের চিঁড়া ও জিরা ছিল, সেই চিঁড়া-জিরা ও একটু মিছরি তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। 'জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর, আমার এ বাড়ী আজ কাশী হয়ে গেল!' বলিয়া হরপ্রসন্নবাবু দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

দীনদুঃখীর ও পশুপক্ষীর উপর দরদ

বাবুরাম মহারাজ গরীবের মা-বাপ ছিলেন। তাঁহার একটি তুলোভরা জামা ছিল, শীতের সকালে গায়ে দিতেন। খুদুদা জামাটি রোদে দিয়াছিলেন, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। 'কী খুঁজচিস?' বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। 'আপনার নীলরঙের জামাটা।' খুদু কহিলেন। 'সে আমি গগনকে দিয়ে দিয়েচি, শীতে বড় কষ্ট পায়।' 'আপনি কী গায়ে দেবেন মশায়?' 'আমি সাধু মানুষ, আমার আবার শীত গরম কী রে?'

'জয়-মা-কালী' মঠের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, অতি দরিদ্র। 'জয় মা কালী' বলিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিত। বাবুরাম মহারাজ তাহাকে বাগানের তরি-তরকারি ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন। মঠেব আশেপাশে ঘরে ঘরে যাইয়া তিনি লোকের অভাব অভিযোগ শুনিতেন, আর যাহারা প্রকৃতই অভাবগ্রস্ত তাহাদিগকে মঠ হইতে চাল তরকারি ইত্যাদি লইয়া যাইতে বলিতেন। সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীরা অবাক্ হইয়া যাইতেন তাঁহার অসম্ভব অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া। তিনি বলিতেন, ভদ্রলোকেরা কি তাদের অভাব অভিযোগ জানতে দেয় রে? এঁরা তো আবার ভদ্রমহিলা!

মঠে দুর্গোৎসব। কয়েকটি জেলেকে অন্ন পরিবেষণ করিতে যাইয়া এক যুবক নাকাল হইতেছে। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—তুমি কি আর কখনো পরিবেষণ কর নাই? আমাদের পেটের ওজনে কি এদের পেটের ওজন করা চলে? এদের পেটে যে দিনরাত আগুন জ্বলচে! যাও, একএক বালতি এদের একএক জনের পাতে ঢেলে দাও—ঠাকুরের প্রসাদ পেট ভরে খেয়ে নিক।—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

দুর্গোৎসবের পরে এক মণ উত্তম সন্দেশ কোন ধনী ব্যক্তি পাঠাইয়াছেন। মঠের পরিচারক ও মঠে সমাগত গরীব লোকদিগকে দেখাইয়া এক ব্রহ্মচারীকে বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, এদের বেশী করে সন্দেশ দিগে যা। আদিষ্ট ব্যক্তি একএক জনকে প্রায় এক পোয়া করিয়া সন্দেশ দিয়াছেন দেখিয়া

তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, নিজে উঠিয়া গিয়া স্বহস্তে একএক জনকে প্রায় একসের করিয়া সন্দেশ পরিবেষণ করিলেন।

বেলুড় মঠে নিধিয়া নামে এক উড়িয়া চাকর ছিল, সে গরুবাছুরের তত্ত্বাবধান করিত। একদিন দোহাইবার পর নিধিয়া প্রায় দুই সের দুধ চুরি করে ও সেই পরিমাণ জল দুধে মিশায়। উমানন্দ ইহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে জুতাপেটা করেন, আর আহারের পর বাবুরাম মহারাজকে ঘটনাটি বলিয়া নিধিয়াকে সেইদিনই বিদায় করিয়া দিতে বলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—শুনলুম তুই ওকে জুতো দিয়ে মেরেচিস, তাতে শাস্তি হয় নি? ও এত দিন মঠে আছে, এখন তাড়িয়ে দিলে ওর বাচ্চা কাচ্চারা যে না খেয়ে মরবে, একথা একবারও ভেবেচিস? মানুষ তো তা হলে তোদের এখানে আর চাকরি করতে আসবে না। নিধিয়াকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। নিধিয়া আসিল ও নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বাবুরাম মহারাজের পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, যা, আর কোন দিন এই কাজ করবি না, আজ ক্ষমা করলুম।[১]

ছুটকো গোপালের বড ভাইকে ও বালীর জনৈক ভদ্রলোক রজনীবাবুকে বাবুরাম মহারাজ মঠে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি যখন অসুস্থ অবস্থায় দেওঘরে চলিয়া আসেন, সেখান হইতে মঠে মহাপুরুষকে এই মর্মে এক পত্র লিখেন: বড়দাকে ও রজনীবাবুকে আমিই মঠে স্থান দিয়াছি। আমি জানিতাম তাহারা সাধুদের সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নয়, তবুও মঠে রাখিয়া শুধরাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিবেন। আমি তাহাদের নানা অত্যাচার সহ্য করিতাম।

উহাদিগকে মঠ হইতে সরাইয়া দেওয়ার কথা আগেও দুইএকবার হইয়াছিল। স্বয়ং মহারাজ উহাদের একজনকে তাড়াইয়া দিতে জেদ করিলে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, আমি আশ্রয় দিয়েচি, আমিই কী করে তাড়াব, তার চেয়ে বরং আমিই এখান থেকে চলে যাই।[২]

১। সত্যানন্দ-কথিত। ২। সত্যানন্দ-কথিত।

দেওঘরে এক নাপিত আসিয়া বলিল তাহার সর্বস্ব চুরি গিয়াছে। বাবুরাম মহারাজ তাহাকে একটি টাকা দিলেন, এবং সেবকের অনুপস্থিতিতে নিজের নূতন গামছাখানাও দিয়া বসিলেন। স্নানের সময় সেবক গামছা খুঁজিয়া পাইতেছে না দেখিয়া কহিলেন, সাধুর গামছার কী দরকার, আমার গামছা না হলেও চলবে।

দেওঘরে থাকিয়া রামবাবু (বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু) বাবুরাম মহারাজ ও তাঁহার সেবকদের তত্ত্বাবধান করিতেন। সকলের সেবার জন্য তিনি কলিকাতা হইতে ফল-মিষ্টির পার্সেল আনাইতেন; ইহাতে প্রতি সপ্তাহে শতাধিক টাকা খরচ পড়িত। একদিন তিনি সেবক সতীশকে পার্সেল খরচের হিসাব শুনাইতে থাকিলে বাবুরাম মহারাজ শুনিতে পান, এবং তাঁহার জন্য এত অধিক টাকা খরচ হইতেছে জানিয়া ফলাদি খাইতে তীব্র অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। রামবাবু তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে থাকেন ও কিসে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন জিজ্ঞাসা করেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, এখানে গরীবদের অবস্থা দেখে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে, একদিন তুমি ওদের ভাল করে দইচিঁড়া খাওয়াও, আর প্রত্যেককে একখানা করে নূতন কাপড় দাও। রামবাবু পঞ্চাশ জন সাঁওতালকে ভরপেট খাওয়াইয়া বস্ত্রদান করিয়াছিলেন।[১]

ঠাকুরের দুই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরাখাল ও শ্রীবাবুরাম ব্রজমণ্ডল হইতে আসিয়াছিলেন। ব্রজে সুরভির সন্তানগণের সমাদর পুরাণপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা উভয়েই গরুর সেবাযত্ন করিতে ভালবাসিতেন।

মহারাজ যখন মঠের গোচারণভূমিতে যাইতেন তাঁহাকে দেখিবামাত্র গরুগুলি তৃণভোজন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কাছে চলিয়া আসিত এবং অর্ধবৃত্তাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া, তাঁহার মুখপদ্মে নয়ন সংস্থাপিত করিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে তাহাদের ব্যবহার ছিল ভিন্ন রকমের। তাঁহাকে দেখিলেই তাহারা ছুটিয়া লাফাইয়া তাঁহার

১। দেওঘরে ঠাকুর মথুরানাথকে দিয়া দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা করাইয়াছিলেন।

গায়ের উপর আসিয়া পড়িত, আর সকলের আগে তাঁহার আদর পাইবার জন্য প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দিত। কেহ তাঁহার হাত, কেহ পা, কেহ বা মুখ চাটিত, নাগরী (পশ্চিমদেশীয়া গাভী) শিঙ দিয়া গুঁতাইতে থাকিত। তিনি সমান আদরে, সকলের গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন।

একদিন মঠের অঙ্গনে সকলে খাইতে বসিয়াছেন, পর্বদিন হইবে। অন্ন পরিবেষিত হইয়াছে, কিন্তু খাওয়া সুরু হয় নাই। হঠাৎ নাগরী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল, অনেকগুলি পাত ছাড়িয়া বাবুরাম মহারাজের পাতের কাছে গিয়া থামিল, এবং সেই পাতের সমুদয় অন্ন নিঃশেষে ভোজন করিয়া সরিয়া পড়িল। অন্য কাহারও পাতের দিকে চাহিয়াও দেখিল না।[১]

গোশালায় গো-সেবা ছিল বাবুরাম মহারাজের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটি। স্বহস্তে তাহাদিকে গাছের পালা ভাঙ্গিয়া খাওয়াইতেন, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তাহাদের গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেন। কোনদিন দুধ বেশী কম হইলে জোড়হাতে বলিতেন, মা, মঠের মান রেখো, ঠাকুরসেবায় ভক্তসেবায় দুধের অভাব যেন না হয়।

চন্দ্রী ও কালিন্দী নামে মঠে দুইটি দেশী গাই ছিল—একটি ধব্‌ধবে সাদা, অপরটি কুচ্‌কুচে কালো। গোলগাল চেয়ারা, ভেলভেটের মত মসৃণ গাত্র ছিল তাহাদের। তাহারা প্রচুর পরিমাণে অতি সুস্বাদু দুধ দিত। একদিন বিকালে (১৯১৪) খাবার হাতে নিয়া বাবুবাম মহারাজ নাম ধরিয়া ধরিয়া গাভীগুলিকে ডাকিতেছিলেন, অন্যান্য গাভীরা, এবং তাহাদের বাচ্চারাও, পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু চন্দ্রী ও কালিন্দী আসিল ধীরে ধীরে। তাহাদের মুখে খাবার তুলিয়া দেওয়া হইলে সেই খাবার তাহারা মুখে করিল, কিন্তু খাইতে পারিল না। গলা তুলিয়া বাবুরাম মহারাজের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দরবিগলিতধারে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ওরে, এদের বোধ হয় কেউ বিষ খাইয়েচে, ঠাকুরের স্নানজল নিয়ে আয়। স্বহস্তে তাহাদিগকে স্নানজল খাওয়াইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে গাই

১। মতিলাল বিশ্বাস-কথিত।

দুইটি শুইয়া পড়িল। তিনি একবার একটির মাথা, আবার অন্যটির মাথা কোলে করিতেছেন, আর নিরুপায়ের মত বলিতেছেন, কী করব মা, কী করব? তাঁহার চক্ষু হইতেও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। গাই দুইটির কাতর চাহনি দেখিয়া মনে হইতেছিল তাহারা বলিতেছে, ওগো আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি, আমাদিগকে বাঁচাও! এক ঘণ্টার মধ্যেই বাবুরাম মহারাজের পায়ে মাথা রাখিয়া ঠাকুরের আরতির পূর্বক্ষণে তাহারা দেহত্যাগ করিল। তখনও তাঁহার চক্ষু হইতে জল ঝরিতেছে। তাঁহার নির্দেশে মৃতদেহ দুইটি পরে যেখানে মায়ের মন্দির হইয়াছে উহার সম্মুখভাগে ঢালু জায়গায় মৃৎসমাহিত করা হইল। কিছুদিন ধরিয়া রাত্রে পাহারার ব্যবস্থাও হইয়াছিল, মুচিরা না নিয়া যাইতে পারে।[১]

মঠের দক্ষিণ দিকের গেটের বাহিরে দুইতিনটি মুসলমানপাড়ার কুকুর পড়িয়া থাকিত। বড়দা গোয়ালপুকুরে ও পদ্মপুকুরে একবেলা করিয়া ভাত মাছগুলিকে দিতেন, পাখীদের জন্য পোস্তার উপরে ধান ছড়াইয়া রাখিতেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, এই কুকুরগুলোকেও দুটি দুটি খেতে দিয়ো। সাধুদের পাত কুড়াইয়া যথেষ্ট ভাত পাওয়া যাইত, একটা পাতায় করিয়া বড়দা কুকুরগুলিকে দিয়া আসিতেন। ঝগড়াঝাঁটি না করিয়া সেই ভাত তাহারা নিঃশেষে চাটিয়া খাইত। বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, এরা ঠাকুরের প্রসাদ সাধুদের প্রসাদ রোজ খাচ্চে, কুকুরজন্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।[২]

প্রেমানন্দের প্রেম ছিল সর্বভূতে। সকালবেলা মঠের উঠানে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন গাছের উপরে কতগুলি টিয়াপাখী আসিয়া বসিয়াছে। একটি পাখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'মদন, আয় আয়!' অমনি সেই টিয়া তাঁহার হাতের উপর আসিয়া বসিল। ওকে একটু খাবার দে, তিনি উপস্থিত ব্রহ্মচারীদিগকে কহিলেন, এবং নিজহাতে আধখানা কলা উহাকে খাওয়াইলেন। ইহার পর হইতেই তিনি যখন খাইতে বসিতেন মদ্‌না তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত ও তাঁহার পাত হইতে খাইতে থাকিত। তারপরে

১। মুক্তেশ্বরানন্দ-কথিত। ২। বরদানন্দ-কথিত।

মদ্‌নার অনেক সঙ্গী জুটিল, সকাল-বিকাল উহারা তাঁহার কাছে আসিত। খাবার সময় পাঁচছয়টি টিয়া তাঁহার পাত ঘিরিয়া বসিত, তিনি আদর করিয়া খাওয়াইতেন। সেই সময়টায় পাহারা রাখিতে হইত, বিড়াল আসিয়া না ধরে। মদ্‌না পাখীটা উড়িয়া আসিয়া তাঁহার ঘাড়েও বসিত। বাগানে যখন তিনি বেড়াইতেন মদ্‌না উড়িয়া উড়িয়া তাঁহার সঙ্গে চলিত। কিছুদিন পরে মদ্‌নাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, উহার সঙ্গিরাও আর আসিল না।[১]

১। মুক্তেশ্বরানন্দ-কথিত।

ব্রহ্মচারি-শিক্ষণ

বাবুরাম মহারাজ মঠের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ—নবীন ব্রহ্মচারীদের জীবন গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সন্তানের উপর মায়ের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও দরদ লইয়া। পরমা প্রকৃতির অংশভূত ও প্রকৃতিভাবে ভাবিত শ্রীবাবুরাম স্বভাবতই মাতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল অধ্যাত্মরাজ্যের বালক-দিগের সংস্পর্শে আসিয়া। তাহাদিগকে প্রায়শঃ 'বেটা' শব্দে সম্বোধনের মধ্যেও তাঁহার এই মাতৃত্বের পরিচয় পরিস্ফুট।

এমন অনেক জননী আছেন যাঁহারা ছেলে কিছুটা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরে তাহার প্রতি বাহ্যতঃ অধিক স্নেহ প্রদর্শন করেন না, সর্বদা তাহাকে একটা শৃঙ্খলা ও শাসনের মধ্যে রাখিতে চাহেন। আদরে আদরে ছেলে না বিগড়াইয়া যায়, এবং যথাসম্ভব নিজের চেষ্টায় তাহার মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে—ইহাই থাকে জননীর লক্ষ্য। কৈশোরে এমনই এক গরীয়সী মায়ের শাসনে ও শিক্ষায় শ্রীবাবুরাম মানুষ হইয়াছিলেন। মঠের ছেলেদিগকে মানুষ করিবার কালে তিনি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিতেন মনে হয়। সেই সঙ্গে তাঁহার মহতো মহীয়ান শ্রীগুরুদেবের আদর্শ-জীবনের ছাঁচে গঠিত নিজের অনুপম জীবনখানি তিনি তাহাদের কাছে অনাবৃত রাখিতেন—জীবন হইতে জীবন সঞ্চার করিয়া ক্ষুদ্রশক্তি আধারগুলিতে অনায়াসসিদ্ধি আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে।

বাবুরাম মহারাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। তাঁহার ঠাকুরপূজার কথা আগেই বলা হইয়াছে। গঙ্গাপূজা করিয়া আসিবার পরে পাতায় করিয়া তাঁহাকে কিছু ফলাদি প্রসাদ দেওয়া হইত; ঠাকুর-ভাঁড়ারের দ্বারে বসিয়া তিনি যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন, অবশিষ্টাংশ যে-কেহ কাছে থাকিত তাহাকেই দিতেন। তারপরে ভক্তগণের পত্রের উত্তর লিখিতে বসিতেন। যেদিন মধ্যাহ্নভোজনের পরেও পত্র লিখিতেন সেদিন একটুও বিশ্রাম করিতে পাইতেন না।

আহারাদি ব্যাপারে তিনি সকলের সঙ্গে সমানভাবে চলিতেন। কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার পরে (১৯১৬) ইহার কিছুটা ব্যতিক্রম হইয়াছিল, চিকিৎসকের কথায়, স্নেহশীল গুরুভ্রাতা শরৎ মহারাজের ব্যবস্থাপনায়।

তাঁহার মাত্র দুইখানি কাপড় (পাঁচহাতি), দুইখানি মুড়িসেলাই চাদর, দুইটি হাতকাটা জামা (ফতুয়া) ও একখানি গামছা থাকিত। চটিজুতা পায়ে দিতেন, ছাতা এবং একটি লম্বা লাঠিও ব্যবহার করিতেন। একটি বেটুয়ায় মুখশুদ্ধি করিবার মশলা থাকিত। বাহিরে যাইবার সময় ক্যাম্বিসের ব্যাগে একখানি গীতা ও সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিতেন। একখানি কম্বলও তাঁহার ছিল না ; একবাব বিদেশে যাইবার সময় একখানি ভাল কম্বল কেহ তাঁহার জন্য অন্য সাধুব কাছে চাহিতে গিয়াছিল ! মঠে যে বিছানাপত্র তিনি ব্যবহার করিতেন সবই ছিল মঠের সম্পত্তি।

যেবার তিনি মহারাজের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে যান (১৯১৬), ভক্তেরা তাঁহাকে অনেকগুলি জামা,কাপড ও চাদব দিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া আসার পরদিনই 'আয় আয় বেটারা !' বলিয়া সাধুদিগকে আহ্বান করিলেন এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জামা-কাপড-চাদর বিলাইয়া দিয়া কহিলেন, আঃ, বাঁচা গেল ! আমার এসব সয় না, ঠাকুর সঞ্চয় কবতে পাবতেন না।

অসুস্থ অবস্থায় দেওঘবে যাইবাব পূর্বে জনৈক ভক্ত তাঁহার জন্য চারিটি জামা প্রস্তুত করাইয়া সেবকেব হাতে দিয়া যান। সেখানে যাইবার পবে যখন তিনি ইহা জানিতে পারেন তখন সেবককে তিবস্কার কবিয়া বলিয়াছিলেন, এত বেশী কাপড-চোপড রাখা আমার কোন কালের স্বভাব নয়।

মঠে একদিন সেবক কৌশলে তাঁহার ছেঁড়া জুতাটি সবাইয়া সেইরূপ একটি নূতন জুতা উহার জায়গায় রাখিয়া দেন। অধিকাংশ সময় ভাবে থাকিতেন, দুইদিন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তৃতীয় দিন জুতার দিকে দৃষ্টি পডায় কহিলেন,—এ তো নতুন জুতা, আমার ছেঁড়া জুতাটা কোথায় ? ওটা তো বেশ ছিল ! বেটারা আবার কোথা থেকে ভিক্ষে করলে ?

তাঁহার জন্মদিনে উৎসব করিবাব জন্য তাঁহার জননী প্রতিবৎসর কিছু টাকা পাঠাইতেন। এই বিষয়ে কাহাকেও কিছু জানিতে না দিয়া সেই টাকা তিনি মঠের ঠাকুরসেবা তহবিলে জমা করিয়া দিতেন। কোনরূপে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে জননী সাবধান হইয়া যান, টাকাটা তিনি আর ছেলের নামে পাঠাইতেন না।

জপধ্যানের ও আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সকল সময়েই বাবুরাম মহারাজ ব্রহ্মচারীদিগকে কাজে লিপ্ত রাখিতেন। দুই বেলা তরকারি কাটা, গরুর জাব দেওয়া, বাগানের বৃক্ষলতায় জল সেচন করা, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, শীতকালে গুঁড়া কয়লা ও গোবর মিশ্রিত করিয়া গুল পাকানো, বর্ষান্তে চোরকাঁটা তুলিয়া মাঠ পরিষ্কার রাখা, মাসে অন্ততঃ দুইদিন—দশমীতিথির সকালে, যখন গঙ্গাজল কতকটা পরিষ্কার থাকে—গঙ্গাগর্ভ হইতে বালতি বালতি জল আনিয়া প্রায় পঞ্চাশটি জালা ভর্তি করা—এই সবই ছিল তাহাদের করণীয় কাজের মধ্যে। সকলকেই যে সব কাজ করিতেই হইত, এমন নহে। কেহ জপধ্যান অধিক করিতেন, কেহ বা শাস্ত্র-পাঠে অধিক ব্যাপৃত থাকিতেন। তবে সকলকেই কিছু-না-কিছু হাতে-নাতে করিতেই হইত। যাহার শাস্ত্রপাঠে অধিক ঝোঁক দেখিতেন তাহাকে বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, কর্মপটু হও, কেবল শ্লোক ঝেড়ে খাবি? কাহাকেও বা নিয়মিতভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিতে দেখিলে বলিতেন, কেবল কুলিগিরি করবার জন্যে এখানে এসেচিস?

সকল কাজে সকলের সঙ্গে তিনি ফিরিতেন, আর নিজেও যথাশক্তি করিতেন। কাজ করিতে করিতে ঠাকুর-স্বামিজীর কথা শুনাইতেন। কাহারও কাজের ভুল হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখিতেন। অমনোযোগিতা বা ফাঁকি দেওয়ার ভাব দেখিতে পাইলে তিরস্কার করিতেন। চোরকাঁটা তুলিতে গিয়া একজন কেবল শীষগুলি ছিঁড়িতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ওরে বেটা, গোড়া রেখে রেখে কেবল ডগাগুলি ছিঁড়ছ, তুমি যে কেমন সাধু তা বুঝতেই পারচি![১]

১। জ্ঞানেশ্বরানন্দ-কথিত।

কাজে ভুলভ্রান্তি ঘটে, হয় অনভিজ্ঞতার জন্য, না হয় অমনোযোগিতার জন্য। অমনোযোগিতাই ভুলভ্রান্তির প্রধান কারণ। আর সেরূপ স্থলে, পুনঃপুনঃ কাজের ভুল হইতেছে দেখিলে তিনি হাত জোড় করিয়া বলিতেন,—বাবারা, খুব হয়েচে ; এখন ঘরে ফিরে যাও। ও গোবিন্দ (যতীন), এদের এক আনা করে পয়সা দে গঙ্গা পার হবার।

প্রণবানন্দ বলেন ঃ

বিরূপাক্ষ খড় কাটিতে গিয়া বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল কাটিয়া ফেলেন। বড়দা আসিয়া বলিলেন, বাবুরাম মহারাজ, তুমি বিরূপাক্ষকে খড় কাটতে দিয়েচ ? সে আঙ্গুল কেটে বসে আছে ! বাবুরাম মহারাজ তখন চায়ের টেবিলে বসিয়াছিলেন, বলিলেন, ডাক তাকে। কাটা আঙ্গুল অন্য হাতে চাপিয়া ধরিয়া বিরূপাক্ষ আসিতেই কহিলেন,—তুমি নাকি আঙ্গুল কেটেচ ? তোমাকে খড় কাটতে বলা হয়েছিল, আঙ্গুল কাটতে নয়। তুমি সাধু হবার অনুপযুক্ত। গোবিন্দ, একে খেয়া পারের জন্যে চারটি পয়সা দিয়ে দাও। বড়দা বলিলেন, মহারাজ, এবার একে ক্ষমা কর। উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারীরাও সেকথায় যোগ দিলেন। তাহাতে কহিলেন,—দেখ বাবা, যে খড় কাটতে গিয়ে আঙ্গুল কাটে, এত অন্যমনস্ক, সে তার সেই মন দিয়ে তাঁকে ধ্যান করবে কী করে ? আচ্ছা, এবার ক্ষমা করলুম, ভবিষ্যতে যেন এরকম না হয়।

আমি তখন ভাঁড়ারে কাজ করি। পলা হইতে তেল চুঁইয়া দুইতিন ফোঁটা নীচে পড়িয়া যায়, আমার নজরে আসে নাই। ভাঁড়ার হইতে জিনিসপত্র বাহির করিয়া দিবার পর বাবুরাম মহারাজ আসিয়া তেল পড়িয়াছে দেখিতে পান ও আমাকে ডাকিয়া বলেন,—ঠাকুরের জিনিস এরকম করে অপচয় করচ তুমি ? গৃহস্থরা তাদের কষ্টের অর্জন টাকা দেয় ঠাকুরের সেবার জন্যে। আমি তোমায় গড় করি, আর কাজ করতে হবে না তোমাকে। বলিয়াই মাথা নোয়াইয়া চলিয়া গেলেন, আর আমার যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এই মহাপুরুষের কৃপাকটাক্ষে কলির জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে। তিনিই আমাকে গড়

করিতেছেন, আমার যে নরকেও স্থান হইবে না। ক্ষুব্ধ হইয়া অনশনব্রত গ্রহণ করিলাম, গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার ইচ্ছাও এক একবার হইতে লাগিল। বাগান হইতে তরকারি নিয়া আসা, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেওয়া সবই নিয়মিতভাবে করিয়া যাই কিন্তু বাবুরাম মহারাজের দৃষ্টি এড়াইয়া চলি, আর গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য কিছু খাই না। এভাবে সাতদিন কাটিয়া যাওয়ার পর কৃষ্ণলাল মহারাজ মঠে আসেন ও প্রভাকর (পাচক) তাঁহাকে সব কথা বলিয়া দেয়। 'আপনি হরিপদকে কী বলেছিলেন? আপনার উপর রাগ করে সাতদিন সে কিছুই খায় নি!' কৃষ্ণলাল মহারাজের মুখে একথা শুনিয়া তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, কলাপাতায় করিয়া ঠাকুরের যে ফলমূল প্রসাদ তাঁহাকে দেওয়া হইত তাহা হাতে নিয়া আমাকে ডাকিলেন। ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বাঁ হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া নিয়া বলিলেন,—তু বেটা আমার উপর রাগ করেচিস? তোরা ছাড়া আমাদের আর কে আছে? অন্যায় দেখলে তোদের বকব না তো কাকে বকব? সাধুসন্ন্যাসীর বকুনিতে চিত্ত শুদ্ধ হয় তা জানিস? তারপরে প্রসাদের পাতাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—খা বেটা, খা। আমি প্রসাদ পাইয়া চোখের জলে তাঁহার পা-দুইখানি মাথায় স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম।

ঠাকুরঘরের সিঁড়ির নীচে ডাবের বোঁটা, শালপাতার টুকরা, ছেঁড়া কুশাসন ইত্যাদি অনেক দিন ধরিয়া জমিয়া স্থানটি নোংরা হইয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাঁড়ারী কে রে? জোড় হাতে বলিলাম, আজ্ঞে আমি। 'তুমি বেটা ভাঁড়ারী হয়ে সিঁড়ির নীচটা এরকম নোংরা করে রেখেচ? বলিয়াই হাতের লাঠি দিয়া পিঠে দুইতিন ঘা বসাইয়া দিলেন। বেশ জোরে না হইলেও একটু যে না লাগিয়াছিল এমন নয়। তখনই স্থানটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। যতদিন মঠে ছিলাম, ভাঁড়ারী না হইলেও লক্ষ্য রাখিতাম সেখানে আবর্জনা জমিতে না পায়।

গৌরীশানন্দ বলেন:

বাবুরাম মহারাজের আদেশ ছিল ঃ ভক্তরা এলে আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই খেতে বসিয়ে দিবি। একদিন জনকয়েক ভক্ত আসিয়াছে, আর আমিও তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি, হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, কেন আমাকে একটুও জানালি না, আবার রান্না হলে খাবি। তাঁহার আদেশই তো পালন করিয়াছি, তবে কেন আমাকে ভর্ৎসনা করিলেন ? এইরূপ ভাবিয়া আমাব খুব অভিমান হইল। আহারের পর তিনি কহিলেন, দেখ্, একটা ভাল কাজ করলি, আবার অভিমান করে সেটা নষ্ট করে দিলি ? আরও কহিলেন, আমি তো কে কোথায় আছে খুঁজে দেখতে পারি না ; তোরাই খুঁজে পেতে ডেকে এনে বসিয়ে দিবি।

বডবাজার হইতে বাবুবাম মহারাজ মঠে ফিবিতেছিলেন সঙ্গে আমি ও হরিহর! এক ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিয়া পবিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার মনে হইতেছিল যেন অনেক কালের চেনা লোক। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, শ্যামবাজার স্কুলে একসঙ্গে পড়িতেন, কিন্তু পরিচয় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 'তুমি কি কথামৃতের বাবুরাম ?' ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন। পরিচয় গোপন রাখা আর সম্ভব হইল না। তিনি সাদরে আমাদিগকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন একপ্রকার জোর করিয়াই ; আর একটা ঘরে বসিতে দিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল ; তিনি আর ফিরিয়া আসেন না! আমরা উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। অন্যূন তিন ঘণ্টা পরে ভদ্রলোক অন্দর হইতে আসিলেন ও আমাদিগকে দেখিয়া কাতরভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'কী অন্যায় হয়ে গেল, আমি সব ভুলে গিয়েছিলুম! তিনি স্নানাহার বিশ্রাম সারিয়া আসিয়াছেন! যাহা হউক, ক্ষমা চাহিয়া ও জলযোগ করাইয়া তিনি আমাদিগকে বিদায় দিলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, কেন চটবে ? বিষয়ীর বিষয়ের উপর টানকে ঠাকুর কেন এত বড় বলে গেছেন তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে। এ সুযোগ না পেলে কি তা বুঝতে পারা যেত ?

কমলেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন ঃ

শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন,—হে উদ্ধব, ভক্তিযোগ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় শুন—

উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি
সংমার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া।[১]

ইহা ভাগবতধর্ম। ভগবদ্গতপ্রাণ প্রেমানন্দ এইরূপে আমাদিগকে পরম শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্ত করাইয়া আচার্যযোগ্য কর্ম করিতেন। গুরু শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সর্বদা কর্ম করেন। কেবল যুক্তি দ্বারা শিষ্যকে বুঝানো প্রাচীন রীতি নহে। শিশুশিষ্যের পক্ষে তাহা ধারণা করাও অসম্ভব। মহাভারতে দেখা যায়, আরুণি গুরুর আদেশে জল রক্ষার জন্য আলের উপর নিজ দেহ রাখিয়াছিলেন। উপনিষদে সত্যকাম জাবাল গুরুর আদেশে গোচারণে নিযুক্ত। তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্র ছিল না। গুরুকৃপায় ব্রহ্ম প্রতিভাত হইত। তখন সেকথা বুঝিতাম না, পরস্পর বলাবলি করিতাম ঃ 'এঁরা কুলির মত খাটাচ্চেন, এতে কী হবে? এতে তো মানুষ গড়বে না।...এঁরা যে শিক্ষা-প্রণালী দিচ্চেন তাতে তো দেখচি এই মঠ অচিরে একটি বাবাজীদের আখড়ায় পরিণত হবে।' কিন্তু আপনারা মনে রাখিবেন, এই মঠে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার মূলেও স্বামী প্রেমানন্দ। আমরা কয়েকটি যুবক যখন একসঙ্গে মঠে স্থান পাইলাম আমাদের সংস্কৃত চর্চার জন্য তিনিই অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন।

১৯১৩, ৩০শে নভেম্বর বাবুরাম মহারাজ কাহাকেও লিখিয়াছেন ঃ 'মঠে একজন পণ্ডিত রাখা হয়েছে, তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়াচ্ছেন, দশ বার জন ব্রহ্মচারী অধ্যয়ন কচ্ছে।' ১৯২২, ৩০শে জুলাই স্বামী শিবানন্দ

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।১১।৩৮-৩৯॥ 'আমার উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর ও মন্দিরকর্মে স্বতঃ বা দলে মিলিত হইয়া উদ্যম; সম্মার্জন, উপলেপন, গন্ধজল সেচন ও সর্বতোভদ্র প্রভৃতি মণ্ডল-স্থাপন দ্বারা দাসের ন্যায় অকপটভাবে আমার গৃহসেবা।'

লিখিয়াছেন ঃ 'মঠে একটি সংস্কৃত টোল প্রায় দশ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে।...ইংরাজী, দর্শনাদির চর্চাও যাহাতে মঠে নিয়মিতরূপে চলে তদ্বিষয়ে বাবুরাম মহারাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।'

প্রশান্তানন্দ বলেন ঃ

যশোহরে কাব্যের উপাধি-পড়া পরিত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে যোগদান করিতে আসি। স্বামিজীর দুইএকখানা বই পড়িয়া আমার ধারণা জন্মে যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। মঠে তখন বাবুরাম মহারাজ জ্বরে শয্যাগত ছিলেন, কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে কলিকাতায় শরৎ মহারাজের কাছে পাঠাইয়া দেন। শরৎ মহারাজকে আমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় করিয়া দিতে বলিলাম। তিনি সহানুভূতির সহিত কহিলেন,—কাশীতে মহারাজ আছেন, তাঁর কাছে গেলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তোমার শরীরটা খারাপ, দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, আগে শরীর ভাল করা দরকার। কাশীতে গেলে তারও ব্যবস্থা হবে। তিনি মহারাজের নামে খামে হাতচিঠি লিখিয়া দিলেন।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে গিয়া মহারাজকে বলিলাম, তিনি তখন রোয়াকে পায়চারি করিতেছিলেন, আমি ব্রহ্মানন্দস্বামীর হাতে এই চিঠি দেব। 'এখানে ব্রহ্মানন্দস্বামী কেউ আছেন?' তিনি চন্দ্র মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'থাকতে পারেন, তিনি কোথায় আছেন কি জানি!' 'চিঠিটা রেখে দাও ব্রহ্মানন্দস্বামীকে দিয়ো।' তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া বলিলাম, 'আমি নিজেই তাঁর হাতে দিতে চাই, অনুগ্রহ করে তাঁকে দেখিয়ে দিন।' চন্দ্র মহারাজ চোখ টিপিয়া ইসারা করায় মহারাজের হাতেই চিঠিখানা দিলাম।

বাবুরাম মহারাজ তখন কাশীতে বায়ুপরিবর্তনে আসিয়াছেন (১৯১৩)। পরদিন সকালে তিনি ও মহারাজ যখন অদ্বৈতাশ্রমে আছেন, আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আসিয়াছি জানাইলাম। মহারাজ কহিলেন, এখানে এসব কিছু নাই। আমি বলিলাম, আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই, আমার

বিশ্বাস আপনারা করে দিতে পারেন আর শরৎ মহারাজও সেকথা বলে পাঠিয়েচেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, শরৎ মহারাজ তোমার পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে লিখেচেন। 'পড়তে আসি নি, পড়া ছেড়ে এসেচি ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে।' আমি উত্তর দিলাম। মহারাজ কহিলেন, কোথায় থাকবে তা হলে? এখানে তো ব্রহ্মজ্ঞানের কোন ব্যাপার নাই! 'বাইরে থেকে, কাশীতে তো ভিক্ষা পাওয়া যায়, ভিক্ষা করে খাব, আর আপনাদেরও সঙ্গ কবব, যদি কিছু উপায় হয়। উপায় না হলে অন্যত্র চেষ্টা দেখব।'

সকাল বেলা বাবুরাম মহারাজ আমাকে সঙ্গে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। এক পয়সার টেপারি কিনিতেন, নিজে খাইতেন, আমাকেও দিতেন, আব পডার স্বপক্ষে বলিয়া বুঝাইতেন। 'বত্রিশ বছর সাধু হয়েচি, শুধু জপধ্যান নিয়ে তো থাকতে পারি না। তোমার যদি সে শক্তি জন্মায় ভালই, নতুবা কী নিয়ে দিন কাটাবে?' 'আপনাদের সঙ্গ করব।' 'আমরা তো সব সময় থাকব না, তখন কী করবে?' 'গীতা বেদান্ত এসব পড়ব।'

নিজের যুক্তিতেই পড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করিয়া ফেলিলাম। বাবুবাম মহাবাজ আমাকে তাঁহাব পরিচিত মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণিব কাছে সাংখ্য-বেদান্ত পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার কথায় কাব্যের উপাধি-পরীক্ষাও দিয়াছিলাম, বলিয়াছিলেন,—অসমাপ্ত কিছু রাখতে নাই; কাব্যে মেয়েদের বর্ণনা পড়ে তোমার কিছু ক্ষতি হবে না; আমাদের যদি বিশ্বাস কর, আমরাই দায়ী থাকব।

বাবুরাম মহারাজের লেখা দুইখানি পত্রে আছে ঃ

'স্বামিজী শেষদিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে কেবল বিদ্যাপ্রচারের কথা বলেছিলেন।'

'মূর্খ হলেই ভক্ত হয় না। ভাব প্রকাশের ভাষা চাই।...ভাবভক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্চে, ধন?...শিক্ষা কি সাধন নয়?'

ব্রহ্মচারীদের পড়ার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াই বাবুরাম মহারাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তাহারা মন দিয়া পড়াশুনা করিতেছে কিনা সেই দিকেও

লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার কথানুসারে, প্রায় তিন বছর পাঠ চলিবার পর, একবার পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার বিষয় ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ, আর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন দুইজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী জগদানন্দ।

পরীক্ষার দিন আহারের সময় পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে দুই চামচে করিয়া ঘি দেওয়া হইল। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, এত করে যে ঘি খাওয়াচ্চি তা এমনি নয়; যে পাস করতে না পারবে তাকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে। তারপরে কয়েকদিন সকলেই চুপচাপ। একদিন বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেরা কেমন পরীক্ষা দিয়েচে? দুইজন পরীক্ষকই একবাক্যে কহিলেন, সকলেই পাস করেচে![1]

ব্রহ্মচারী হৃষীকেশ (প্রশান্তানন্দ) ও আর একজন ৺কাশী যাইবেন, ভাণ্ডারীকে বাবুরাম মহাবাজ চিঁড়া ও চিনি দিতে আদেশ করিলেন, তাঁহারা পথে খাইবেন। দুইজনের উপযোগী চিঁড়া-চিনি লইয়া তাঁহারা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কহিলেন,—আরো নে। আর কোন যাত্রীকে দিবি না? আর কারো দরকার হলে তখন কী করবি? তিনি আরও চারিজনের উপযোগী চিঁড়া-চিনি দেওয়াইলেন।

সেবাধর্মকে ভিত্তি করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্যাপীড়িত, অন্নাভাবক্লিষ্ট বা মহামারী-কবলিত হইয়া যেখানেই বহু লোক শোচনীয় অবস্থায় আপতিত, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সেখানে যাইয়া দুঃস্থ নর-নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। দীর্ঘকাল এইভাবে কাজ করিয়া করিয়া তাঁহারা দেশের মধ্যে একটা সেবার ভাব জাগ্রত করিতেও পারিয়াছিলেন।

মঠের সাধুসংখ্যা তখন নগণ্য, অথচ বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারী লাগিয়াই আছে। দীর্ঘস্থায়ী সেবাকার্যের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেরই

১। হরানন্দ-কথিত।

স্বাস্থ্যহানি ঘটিত, ঘন ঘন রিলিফের কাজে যাইতে তাঁহারা চাহিতেন না। আর্তত্রাণের আহ্বান অসিতেছে অথচ লোক পাওয়া যাইতেছে না এইরূপ অবস্থায় মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকে কখন কখন অসুবিধায় পড়িতেও হইত।

১৯১৫ অব্দে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় দুর্ভিক্ষ করাল মূর্তিতে দেখা দিল। সেবক সংগ্রহ করিতে শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেন। তরুণ সাধুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হয়েচে, শরৎ মহারাজ এসেচেন সেবক সংগ্রহ করতে, কে যাবে বল? প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল, 'আমি যাব।' যাহারা চুপ করিয়া ছিল তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোদেরও যেতে হবে, ঠাকুরের কাজ আমি একাই চালিয়ে নিতে পারব। দশজন সেবক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলে শরৎ মহারাজ কহিলেন, বাইরের কাজের ভারও যখন বাবুরামদা নিয়েচেন তখন জানলুম স্বামিজীর কাজ এখন ঠিক চলবে। আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

সকল সময়ে সেবাবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্য করিতে অনেকেই পারে না। দিনেব পর দিন বিষয়ী লোকের সংস্পর্শে আসিয়া অনাত্মদর্শী সাধকের বাসনাময় সংস্কারগুলি সহসা জাগিয়া উঠিতে পারে, এবং ভোগের বস্তু হাতের মুঠায় পাইয়া তাহার নৈতিক বিচ্যুতি ঘটাও কিছু বিচিত্র নহে। নূতন ব্রহ্মচারীদিগকে মঠ হইতে দূরে পাঠাইয়া বাবুরাম মহারাজ তাই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না; ঠাকুর-স্বামিজীর জ্বলন্ত ত্যাগাদর্শে তাহাদিগকে সচেতন রাখিতে চাহিতেন উদ্দীপনাময় চিঠিপত্র লিখিয়া, আর তাহাদের হৃদয়ের প্রসার বাড়াইয়া দিতেন মুক্তহস্তে দানের প্রেরণা দিয়া।

'কেবলমাত্র দুমুঠো চাল দেবার জন্য ঠাকুর তোমাদের ওখানে পাঠান নাই—মহত্ত্ব ও দেবত্ব দেবার জন্য। উচ্চ মন, উদার হৃদয় কেমন করে লাভ করতে হয় শিখে নাও। এমন সুযোগ আর পাবে না।'

'খুব খরচ করে যাও, দানের জল জমান ভাল নয়। প্রাণ খুলে সেবা কর।'

বাসুদেবানন্দ লিখিয়াছেন ঃ

১৯১৫-১৬ সালের বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের সময় একজন ছাত্রকর্মীর মারফৎ পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমাদের জন্য নিম্নোক্ত উপদেশগুলি লিখিয়া পাঠান :

(১) দরকার না থাকলে কারুর সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়।

(২) দরকার না থাকলে কারুব সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। গলার কসরৎ করতে হয় তো কোনও ভাল কবিতা বা গদ্য বা ঠাকুর-স্বামিজীর কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করবে।

(৩) সব সময় একটা না একটা সৎ বিষয় নিয়ে থাকা চাই-ই।

(৪) নরকের রাস্তা যখন এত সামনে তখন কাম, ক্রোধ, কর্তৃত্ব ও পর-শ্রীকাতরতার বেগ যেমন করে পার সহ্য কব।

(৫) সামর্থ্য থাকলে তখনই দান করবে।

(৬) যে সকলেব নীচে থেকে বড কাজ করতে পারে সেই কর্মযোগী। কিন্তু যারা কর্তৃত্ব ও সম্মান না পেলে কাজ করতে পারে না তাদের বুঝতে হবে গুপ্তভোগী।

(৭) শরীর খারাপ না হওয়া পর্যন্ত কোনও খাবার খারাপ বলবে না। বছরের পর বছর ভোগরাগ দিয়ে প্রসাদ পেতে পেতে এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে সাধারণ খাদ্যে আর রুচি থাকে না।

(৮) বড়লোকের দেওয়া ভাল কাপড ও বিছানা ব্যবহার করতে করতে তাতেই অভ্যাস হয়ে যায়।

(৯) রোগের সময় পরের সেবা নিতে নিতে দেখো যেন সুস্থ শরীরেও সেবা নিতে ইচ্ছা না করে।

(১০) কাউকে অসুস্থ দেখলেই সেবা করবে। বহু জন্মের ভাগ্যে স্বামিজীর অপূর্ব দান সেবাধর্ম প্রাপ্ত হয়ে যদি বেদান্ত পডা ও জীবসেবার মূল্য তোমার

কাছে এক বলে বোধ না হয়, তা হলে বুঝবে বুদ্ধ হতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত মহাপুরুষগণ থেকে তুমি দূরে দাঁড়িয়ে।

সকাল বেলা ঠাকুরঘর হইতে আসিয়া বাবুরাম মহারাজ মঠবাড়ীর পশ্চিমদিকের বারান্দায় বসিয়াছেন, সাধুরা একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাইতেছেন। জনৈক ব্রহ্মচারী প্রণাম করিতেই কহিলেন, 'কি ডোমপাড়া থেকে এলি ?' সেদিন জপ করিতে বসিয়া তাহার মন অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

'কেমন, ধ্যান জমচে কি ?' অন্য এক ব্রহ্মচারীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন। 'আমাদের চেষ্টায় আর কী হবে, আপনি দয়া করে শক্তি দেন তো হয়।' এই আর্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল ও দৃঢ়স্বরে কহিলেন, এখনি দিচ্চি, নিতে পারবি ? ব্রহ্মচারীটি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। 'ওরে, নেবারও ক্ষমতা চাই।' তিনি আবার কহিলেন।

বরদানন্দ বলেন ঃ

সকালে আমরা যখন প্রণাম করিতে গিয়াছি, বাবুরাম মহারাজ কেমন জপ হইতেছে জিজ্ঞাসা কবিলেন। বলাই (গোবিন্দানন্দ) বলিল, জপ করে যাই, মালাও ঘুরে যন্ত্রবৎ, কিন্তু মন কোথায় থাকে বুঝতে পারি না। তিনি বহিলেন, যে কথাগুলো আমাকে বল্লে, ঠিক সেই কথাগুলো ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরকে বলে এস, বল্লে তিনি শোনেন। ভোরের দিকে ঠাকুরঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় সারিবদ্ধ হইয়া আমরা জপ করিতে বসিতাম। তিনি পায়চারি করিতে করিতে জপ করিতেন ও আমরা কে কেমন জপ করিতেছি লক্ষ্য রাখিতেন। ঐরূপ সময়ে একদিন একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে আসিল ; পরে দেখা গেল বলাইর গণ্ড বাহিয়া ধারা বহিতেছে। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, বলেছিলুম না, বল্লে তিনি শোনেন ? এবার টের পেলি তো ?

দুপুরে খাওয়ার পর পূর্বদিকের বারান্দায় বাবুরাম মহারাজ বেঞ্চে বসিয়া, আমরা সকলে দাঁড়াইয়া। কৃপা ও পুরুষকার নিয়া কথা উঠিল। মুক্তি,

বিরূপাক্ষ এরা বলিল, পুরুষকার ছাড়া কী করে হবে? তিনি বলিলেন, পুরুষকারও তিনি দিলে তবে হয়, পুরুষকারের মূলেও তাঁর কৃপা। আরও অনেক কথা হইয়া যাইবার পরে বলিলেন,—আমি আমি যে করচ, আমি কোথায়? সবই যে তিনি! এমন সময় পূর্ণবাবু আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া উপরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, খাবার পরেও বকাবকি করে মাথা গরম করে?

আমি উচ্চাঙ্গের কালীকীর্তন করিতাম। পদাবলী কীর্তন আমার ভাল লাগিত না—গাওয়া দূরে থাকুক, শুনিতেও চাহিতাম না। বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে গিয়াছি ঠাকুরের উৎসবে মেদিনীপুরে। একদিন বলিলেন, আজ একজন মোক্তার পদাবলী গাইবেন, শুনবি। শুনিবার জন্য তিনি জেদ করিতে লাগিলেন। সেদিন কীর্তন এতই জমিয়া গেল যে, তিন ঘণ্টা আমি আসন ছাড়িয়া উঠিতে পারিলাম না! বাবুরাম মহারাজ আমার সম্মুখের সারিতে বসিয়াছিলেন।

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছি বসু-ভবনে। তাঁহার মার অসুখ। মাকে তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পায়েব ধূলা নিলেন। আমিও সেইরূপ করিলাম। 'তুই আমার মাকে প্রণাম করলি যে?' তিনি প্রশ্ন করিলেন। 'আপনার তো মা, আপনি করলেন, আমি করব না?' আমার কথার উত্তরে শুধু কহিলেন, যা যা বেটা। তাঁহার দিদি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। খাইতে বিলম্ব হইবে, বলিলেন, চল্, উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করে আসি। বাড়ীতে ঢুকিবার আগেই রাস্তায় দাঁড়াইয়া চাতাল হইতে ধূলা নিয়া বাররার মাথায় দিলেন, আমাকেও নিতে আদেশ করিলেন। 'কত রকমের লোক পা দিচ্চে, আমি নেব না।' বলিতেই কহিলেন, আমি বলচি, নে। তারপরে উপরের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—উপরে কে আছেন জানিস? এবার দু হাত আর মুণ্ডমালা রেখে এসেচেন তোদের জন্যে।

মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী কর্তাদের না জানাইয়া কলিকাতায় যায়। সকালে চায়ের টেবিলে মহারাজ বসিয়া আছেন, বাবুরাম মহারাজ সেই ব্রহ্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুই কী আহাম্মক। মহারাজ মঠে রয়েচেন, তুই কিনা তাঁকে না বলে কলকাতা গেলি। মহারাজ বলিলেন, তাই তো, বাবুরামদা রয়েচেন মঠে, তাঁকে না বলে তুই গেলি? প্রণাম কর্ বাবুরামদাকে। 'না না, মহারাজকে প্রণাম কর্, মহারাজকে প্রণাম কর্।' বাবুরাম মহারাজ কহিলেন।[১]

বাসুদেবানন্দ লিখিয়াছেন :

একদিন সকালে খুব ধ্যানভজন চলেচে শ্রীমহারাজের ঘরে, কেউ নীচে নামে না। এদিকে বাবুরাম মহারাজ চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন,—ওরে ভক্তেরা, কে কোথায় আছিস নেমে আয়, ঠাকুরের রান্নার জোগাড় তো এখনো হল না। মহারাজ সকলকে নীচে যেতে বল্লেন, আর বল্লেন,—গিয়ে ওঁকে বল—মশাই, মুক্তিটা দিয়ে দিন না, তা হলেই তো আর ধ্যানভজনের ঝঞ্ঝাট থাকে না; আপনি তো ইচ্ছা করলেই দিতে পারেন। শুনে বাবুরাম মহারাজ বল্লেন,—আচ্ছা, তোমরা সমাধি অভ্যাস কর, আমার কোন আপত্তি নেই, আমি নিজেই সব করব। কিন্তু সমাধির নামে যদি মনের মধ্যে হাটবাজার বসাও, তা হলে কিন্তু ধরে এনে কাজে লাগাব।

১৯১৫, ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি। অশোক হৃষীকেশ যেতে চায়, বাবুরাম মহারাজ বাগানে দাঁড়িয়ে তাকে বলচেন : ঠাকুরসেবা কি তপস্যা নয়?... সেখানে রুটি চিবুলে তপস্যা হয়, আর এখানে তাঁর প্রসাদ খেয়ে তপস্যা হয় না? আমি বৃন্দাবনে রুটি খেতুম যেন পেতলের গামলাভাঙা। এই গঙ্গাতীর, ঠাকুরের অধিষ্ঠান, স্বামিজীর সমাধি, তাঁর চিন্তা এখানে আকাশে বাতাসে ওতপ্রোত হয়ে রয়েচে, এখানে তাঁর সেবা ধ্যানজপ করে যদি কিছু না হয় তো সেখানেও তোমার কিছু হবে না। তবে নতুন দেশ দেখা, হাওয়া বদলানো এগুলো হতে পারে।...প্রথম প্রথম সেখানে গিয়ে একটু জপধ্যান চেপে লোকে

১। বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত-কথিত।

করে, তারপর যন্ত্রবৎ হয়ে পড়ে। তার মানে মন এখনো কাঁচা, ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য এখনো হয় নি।...কখন কখন দেখেছি, লোকের সঙ্গে কথা না বলতে পেরে শেষে গাছপালার সঙ্গে কথা বলে, পাখীদের বাঁদরের কাছিমের খেলা দেখে দিন কাটায়। আর যদি বা সঙ্গী পেল তো গল্পগুজবে দিন কেটে গেল। যখন অনুরাগে গর্‌গর্‌, বিষয়কর্ম সংসার ভাল লাগে না, ভগবানের জপ ছেড়ে অন্য কাজ করবার সময় থাকে না, তখন বিবিক্তদেশসেবিত্ব, তখন বৃন্দাবন হৃষীকেশ সার্থক।...যথার্থ সাধু হবে একান্তী, কিন্তু যতদিন মন কাঁচা থাকবে ততদিন গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করাই ভাল।

একদিন আমি ও শচীন বল্লুম, ধ্যানজপ করে কিছু অনুভূতি হলে সাধনে আরও উৎসাহ হয়। বাবুরাম মহারাজ বল্লেন,—ধরে থাকতে হয়। সন্ধ্যা নাগাৎ পাতা সকলেরই পড়বে। ছাড়িস নি, ও ঠিক ঠাকুর করে নেবেন। বুড়োগোপালদা বলত, ঠাকুরের কাছে প্রথমবার গিয়ে কোন কিছুই বুঝতে পারলুম না, কেন লোকে এঁকে মহাপুরুষ বলে। দ্বিতীয়বারও তাই হল। আর যাবে না ঠিক করলে। শেষে এক বন্ধুর অনুরোধে যখন তৃতীয়বার গেল তখন ঠাকুর তাকে ধরলেন (বাবুরাম মহারাজ এই কথাগুলো খুব জোর দিয়ে বলেন)। আর যাবি কোথায়? গোপালদা বলত, তারপর থেকে দিনরাত কেবল ঠাকুরের কথা মনে হত, বুকের মধ্যে যেন সর্বদাই কী একটা ব্যথা, চেষ্টা করেও ঠাকুরের মুখ ভুলতে পারতুম না! তাঁর কৃপার প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়, যেদিন ধরবেন সেদিন বুঝতে পাববি। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, কিন্তু ছাড়বার জো নেই।

১৯১৬, শীতের প্রারম্ভে গীতা পড়া হচ্ছে মঠের ভিজিটার্স্‌ রুমে। ২।২৯ শ্লোকের ভাষ্যে ভগবান শঙ্কর বলচেন,—'যিনি এই আত্মাকে দর্শন করেন তিনি আশ্চর্য লোক, আবার যাঁরা বলেন ও শ্রবণ করেন তাঁরাও আশ্চর্য ব্যক্তি, কারণ এইরূপ বুদ্ধি অনেক সহস্রের মধ্যে দুইএক জনের হয়ে থাকে। অতএব এই শ্লোকের অভিপ্রায় হচ্ছে, আত্মা অতি দুর্বোধ্য।' এই সময় বাবুরাম মহারাজ বল্লেন,—আত্মস্থ ব্যক্তি চতুর্দশ ভুবন অতিক্রম করেন। আত্মদর্শীরা

আশ্চর্য লোক। ঠাকুর গাইতেন—প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর, ও তার থাকে না ভাই আত্মপর।...চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর।

এক সময়ে কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে কথামৃত পাঠ হইত দর্শকদের ঘরে, ঠাকুরের আরতির কিছুকাল পরে। বাবুরাম মহারাজ উপস্থিত থাকিতেন। কেহ কেহ ক্লান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িলে এই বলিয়া ডাকিতেন— ওরে সব চৈতন্যের দল, ওঠ্ ওঠ্, অচৈতন্য হয়ে থাকিস না।

কখনও স্বামিজীর কর্মযোগ কিংবা অন্য কোন গ্রন্থের পাঠ চলিত, আর বাবুরাম মহারাজ নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিতেন, ভাবের প্রেরণা আনিয়া, বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি ব্যাখ্যা করিয়া। গ্রীষ্মকালে আরতির পর ব্রহ্মচারীদিগকে লইয়া গঙ্গার বাঁধানো পোস্তার উপর বসিয়া ঠাকুরের কথা বলিতেন, তাঁহার জীবনাদর্শে জীবন গঠন করিতে তাঁহাদিগকে উদ্দীপিত করিতেন।

কৈবল্যানন্দ বলেন ঃ ঠাকুরের আরতি হইয়া গিয়াছে। বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসিয়াছেন, আর আমরা কয়েক জন দর্শকদের ঘরে বসিয়া আলাপ করিতেছি। 'কী করচ তোমরা? আরে, সন্ধ্যার সময় ভগবানের নাম কর। ঠাকুর আমাদের নিয়ে কীর্তন করতেন, নাচতেন; আর তোমরা শুধু শুধু বসে গল্প করচ?'—বলিতে বলিতে তিনি ঘরের ভিতর আসিলেন ও গান ধরিলেন, 'এসেচে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।' গানটি তখন নূতন বাহির হইয়াছে। আমরাও দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে গাহিতে লাগিলাম, খোল করতাল বাজিতে লাগিল। তিনি নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, তোমরাও নাচ। গান খুব জমিয়া গেল, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া বহির্বাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, দে, সব কাপড় ফেলে দে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়া ঠাকুরের ভোগের ঘণ্টা পড়িবার পর ধীরে ধীরে গান থামিল।

মহারাজ, হরি মহারাজ বা ঠাকুরের অন্য কোন ত্যাগী সন্তান মঠে আসিলে বাবুরাম মহারাজ নূতন ব্রহ্মচারীদিগকে তাঁহাদের সেবা ও সঙ্গ

করিবার সুযোগ করিয়া দিতেন। এই বিষয়ে কাহারও ভয় বা অন্যরূপ বাধা আছে বুঝিতে পারিলে সযত্নে তাহা দূর করিতেন। বলিতেন ঃ ভগবানের সঙ্গ করে করে এঁরা ভগবান হয়ে গেছেন ; এঁরা সামান্য নন। এঁদের সঙ্গ করলে, সেবা করতে পারলে, ধন্য হয়ে যাবি।

মহারাজ কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিলে বাবুরাম মহারাজ তাহার হাত ধরিয়া মহারাজের কাছে লইয়া যাইতেন এবং কাতরভাবে বলিতেন,—মহারাজ, এ ভাল ছেলে, এর উপর রাগ করবেন না। আপনার হাত এর মাথায় একবার বুলিয়ে দিলেই যা একটু দোষ আছে, সেরে যাবে। এই বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই মহারাজকে দিয়া হাত বুলাইয়া নিতেন।

ব্রহ্মচারীদিগকে সঙ্গে নিয়া বাবুরাম মহারাজ কখন কখন দেবস্থানসমূহে যাইতেন এবং তীর্থক্ষেত্রের আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিতেন। একবার তিনি নবদ্বীপ গমন করিলে রাধারমণচরণদাস বাবাজীর শিষ্য 'ললিতাসখী'—যিনি ব্রজগোপীর ভাবাশ্রয় করিয়া স্ত্রীবেশে থাকিতেন—নিজের অবলম্বিত পথ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। শুনিয়াছি, উত্তরে বাবুরাম মহারাজ শুধু বলিয়াছিলেন, 'বড় কঠিন।'

উমেশ সেন লিখিয়াছেন ঃ ১৯১৬ সালের শীতকালে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে তারকেশ্বর দর্শন করিয়া আসি। তাঁহার সঙ্গে মঠের কয়েকজন ছোকরা সাধু ছিলেন, গোপাল মহারাজ একজন। ষ্টেশন হইতে তিনি প্রথমতঃ পাণ্ডার বাড়ীতে গিয়া ঘরের বন্দোবস্ত করিলেন। তারপরে বাবা তারকনাথের পূজাদি করিয়া, বাজার করিয়া বাসায় ফিরিলেন। হাঁড়ি, খড়ি, চাল, ডাল, আনাজ সবই কেনা হইয়াছিল। সাধুরাই খিচুড়ি, তরকারি এবং আর একটা কী রাঁধিলেন, ভোগও দেওয়া হইল। অনেক বেলায় আহার ও কিছু বিশ্রামের পর ফিরতি গাড়ী ধরা গেল।

নূতন সাধুদিগকে বাবুরাম মহারাজ কখন কখন বলিতেন ঃ তোরা আদর্শের জন্যে খেটে খেটে মরে যা, তাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু বীর

হ, চৈতন্য লাভ কর্, পরমার্থধনে আণ্ডিল হয়ে যা। ক্বচিৎ কাহাকেও বলিয়াছেন ঃ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর্ যাতে তাঁর নিত্যলীলার সহচর হতে পারিস।

সাধুদের প্রতি বাৎসল্য

হরানন্দ বলেন ঃ পূজনীয় শরৎ মহারাজ মঠে আসিয়াছিলেন, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। মঠের নৌকায় করিয়া তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। গঙ্গায় খুব তুফান, ঢেউয়ে ঢেউয়ে জল নৌকায় ঢুকিতেছে ও ছেঁচিয়া ফেলা হইতেছে। বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোরা নিয়ে যেতে পারবি ? আমরা বলিলাম, পারব, এখন মহারাজ যদি পারেন। 'তোরা যদি পারিস তো আমিও পারব' বলিয়াই শরৎ মহারাজ নৌকায় উঠিলেন। তাঁহার ভরসায় তুফানের মধ্যেও আমরা চলিয়াছি আনন্দ করিতে করিতে। শালকিয়া পর্যন্ত আসিয়া তিনি কহিলেন, আমি ষ্টীমারে পার হয়ে যাই, তোরা ফিরে যা, ফিরে যেতে পারবি তো ? তারপরে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, যা, পারবি—মা আছেন। তুফানের মধ্যে আমরা আসিলাম খুবই কষ্টে, পরিশ্রম অতিরিক্ত হইল। বাবুরাম মহারাজ ততক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, কিরে, তোরা এলি নাকি ? আমরা ডাঙ্গায় উঠিবামাত্র একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিলেন, দে দে, ওদের ভাল করে খেতে দে।

প্রভাস (বেদানন্দ) মায়াবতী হইতে চলিয়া আসায় বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে খুব তিরস্কার করিয়াছেন। প্রভাস ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া আছেন। খাওয়ার সময় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, এবং একটা বাটিতে প্রসাদী

দুধভাত লইয়া আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তিনি যতই মিনতির সুরে বলেন, 'ওরে, দোর খোল্, দোর খোল্', ততই প্রভাস অভিমানভরে বলিয়া উঠেন, 'না, আমি দোর খুলব না, খুলব না।' পরিশেষে প্রভাসকে হার মানিতেই হইল, সেই বিশাল মাতৃহৃদয়ের স্নেহবন্যায় তাঁহার অভিমানের প্রকাণ্ড ঢিপিটিও গলিয়া গেল। 'খা বাবা, খা, রাগ করিস নে' বলিয়া স্বহস্তে বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে দুধভাত খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। কমলেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন: এখন মনে হয় বাবুরাম মহারাজ চাহিতেন—তিনি যেমন সকল বিষয়ে ঠাকুরের ছিলেন, ঠাকুরের কাজে অবহিত থাকিতেন, আমরাও তদ্রূপ হই। কিন্তু আমাদের সে সামর্থ্য ছিল না, তাই তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন। আমরা তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য সকল সময় বুঝিতাম না, সেকারণ তাঁহাকে কত কষ্টই না দিয়াছি।

শেষ অসুখের সময় বাবুরাম মহারাজ যখন দেওঘরে ছিলেন, রামবাবু দুগ্ধজাত প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করিতেন। দেওঘরে তখন দুধ খুবই সস্তা। জনৈক সেবককে তিরস্কার করিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন: ঠাকুর বলতেন, সাধুর জিহ্বা ও উপস্থ সংযম করতে হয়, রাত্রে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। সাধু হতে এসে লোভে পড়ে খাওয়া! সেবকটি অভিমানে কোথায় চলিয়া গেল। আহারের সময় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বাবুরাম মহারাজ বিচলিত হইলেন। পরপর দুইজন সেবককে অন্বেষণে পাঠাইলেন। বিকালে বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন এমন সময় ফিরিয়া আসিয়া সে নিঃশব্দে পেছন দিকের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। যেই জানিতে পারিলেন সে ফিরিয়াছে অমনি ডাকিয়া কোলের কাছে আনিয়া বলিতে লাগিলেন,—বাবা, বুড়ো হয়েচি, রোগে শরীর জীর্ণ, মেজাজ সব সময় ঠিক রাখতে পারি না। এ অবস্থায় যদি কিছু বলে ফেলি, আমার উপর রাগ করতে আছে? বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল। সন্দেশ আনাইয়া স্বহস্তে তাহার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন।[১]

১। সত্যানন্দ-কথিত।

গৌরীশানন্দ বলেন : বীরেনের মাথা গরম হইতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ সকলকে বলিয়াছিলেন, বীরেন কাজের ছেলে, ওকে দিয়ে যেন রোদে রোদে কাজ করানো না হয়। তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন, আমি ও সনৎ মঠের নৌকায় বরাহনগরে বাজার করিতে যাইব। বাজার করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসা দরকার, নতুবা গঙ্গায় জোয়ার আসিয়া পড়িবে। আরও দুই-একজন লোক হইলে ভাল হয়। জ্ঞান মহারাজ কহিলেন, ঐ বীরেনটাকে নিয়ে যাও, শুধু বসে বসে খাচ্চে! বীরেন তখনই রাজী। আমরা ফিরিয়া আসিয়া ঘাটে নৌকা লাগাইলাম। বীরেন বলিল, তোরা সব নাস্তিক, প্রভুর নৌকো নীচে থাকবে কিরে, উপরে উঠবে। সে এমন জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল যে, ঘাটের চাতাল ছাড়াইয়া এক সিঁড়ি উপরে নৌকা উঠিয়া গেল, তবুও দাঁড় টানার বিরাম নাই। এমন সময় বাবুরাম মহারাজও আসিয়া পড়িলেন। বীরেনের কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, তোকে আর নৌকো উপরে উঠাতে হবে না। আমাদিগকে বলিলেন, ওকে দিয়ে কাজ করাতে মানা করেছিলুম, কেন নিয়ে গেলি? আমরা জ্ঞান মহারাজের আদেশের কথা বলিলাম। জ্ঞান মহারাজ তখন স্নান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া, হুঁকা হাতে নিয়া গঙ্গায় নামিতেছিলেন। হাতের ছাতা ও লাঠি এক করিয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহার পিঠে বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি দৌড়াইয়া পলাইয়া গেলেন। সনৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। আমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছি ও জিনিসগুলি নৌকা হইতে সরাইতেছি। আহারের সময় বলিলেন, জ্ঞানকে আজ খেতে দেবে না। আহারের পরে চায়ের টেবিলে বসিয়া আমাকে বলিলেন, যা তো জ্ঞান-ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয়। জ্ঞান মহারাজ আসিতেই প্রশ্ন করিলেন, জ্ঞান, নিজের অপরাধ বুঝতে পেরেচ? 'আজ্ঞে আমি খুবই অন্যায় করেচি।' আনত মস্তকে জ্ঞান মহারাজ এই উত্তর দিতেই কহিলেন, আমি এখন তোমার উপর সন্তুষ্ট, খাবার রাখা আছে, খাওগে।

খুদিরামের প্রতি বাবুরাম মহারাজের স্নেহের অন্ত ছিল না, আদর করিয়া তাহাকে খুদুমণি বলিয়া ডাকিতেন। গর্ভধারিণী মায়েরও অধিক যত্নে তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, অবিদ্যা মায়ার কবল হইতে ছিনাইয়া আনিয়া।

সঙ্গদোষে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে খুদিরাম গাঁজা আফিম ইত্যাদি মাদক দ্রব্যে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, আনুষঙ্গিক দোষগুলিও তাহাতে সংক্রমিত হয়। তাহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিয়া অভি-ভাবকেরা নিরাশ হইয়া যান। তাহার এক দাদা (রাম মহারাজ) ছিলেন মঠের সাধু; তাঁহার মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ একদিন তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হন এবং মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া খুদিরামকে একদিন মঠে প্রসাদ পাইতে আমন্ত্রণ করেন। সে মঠে আসিলে নিজের কাছে বসাইয়া পরম যত্নে তাহাকে ভোজন করান, আবার একদিন আসিয়া কয়েকদিন মঠে থাকিয়া যাইতেও বলেন। দ্বিতীয়বার মঠে আসিয়া সে দেখিল, বাবুরাম মহারাজ তাহার জন্য গাঁজা, আফিম ও দুধের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন! খুদিরাম এক অপার্থিব স্নেহের আস্বাদ পাইল, তথাপি স্বভাব দুরতিক্রম্য। সে মাঝে মাঝে পলাইয়া তাহার পূর্বের সঙ্গীদের কাছে চলিয়া যায়, আর বাবুরাম মহারাজ কলিকাতায় গিয়া অকুস্থলে তাহাকে ধরিয়া বুঝাইয়া মঠে লইয়া আসেন। অন্যান্য সাধুরা ইহাতে বিরক্তি বোধ ও বিরূপ সমালোচনা করিতে থাকিলেও চুপ করিয়া থাকেন। ভগবান লাভের সাধনা হইতেও দুরূহতর তাঁহার এই রূপান্তরীকরণের সাধনা পরিশেষে জয়যুক্ত হইল। সুপ্তা কুণ্ডলিনীর জাগরণের মত অহেতুক ভালবাসার কুসুমকোমল আঘাতে আঘাতে যুবকের সুপ্ত বিবেক জাগিয়া উঠিল। বিবেক আনিয়া দিল বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের সহজাত প্রেরণায় গৃহত্যাগ করিয়া খুদুমনি ঠাকুর-স্বামিজীর কাজে দেহ-মন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

১৯১৬, ১৪ই মার্চ আলমোড়া হইতে হরি মহারাজ লিখিয়াছেন বাবুরাম মহারাজকে: মহারাজের অকাতরে কৃপা বিতরণ শুনে বড়ই আনন্দ হচ্ছে।...

তুমিও কি কম ব্যাপার করেছ? সাক্ষী আমার কাছেই রয়েছে। খুদুকে সাধু করা এক দৈবশক্তির প্রকাশ। ঈশা এক জেলেকে বল্লেন, 'আয় আমার সঙ্গে', আর সে সুড়সুড় করে তাঁর অনুগমন করল—এ আমরা বাইবেলে পড়ি। আর একদিন সকালে বাবুরাম মহারাজ এক জনের বাড়ী গিয়ে বল্লেন, 'চল মঠে', আর সে সুড়সুড় করে মঠে এসে জীবন পরিবর্তন কল্লে—এ চাক্ষুষ দেখছি। জীবন কিরকম, তা আর বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন নাই।

শাসন ও প্রতিক্রিয়া

বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন: ধ্যানজপ করে ঠাকুরঘরের সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে ঠাকুরের এই মন্ত্রটি বারবার আবৃত্তি করি—শ, ষ, স; যে সয় সে রয়; যে না সয় সে নাশ হয়। আবৃত্তি করতে করতে ঐ ভাবের উপর চিত্তবৃত্তি স্থির হলে তবে মঠের কাজকর্ম দেখতে যাই।

মঠে নবাগত কোন ছেলে হয়তো তাঁহার আদেশ পালন করার পরিবর্তে তাঁহাকেই উপদেশ দিয়া বসিল! ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া সেই উপদেশের মধ্যে কিছুমাত্র সত্য আছে কিনা ভাবিয়া দেখিতেন। 'সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি!' ঠাকুরের এই উক্তিটিও তিনি আবৃত্তি করিতেন।

কাহাকেও লিখিয়াছেন: মনে করেছিলাম ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে একজামিনের হাত হতে নিষ্কৃতি পেলাম, কিন্তু এখন দেখছি, পদে পদে পরীক্ষা। শেখা শেষ হলেই বোধ হয় ছেড়ে দেবেন।

উচ্চস্তরের সাধক বা সিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত অপর কেহই সর্বক্ষণ ঈশ্বরীয় চিন্তা বা ধ্যানজপ লইয়া থাকিতে পারে না। ধ্যানজপের জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ লইয়া থাকিলে সেই সেই কাজে মনের

একাগ্রতা সুখসাধ্য হয়। অভ্যাসের দ্বারা যতই মন একাগ্র হইতে থাকে উহার শক্তিও সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায়। পরিণামে সেই শক্তিশালী মনকে কেবলমাত্র ঈশ্বরীয় বিষয়েও ব্যাপৃত রাখিতে পারা যায়। বাবুরাম মহারাজের শিক্ষাদানের পদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় তিনি প্রথমেই তাঁহার ছেলেদিগকে সমনস্ক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

সমনস্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা যাহাতে গীতোক্ত দৈবী সম্পদের অধিকারী হইতে পারে—তাঁহার নিজের ভাষায়, তাহাদের জীবন যাহাতে 'গীতার জীবন' হয়—সেই দিকে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। যাহাদের মধ্যে আসুরিক ভাব মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখিতেন তাহাদের প্রতি তাঁহার আচরণ একএক সময়ে কঠোর প্রতিভাত হইত, কিন্তু ঐরূপ আচরণের পিছনে তাহাদেব মঙ্গলকামনা ব্যতাত অপর কোন উদ্দেশ্যই তাঁহার থাকিত না। কোনরূপ দম্ভ-মান-মদান্বিত ভাবই এই নিরভিমান আচার্য বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। ঐরূপ ভাবের বশে যে-কেহ তাঁহাকে অসূয়া করিয়াছে তাহারই কল্যাণ ব্যাহত হইয়াছে।

বাবুরাম মহারাজ ছেলেদিগকে কুলির মত খাটান, কাহারও এইরূপ অভিযোগের উত্তরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, .কাজ করবে বইকি, কাজে শরীর মন দুই ভাল থাকে।

বাবুরাম মহারাজ অসময়ে ব্রহ্মচারীদের দিয়া রান্না করান, তাহারা একটু বিশ্রাম করিতে পায় না, ইত্যাদি কথা মহারাজের জনৈক শিস্য তাঁহার কানে তুলেন। হরি মহারাজ তাহা শুনিতে পাইয়াই বলিয়াছিলেন,—কার সম্বন্ধে কী করচ, একটু খেয়াল রেখো; নইলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠাকুর ওঁকে কত উচ্চ স্থান দিতেন তা তুমি জান? তোমার বুদ্ধি দিয়ে তুমি ওঁর কাজের সমালোচনা করবে?[১]

ময়মনসিংহে অবস্থানকালে (১৯১৬) বাবুরাম মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন মহারাজকে, আমি যে মঠে নূতন সাধু-ব্রহ্মচারীদের শাসন করি,

১। নির্লেপানন্দ-কথিত।

গালমন্দ করি, এতে তারা আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট। মহারাজ বলেন, তুমি যে তাদের গালমন্দ কর, এ তাদের মহাভাগ্য। স্বামিজী আমাদের যে গালমন্দ করতেন আমরা যদি এদের তার শতাংশের একাংশও করতাম তা হলে এরা কবে মঠ থেকে পালিয়ে যেত।[১]

প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গে মহারাজ বলিয়াছিলেন কমলেশ্বরানন্দকে: ওরে, ওঁরা যা বলেন, শ্রদ্ধা করে তার দুইএকটি যদি পালন করতে পারিস তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে দেখবি। ওঁরা কি সামান্য মানুষ রে, যেদিকে তাকান সেই দিকটা পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়!

সাধুদের কেহ বাহিরে যাইয়া গৃহস্থবাড়ীতে রাত্রিবাস করিলে, তাহা যে-কোন কারণেই হউক না কেন, বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। তাঁহার এক গুরুভাইকেও একবার এই কারণে তাঁহার নিকট বকুনি খাইতে হইয়াছিল।

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা কোন কারণে, সে কারণ যতই গুরুতর হউক না কেন, কাহারও নিকট হইতে টাকা পয়সা চাহিয়া নিলে রক্ষা ছিল না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছে দীক্ষা নিয়া এক ব্রহ্মচারী জপের মালার মূল্য দুই টাকা বাড়ী হইতে আনাইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া বাবুরাম মহারাজ তাহাকে অত্যন্ত কড়া কথা বলেন ও মঠের ভাঁড়ার হইতে মালার দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[২]

একজনকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন, কোনও জিনিস আনিবার জন্য। কৃষ্ণলাল মহারাজ বলিলেন, সে এখন পাওয়া যাবে না, বিকেলে কিনে দেব। অগত্যা সেখানেই স্নানাহার করিয়া জিনিস নিয়া সন্ধ্যার সময় সে মঠে ফিরিল। কথা ছিল তখনই ফিরিয়া আসিবার। 'কেন কথামত কাজ কর নি?' বলিয়া বাবুরাম মহারাজ মহা রোষ প্রকাশ করিলেন। মহারাজ

১। জিতেন্দ্র দত্ত-লিখিত।

২। গৌরীশানন্দ-কথিত।

কহিলেন, বাবুরামদা, আমাদের কলকাতায় যেতে ভয় করে, এরা কলকাতায় গেলে শীঘ্র ফিরতে চায় না।[১]

একজনকে কলিকাতায় যাইতে বলিয়াছেন, মঠের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া যাইতে হইবে। দুইতিন বার বলা সত্ত্বেও সে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ রুষ্ট হইলেন। আদিষ্ট ব্যক্তি কহিল, এই কাপড়টা শুকালেই যাব। 'সাধু হয়েচিস, গামছা পরে যেতে পারিস না?' এই প্রশ্নের জবাবে আর ইতস্ততঃ না করিয়াই, গামছা-পরিহিত অবস্থায় সে নৌকায় উঠিয়া বসিল, আর ঠাকুর-ভাঁড়ার হইতে কাপড় আনাইয়া বাবুরাম মহারাজও তাহার কাপড় পরিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নৌকা ততক্ষণে কিয়দ্দূরে চলিয়া গিয়াছিল।[২]

ঠাকুরের জন্মোৎসব। কী-একটা ভুল করিয়া গিরিজানন্দ মঠের দক্ষিণ-দিকের পুকুরঘাটে বসিয়া আছেন। বাবুরাম মহারাজ সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তিরস্কার করায় তিনিও উত্তেজিত হইয়া জবাব দিলেন, আমার কি সামনে পেছনে চারটে চোখ যে আমি সব সামলাব? বাবুরাম মহারাজ একেবারে নরম হইয়া গেলেন ও বলিলেন, বাবা, সাধু হতে হলে সব দিকে নজর দিতে হয়, তোদের কল্যাণের জন্যই বলি। গিরিজানন্দ তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। অপর একদিন বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উমানন্দকে লাঠি লইয়া তাড়া করিতে করিতে দক্ষিণের গেট দিয়া বাহির করিয়া দিলেন, আবার ঘণ্টাখানেক পরে নিজেই খোঁজ করিয়া তাঁহাকে হাতে ধরিয়া মঠে নিয়া আসিলেন।[৩]

একই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ব্যক্তিরা যখন পরস্পরের সন্নিকটে বাস করেন, স্বতই একটা প্রীতির সম্বন্ধ তাঁহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠে। আবার প্রাকৃতিক নিয়মের বশে একটা নির্দোষ প্রতিযোগিতার ভাবও তাঁহাদের মধ্যে থাকিতে দেখা যায়। তখনকার দিনে 'উদ্বোধনে'র ও মঠের সাধুদের মধ্যে

১। হরানন্দ-কথিত। ২। সত্যানন্দ-কথিত।

৩। ধীরেন্দ্র গুহঠাকুরতা-লিখিত।

এইরূপ একটি প্রতিযোগিতার ভাব ছিল। 'উদ্বোধনের ভাইরা, মঠের শালারা' এবং 'মঠের ভাইরা, উদ্বোধনের শালারা' কথা দুইটি উহারই সূচকরূপে চালু হইয়া গিয়াছিল। কাহার উর্বর মাথা হইতে কথা দুইটি প্রথম বাহির হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না ; ১৯২৫ সালেও ঐ কথাগুলি বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে। মঠ হইতে জন কয়েক সাধু হয়তো উদ্বোধনে গিয়াছেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিবার জন্য, 'এই যে মঠের ভাইরা এসেচেন!' বলিয়া তথাকার সাধুরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

মঠের সাধুরা বাবুরাম মহারাজের শাসনাধীনে পরিচালিত হইতেন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে। উদ্বোধনেব সম্পাদনা ও প্রকাশন বিভাগের সাধুরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতেন মঠের সাধুদের সহিত তুলনায়। এই স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে তাঁহারা মঠে যাইয়া থাকিতে চাহিতেন না, মঠকে তাঁহারা বলিতেন 'পিঁজরাপোল'। উচ্চশিক্ষিত লোকের বাসের অযোগ্য স্থান—এইরূপ একটা মনগড়া অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হইত।

একদিন দেখা গেল, শরৎ মহাবাজের কঠোর আদেশে উদ্বোধনের এক 'বিদ্বান' সাধু নিজের বিছানাপত্র বগলদাবা করিয়া দীনভাবে 'পিঁজরাপোলে' আসিয়া উপস্থিত (১৯১৪)। যেখানে মহারাজের মন্দির হইয়াছে সেখানে তখন গোলাকার এক মণ্ডপ বা ছত্রী ছিল, ৺শিবরাত্রির সময় সাধুরা তথায় ধুনি জ্বালাইয়া বসিতেন। উহারই বেষ্টনী একটু উঁচু করিয়া দিয়া বাবুরাম মহারাজ সেই সাধুকে সেইখানেই থাকিবার নির্দেশ দিলেন। বলিলেন : কেবল লেখাপড়া করলেই সাধু হওয়া যায় না, তপস্যা না করলে অভিমান অহঙ্কার দূর হয় না। তোমাকে রাতদিন এখানেই থেকে তপস্যা করতে হবে, খাবার এখানেই পৌঁছে দেওয়া হবে। রাত্রে বেশী খেতে পাবে না, বেশী খেলে তমোগুণ বাড়বে। তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া আদিষ্ট ব্যক্তি কেমন তপস্যা করিতেছেন দেখিয়া যাইতেন। মাসাধিক কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর সাধুটি হৃষীকেশে চলিয়া যান।

মঠের প্রশাসনঘটিত ব্যাপারে কোনরূপ জটিলতা দেখা দিলেই উহার মীমাংসার জন্য শরৎ মহারাজকে মঠে আসিতে হইত, কখন বা বাবুরাম মহারাজ নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। গৌরীশানন্দ বলেন ঃ

মঠের এক সাধুর বিরুদ্ধে গোপাল বাবুরাম মহারাজের কাছে নালিশ করে, কিন্তু তিনি শুনিয়াও উত্তর করেন না। গোপাল তখন কলিকাতায় গিয়া শরৎ মহারাজের কাছে নালিশ করিল ও তিনি মঠে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—যে-আমি ছেলেদের এত শাসন করি সেই আমিই চুপ করে আছি, কোন বিচার করচি না, কেন জান? এই বেটা গোপাল—এ কি সোজা পাত্র? বেটা আইন বাঁচিয়ে কথা বলে। আমাকে বলেচে, উনি আমাকে বিরক্ত করেন, আপনি বলে দেবেন যেন তা না করেন। তুমি তো একজন perfect gentleman (পূরাদস্তুর .ভদ্রলোক), তুমি বল দেখি ভাই, তুমি এর কী মানে করবে?[১]

নাগরী গাইএর যখন প্রথম বাচ্চা হয় তখন কেহই তাহাকে দোহাইতে পারে না। আশে পাশে যত গোয়ালা ছিল, সকলেই চেষ্টা করিয়া বিফল হইল, নাগরী কাহাকেও কাছে ঘেঁষিতে দিবে না। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, তাইতো, এত বড় গরুটা ঠাকুরের সেবায় লাগল না! আমি বলিলাম, আমি দুইতে পারব, আমাদের বাড়ীতেও এমনি বড গাই ছিল—দুয়েচি। পরদিন সকালে দুইটি ভাঁড় নিয়া নাগরীকে দোহাইতে গেলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া ও পা ছুঁড়িয়া সে কেবলই বাধা দিতে লাগিল। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমি এক ভাঁড় দুধ দোহাইয়া ফেলিলাম এবং যে উড়িয়া মালী বাছুরটাকে ধরিয়াছিল তাহাকে দুধে ভর্তি ভাঁড়টি দূরে সরাইয়া রাখিতে বলিলাম। সে তো কথা শুনিলই না, উল্টা আমাকে বলিল, তুমি দুয়েচ, তুমি সরাবে। আমার তখন দূরে যাওয়া চলে না। ভর্তি ভাঁডটি কাছেই রাখিয়া

১। খুব সম্ভবতঃ এই ঘটনারই পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞান মহারাজ বলিয়াছেন: কোন সময় বাবুরাম মহারাজ এক ব্রহ্মচারীকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দরদী মন তাঁর সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করতে দেয় নি।

দ্বিতীয় ভাঁড়টি হাতে নিয়াছি, নাগরী ঘুরপাক খাইতেছে ও পা ছুঁড়িতেছে, তাহার পায়ে লাগিয়া প্রথম ভাঁড়টি ভাঙ্গিয়া গেল ও সমস্ত দুধ নষ্ট হইল। খবর পাইয়া উমানন্দ ও ছক্কু ছুটিয়া গিয়া উড়িয়া চাকরটাকে একএক ঘুষি লাগাইয়া দিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বিচারপ্রার্থী হইল বাবুরাম মহারাজের কাছে। তিনি কহিলেন, আমি এর বিচার করব না, শরৎ মহারাজ করবেন। শরৎ মহারাজ মঠে আসিলে আসামী ও ফরিয়াদী পক্ষের সকলকেই ডাকাইয়া আনা হইল। আমাকে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, দেখ, শরৎ মহারাজ perfect gentleman—অতি ভদ্রলোক, তুমি তাঁর কাছে কিছু গোপন না করে সব কথা বলবে। শরৎ মহারাজ কহিলেন, দেখ বাবুরামদা, তুমি আমার সাক্ষী বিগড়ে দিয়ো না। তারপরে দুই পক্ষের এজাহার শুনিয়া রায় দিলেন, উড়ে চাকরটাই দোষী।

গৌরীশানন্দ আরও বলেন ঃ

বাবুরাম মহারাজ ছেলেদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন—অন্ততঃ ছেলেরা কেহ কেহ সেরূপ মনে করে। এই সংবাদ, যেমন করিয়া হউক, শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর কানে পৌঁছিয়াছে। মা বলিলেন, এরকম যদি হয়, বাবুরামকে বোলো আমি মঠে গিয়ে থাকব। একথা বাবুবাম মহারাজের কানে যখন গেল, তাঁহার কী যে অবস্থা হইল কী বলিব। তিনি যেখানে সেখানে দণ্ডবৎ পতিত হইতেছেন আর বলিতেছেন,—মা, মা, মা!

মঠে যাহারা মাছ খায় তাহাদিগকে বাবুবাম মহারাজ হেয় জ্ঞান করেন, তাহাদের ভাব নষ্ট করেন—এই কথাও, যেভাবেই হউক, মায়ের কানে গিয়াছে। মা বলিলেন, তা যদি হয় আমি মঠে যাব, ছেলেদের দেখব। বাবুরাম মহারাজ জানিতে পারিলেন। ভোরবেলা পায়খানা হইতে আসিবার সময় দেখি, তিনি আঁষবঁটি নিজের কপালে ঠেকাইতেছেন, আর স্বগতভাবে বলিতেছেন,—আমি বাবুরাম, আমি কেন কারু ভাব নষ্ট করব? এই সব আমি নই। দুপুরে আহারের পর গঙ্গায় আচমন করিয়া যখন আমরা ফিরিতেছি তিনি আমাদের সকলকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ তোদের কাছে

আমার একটা আবেদন আছে। ঠাকুর বলতেন, ছোট সাপও সাপ, বড় সাপও সাপ—বিষ একই। তাই তোদিকে বলচি তোরা আমায় ক্ষমা কর্। আমি এরকম কিছু বলি নি যাতে কারু ভাব নষ্ট হয়। আমরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি, কাহারও মুখে কথা সরিতেছে না। একমাত্র চারুদা (ভজনানন্দ) দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া বলিলেন, এতদিন তো আপনার স্নেহ আশীর্বাদ পেয়ে আসচি, আজ কেন আমাদের অভিসম্পাত করচেন? সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্রণাম করিয়া জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বলিলেন, না না, ওরকম কিছু নয়—যা যা, হরিবোল হরিবোল হরিবোল—ভুলে যা সব। পরে তিনি একটু আভাস দিয়াছিলেন 'কেষ্টলালের কর্ম!'—এই কথাটি স্বগতভাবে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিয়া। কৃষ্ণলাল মহারাজ আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন, যাহারা মাছ খাইত না তাহাদিগকে ভাল সাধু মনে করিতেন।

কৈবল্যানন্দ বলেন: একদিন আমি ও শচীন স্বামিজীর মন্দিরের সম্মুখে বেলতলায় বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। আরতির ঘণ্টা পড়িতেই ঠাকুরঘরে যাওয়ার উপক্রম করিতেছি এমন সময় বাবুরাম মহারাজ উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—যেয়ো না, তোমরা বস। দেখ বাবা, আমরা সব ঠাকুরের কাছে এসেচি, তোমরাও এসেচ—এই যে তোমাদের আমি বকি, খিঁচুই, এ হচ্চে আমার অহঙ্কার। আমার অহঙ্কার হয়ে গেছে! ঠাকুর আমাদের দেখচেন, তোমাদেরও দেখচেন, আমি কেন এরকম করি? এ নিশ্চয়ই আমার অহঙ্কার। —বলিয়াই তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, কিছুতেই থামেন না। আমি ও শচীন ক্রমাগত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলাম,—মহারাজ, আমরা বাড়ীঘর ছেড়ে এসেচি আপনাদের কাছে, আপনারা যদি আমাদের দোষ না শুধরে দেন, আমাদের আর কে দেখবে? তাহাতে শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আরও জোরে বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুর আছেন, তিনি দেখবেন, আমি বলবার কে? আমার অহঙ্কার হয়েচে, কর্তাত্তি ভাব এসে গেছে—এ আমার অহঙ্কার। আমরা যত বোঝাই ততই তিনি কাঁদিতে থাকেন। অবশেষে হাত জোড় করিয়া

বলিলেন, না না, এ আমার অহঙ্কার—এ আমার অহঙ্কার! অনেকক্ষণ এইভাবে চলিয়া, ঠাকুরের আরতি যখন শেষ হইয়া আসিল, বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। আমরা একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলাম। আর কখনও তাঁহাকে এইরূপ উতলা হইতে দেখি নাই।

একদিন বিস্তীর্ণ মাঠের একপ্রান্ত হইতে মঠবাড়ীর দিকে আসিতে আসিতে বাবুরাম মহারাজ বলিতেছিলেন, 'বাবুরাম, হুঁশিয়ার হো যাও, বাবুরাম, হুঁশিয়ার হো যাও।'[১] কেন তাঁহার স্বগত এই সাবধানবাণী? নিজের মধ্যে অহংভাবের স্ফুট উঠিতেছে দেখিতে পাইয়া? অথবা, যাহারা একথা শুনিবে তাহারাই হুঁশিয়ার থাকিতে প্রেরণা পাইবে বলিয়া?

জগদানন্দ মহারাজকে বলিতে শুনিয়াছি: বাবুরাম মহারাজ সর্বদা ছেলেদিগকে বকিতেন। তাঁহার নিজের কোন কাজে—যেমন খাইবার সময় আসন পাতা, জল দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে—দোষ হইলে কাহাকেও বকেন কিনা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় এক বৎসর লক্ষ্য করিয়াও তাঁহার নিজের সেবার ত্রুটির জন্য কাহাকেও বকিতে দেখিলাম না। কিন্তু অন্যের মুখে শুনিয়াছি তিনি ঐজন্যও বকিতেন।

ব্রহ্মচারী জ্ঞান হিমালয়ে যাইতেছেন, বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কা উদ্দেশ্যে? তিনি উত্তর দিলেন, চাপবাস আনতে। হিমালয় হইতে তিনি লিখিলেন: এখানে সব ভাল যা দেখচি ও শুনচি, কিন্তু এখানে আপনার গালিগালাজ নেই। সেই চিঠি বাবুরাম মহারাজ একে ওকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিন কয়েক পরেই সাধুটি মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন সেই প্রেমপূর্ণ গালিগালাজের লোভে। 'চাপরাস এনেচ?' জিজ্ঞাসিত হইয়া, 'ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়' বলিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন বাবুরাম মহারাজকে। বাবুরাম মহারাজের অন্তরে বাহিরে সেদিন যে রূপচ্ছটা প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

১। জগদানন্দ-কথিত।

যুবকগণকে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করা

শুনা যায়, বাবুরাম মহারাজ আগে ঠাকুরের কথা এত বলিতেন না। একটা অসুখের পর ঠাকুরের আদেশ পান: 'এখানে যারা আসবে তাদের একটু প্রসাদ দিবি, আর এখানকার কথা কিছু কিছু শোনাবি।' যুবকগণকে তিনি ঠাকুরের কথা শুনাইতেন, তাহারা প্রশ্ন না করিলেও।

স্বামী শিবানন্দ লিখিয়াছেন: লোককে আপনার করিয়া লওয়া তাঁহার [বাবুরাম মহারাজের] যেন স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। ঐজন্য যুবক সম্প্রদায় তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিত।...তিনি তাহাদিগকে পরম আদরের সহিত শিক্ষা দিতেন এবং তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। ছেলেরা ঐজন্য তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিত।

বিশ্বনাথানন্দ বলেন: বাবুরাম মহারাজ ঢাকা জেলার কোন স্থানে আসিয়াছেন। তখন ঢাকায় কলেজে পড়ি, হোষ্টেলে থাকি। হোষ্টেল-কর্তা সাহেব, বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব বলিলে ছুটি দিবে না। তাহাকে বলিলাম, আমার একজন আত্মীয় কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, অনেকদিন দেখা নাই, দশ দিনের ছুটি দিন। ছুটি পাইয়া গেলাম। বাবুরাম মহারাজ সেকথা শুনিয়া মহাখুশী হইয়া বলিলেন, আরে, আত্মীয় কী রে, পরম-আত্মীয়, পরমাত্মীয়! বলিয়াই আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আরও বলিলেন, বেশ করেচিস। সে কী দিব্য তৃপ্তি, অপার্থিব আনন্দ, বলিয়া বুঝাইবার নয়।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন:

কলেজে পড়বার সময় সহপাঠি যোগেশবাবুর সঙ্গে ফরাসগঞ্জে শ্রীমোহিনীমোহন দাসের বাড়ী রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে প্রতি শনিবার যেতাম। আলোচনা, গান প্রভৃতি শুনতাম। স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গান—'কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার...' আর 'নিবিড় আঁধারে চমকে অরূপরাশি...' আমার বড়ই ভাল লাগত। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব পড়ে জীবনের উপর খুব। 'চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না' তাঁর এই

কথা বড় ভাল লাগে। তাঁর তেজোদীপ্ত ছবি তখন অনেকের ঘরে।...ক্রমে স্বামিজীর লেখা ও বক্তৃতাবলী সব পড়ি, আর পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। এই সব পড়ে সন্ন্যাসজীবনের প্রতি একটা আকর্ষণ হয়।...

ব্যক্তিগত জীবনে খুব কৃচ্ছ্রসাধন, প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনা ইত্যাদি করতে আরম্ভ করি। এই সময় মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ ঢাকায় আসেন। প্রায়ই যেতাম তাঁদের কাছে। স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমিও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর প্রতি যেন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মেছিল। সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তা হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা যাবে না। কিন্তু একথা মনে করতাম নিজেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সত্যিকারের সৈনিক হিসাবে প্রস্তুত করতে হলে ধর্মজীবনে উন্নতি দরকার। এ ধারণাও ছিল যে, সদ্‌গুরু লাভ হলে ধর্মজীবনে উন্নতির সুবিধা হয়। তাই একদিন স্বামী প্রেমানন্দের কাছে আমাকে দীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করি। তিনি বললেন, আমি কাউকে দীক্ষা দেই না, তুমি রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কাছে দীক্ষা নাও। তা আমার মনঃপূত হয় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাখাল মহারাজ বাবুরাম মহারাজের চেয়ে ধর্মজগতে কম উন্নত বা আমাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য কম উপযুক্ত। কেন যে মানুষ একজনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয় তা এখনও দুর্জ্ঞেয়। কেউ বলতে পারেন তা ভাবাবেগ মাত্র। কিন্তু তাও যে বাস্তব সত্য। হল না দীক্ষা নেওয়া। এই ঘটনার পরও প্রেমানন্দ স্বামীর স্নেহ কম পাই নি, আমার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমে নি। তাঁর স্নেহ আমাকে অনেক শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছে।[১]

১। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ-লিখিত 'জীবনস্মৃতি' হইতে উদ্ধৃত। গ্রন্থকারের পত্রের উত্তরে প্রফুল্লবাবু লিখিয়াছেন (২৮-৫-৬৫): আপনাকে একখানা 'সবিতা' মাসিক পত্রিকার ২য় সংখ্যা পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছি। সেই সংখ্যায় আমার 'জীবনস্মৃতি'তে স্বামী প্রেমানন্দের কথা খানিকটা আছে। আপনার যদি কোন কাজে লাগে সুখী হব।

গুরুদাস গুপ্ত লিখিয়াছেন ঃ

আমরা দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিয়া নৌকায় করিয়া বেলুড় মঠে আসিলাম শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীবাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য। সন্ধ্যা আগত-প্রায়। বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া রওনা হওয়ার উপক্রম করিতেই কহিলেন,—এখন কোথায় যাবে? আর হেঁটে যাবে শাল্‌কে পর্যন্ত? না, তা হবে না। রাত্রে মঠেই থাক। আমাদের ওজর আপত্তিতে কোনই ফল হইল না। মঠে তখন মাত্র দশ বার জন সাধু থাকেন, আমরাও সংখ্যায় দশ বার জন, অসুবিধা হইবারই কথা। আরতির পর আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের দলে এমন কতকগুলি লোক ছিলেন যাঁহারা পরবর্তী কালে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, রাজনৈতিক জগতে সুবিখ্যাত হইয়াছেন। আমি বলিলাম, মহারাজ, স্বামিজীর সম্বন্ধে কিছু বলুন। খানিক স্তব্ধ থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, স্বামীজীর কথা আমি কী বলব, কী বলতে পারি? তারপরে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ সাহেব-মেমদের সঙ্গে নিয়ে স্বামিজী দেশে ফিরচেন। এডেন বন্দরে জাহাজ থামলে শহর দেখতে বেবিয়েচেন। এটা ওটা দেখে, হঠাৎ সঙ্গীদের এক স্থানে ফেলে রেখে, তিনি এক মাদ্রাজী দোকানদারের দোকানে গিয়ে ঢুকলেন আর ধূলিমলিন চাটাইএব উপব বসে মহা আনন্দে হুঁকা টানতে টানতে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে তবে ফিরে আসেন। সাহেব-মেমরা একস্থানে দাঁড়িয়েই ছিলেন, তাঁদের চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব। এমন unceremoniously (লৌকিকতাব তোয়াক্কা না করিয়া) তাঁদের ছেড়ে গেছেন যে, বিস্মিত হবারই কথা। বল্লেন, দেখ, আমার দেশের লোক পেলে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না, শিষ্টাচার জ্ঞানও থাকে না—এটা বুঝে, ইচ্ছা হলে তোমরা দেশে ফিরে যেতে পার।

আমার মনে হইল, যে কয়জন দেশকর্মী আমাদের দলে ছিলেন—প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ ব্যানার্জি, হরিপদ চ্যাটার্জি প্রভৃতি—তাঁহাদিগকে বাবুরাম মহারাজ এই ঘটনার দ্বারা দেশপ্রীতি কাহাকে বলে, বুঝাইলেন।

আহারের পর বিভিন্ন ঘরে সকলের শোয়ার ব্যবস্থা হইল। আমাকে এক খাটিয়ায় শুইতে দিয়াছিলেন তাঁহার নিজের ঘরে। তাঁহার কাছে শুইয়া, তাঁহারই কথা চিন্তা করিতে করিতে নিশাবসান হইল।

সত্যেন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন ঃ

মঠে যাতায়াত করি। মাঝে মাঝে কয়েকদিন থেকেও যাই।...এই সময় যেসব যুবক ও ছাত্র মঠে যেতেন তাদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হল।... পূর্ব থেকে কথাবার্তা বলে আমরা গঙ্গার ঘাটে জমায়েৎ হতাম, তারপর নৌকা ভাড়া করে যাত্রা করতাম। সেই সব পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে অনেকে দেশসেবা ও রাজনীতিতে বরণীয় হয়েছেন। এই সময় ছাত্র সুভাষচন্দ্রও মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গী হত।

এমনিভাবে এক রবিবার আমরা মঠে চলেছি। নানা আলোচনার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা আমরা মঠে যাই কেন? অমনি উত্তর,—বাবুরাম মহারাজকে দেখতে, তাঁর কথা শুনে শান্তি পেতে। যাদের মন বৈরাগ্যপ্রবণ, যারা ভক্ত, যারা বেদান্তী, যারা রাজনৈতিক বিপ্লবী, যাদের সমাজসেবা শিক্ষাপ্রচারের আগ্রহ আছে, এমন নানা ভাবের যুবক চলেচে, প্রেমানন্দজীর স্নেহে সকলেই কৃতার্থ। প্রতি শনিবার ও রবিবার প্রায় একশ যুবক মঠে যেত। এ ছাড়া গৃহী ভক্ত নরনারীদেরও সমাগম কম ছিল না। বাবুরাম মহারাজকে ঘিরে একএক অপরাহ্নে আমরা আনন্দের হাট জমিয়ে তুলতাম।

অতুলচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন ঃ

১৯১৩, নভেম্বর মাসে কলিকাতায় আসি ও পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের দর্শন লাভ করি। একদিন বিকালে দুই বন্ধুকে নিয়া—একজন ৺দেবেন্দ্র তলাপাত্র, অন্যজন যোগেশ দত্ত (বেলুড় মঠের স্বামী অশোকানন্দ) —মঠে যাই। অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে গ্রহণ করেন এবং তিনরাত্রি মঠে থাকার অনুমতি দেন। ১৯১৫, বড়দিনের ছুটিতে আবার কলিকাতায় আসি ও বাবুরাম মহারাজের নির্দেশে জয়রাম-

বাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে পূজ্যপাদ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ ঢাকা যান। আমি তখন ঢাকা কলেজে পড়িতাম ও প্রায় দুই সপ্তাহকাল তাঁহাদের পুণ্যসঙ্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই বৎসরই কলিকাতায় আসিয়া ৺পূজার কয়েকদিন মঠে ছিলাম। ১৯১৭, মে-জুন মাসে বাবুরাম মহারাজ যখন ঢাকা যান, আমি তাঁহার সঙ্গে বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাসাড়া গ্রামে বেড়াইয়া আসি। ইহাই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

বাবুরাম মহারাজ বাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সকলেই তাঁহার সহৃদয়তা, বিনয় ও মাধুর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইত।[১] লোক-শিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষা দেওয়া যেন তাঁহার নিজের একটা দায়। নিত্যানন্দ-প্রভুর যেরূপ "আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি" ভাব ছিল, বাবুরাম মহারাজের ভিতরেও সেই ভাবটি অনুভব করা যাইত। তাঁহার কথা শুনিলে এবং সেই অনুসারে সামান্য কিছু কার্য করিলেও তিনি যেন নিজেকেই আপ্যায়িত মনে করিতেন।

তাঁহার কার্যপ্রণালী দেখিলে খুব পাকা গৃহস্থেরাও বহু জিনিস শিখিতে পারিতেন, তবে তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল যাহা সাধারণ লোকের থাকিতে পারে না। সমস্ত কাজের ভিতরে তিনি যেন সর্বদা তাঁহার গুরু পরমহংস-দেবের সান্নিধ্য অনুভব করিতেন এবং মনে হইত প্রয়োজন হইলে ঠাকুরের আদেশ ও নির্দেশ তিনি পাইতেন।

ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী কেহই সমস্ত সময় ধ্যানজপাদিতে কাটাইতে পারে না। সাধনভজনের অতিরিক্ত সময় আচার্যের নির্দেশ মত সাধারণ কাজকর্ম করা, এবং চিন্তার ধারা যাহাতে উচ্চগ্রামে থাকে, কোন অকল্যাণকর ভাব

১। সৎপ্রকাশানন্দ লিখিয়াছেন: **Few great men were as accessible as Swami Premananda···He received the newcomers as cordially as the old friends. [Vedanta and the West]**

মনে না আসে, তাহার জন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সাধু-ব্রহ্মচারীরা যাহাতে সর্বদা সমনস্ক থাকেন তাহার দিকে বাবুরাম মহারাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। কাজের সময় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন, তুই কী ভাবচিস, বল্ তো?

সাধারণ মানুষের মন এক বিষয়ে কখনও স্থির থাকে না। আমাদের নিত্যকার উপাসনার ভিতর একটি প্রার্থনা আছে : 'তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু'। এই অনুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বাবুরাম মহারাজ সর্বদা চেষ্টা করিতেন। ধর্মজীবন গঠনে নিঃস্বার্থ জনহিতকর কর্ম অত্যন্ত সহায়ক হয়, বেলুড় মঠের এই মূল নীতিটি পালন করিতে প্রেরণা দিতেন।

সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি Positive (নঞর্থক নয় এমন) পন্থা অবলম্বন করিতে বলিতেন। পূর্ব দুষ্কৃতি স্মরণ এবং তাহা ক্ষালনের জন্য ভগবৎসমীপে প্রার্থনা, এইরূপ ভাবের উপাসনা তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেন না। ভগবান সম্পূর্ণ আপনার জন—পিতা মাতা ভ্রাতা, তাঁহার কাছে জোর করিতে পারা যায়। মহামায়ার জ্ঞানভাণ্ডারের সমস্ত ধনের উপর আমাদের অধিকার আছে, আমরা যেন তাহা লাভ করিতে সচেষ্ট হই, ইহাই তিনি চাহিতেন।

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব।
ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি।[১]

এই মন্ত্রটি শুধু আত্মজ্ঞানী ঋষির জন্য নয়, সকল সাধকের এইরূপ বীরত্বব্যঞ্জক মনোবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, তিনি বলিতেন। 'প্রসাদ ব্রহ্মময়ীর বেটা' এই কথাটি বারবার উল্লেখ করিতেন।

বাহির হইতে যাঁহারা মঠে আসিতেন, তাঁহাদের সহিত বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা করিতেন। প্রত্যেককেই প্রত্যহ কিছু সময় ভগবদুপাসনায় অতিবাহিত করিতে বলিতেন। ধর্মময় জীবন গঠন

১। 'আমি সংসারবৃক্ষের প্রেরয়িতা। গিরিপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত আমার কীর্তি। পরব্রহ্মের সন্তান আমি। সূর্যে যে উত্তম অমৃত আছে সেই অমৃত আমার মধ্যেও—আমি অমৃতস্বরূপ।' [তৈত্তিরীয়োপনিষৎ]

মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ, উহাতেই মানুষের সুখশান্তি, ধর্মবিহীন জীবন অত্যন্ত ক্লেশকর ইত্যাদি কথা তাঁহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি। সচ্চরিত্র তরুণ যুবকদিগকে ধর্মলাভের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে তিনি প্রেরণা দিতেন।

হাসাড়া গ্রামে অবস্থানকালে বাবুরাম মহারাজ একদিন সন্ধ্যায় বর্তমান যুগের যুবকদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি অতি প্রাণস্পর্শী ভাষণ দেন। পূর্ববঙ্গের যুবকদের ভিতর সেই সময় সন্ত্রাসবাদের অত্যন্ত প্রভাব, এবং হাসাড়া প্রভৃতি বিক্রমপুরের কয়েকটি গ্রাম বিপ্লবীদের কেন্দ্র ছিল। তাহাদের কার্যপ্রণালী প্রেমিক সন্ন্যাসীর কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত দেয়। দেশসেবার নামে গোপন ষড়যন্ত্র, চুরি ডাকাতি, পরস্বাপহরণের দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা, গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা সাধারণ লোকের ভীতি উৎপাদন এবং প্রয়োজনবোধে নরহত্যা—এই সকল কাজ তিনি অত্যন্ত গর্হিত মনে করিতেন। তিনি বলেন: ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তরুণ সম্প্রদায় কিভাবে জীবন গঠন করিবে, এবং দেশসেবার জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করিবে তাহা স্বামী বিবেকানন্দ খুব স্পষ্ট এবং বিস্তৃত ভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করিয়া তরুণ সম্প্রদায় দেশসেবার ব্রত উদ্‌যাপন করুক। প্রেম, সত্যানুরাগ এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিবে। এই আদর্শের অনুসরণই ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সম্মত পদ্ধতি। ইহার ব্যতিক্রম হইলে দেশের বা জাতির কল্যাণ কখনও হইবে না।

শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ যুবক, এই আবেগপূর্ণ ভাষণ তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাঁহাদের কেহ সর্বত্যাগী হইয়া, কেহ বা বাহিরে ত্যাগীর বেশ না ধরিয়াও অন্তরে ত্যাগী থাকিয়া, স্বামিজীর নির্দেশিত পথে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ উল্লেখযোগ্য।

নিখিলানন্দ বলেন: ঢাকায় দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়া বাবুরাম মহারাজের কাছে গেলাম, সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানিবার জন্য। তিনি

আমাদিগকে মহারাজের কাছে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, মহারাজ এরা বড ভাল ছেলে, কিন্তু বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েচে, এদের কিছু বলুন। মহারাজ শান্তকণ্ঠে মিষ্টকথায় বিপ্লব প্রচারে যে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না তাহা বুঝাইলেন। আমি বলিলাম, স্বামিজী তো বলেচেন, রক্ত চাই। 'তার অর্থ ত্যাগ তপস্যা', মহারাজ উত্তর দিলেন। উত্তেজনার মুখে বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা স্বামিজীকে বুঝেনই নাই! বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, বা—রে, আমরা স্বামিজীর সঙ্গে ঘর করলুম, কত কথা শুনলুম, বল্লুম, আর স্বামিজীর বই দুপাতা পড়ে এ বলে কিনা, আমরা স্বামিজীকে বুঝিই নি! তোর দেখচি একটা ঘোড়ার যা বুদ্ধি আছে তাও নেই। আচ্ছা দেখি তুই ঘোড়া হতে পারিস কিনা। এই বলিয়া আমাকে হাতে-পায়ে হাঁটাইলেন নিজে পিঠে সোয়ার হইয়া বসিয়া। তারপরে হাঁপাইয়া বলিলেন, যা সব ঠিক হয়ে যাবে। মহারাজ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া যাইতেছিলেন, শান্তকণ্ঠে আবার কহিলেন, দেশের কাজ করবার আগে নিজের চরিত্র গঠন কর। বিপ্লবী দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এইখানেই শেষ হইয়া গেল।[১]

চারুচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :

১৯১২ হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমি মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে যাইতাম, ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের ভালবাসার আকর্ষণে পড়িয়া। ছেলেমানুষ আমরা তখন, আমাদের কাছে তাঁহারা উচ্চ ধর্মতত্ত্ব বলিতেন না। আমরা কাজকর্ম করিতাম এবং স্বামিজীর শিক্ষানুযায়ী জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতাম। স্বামী প্রেমানন্দ আমাদিগকে গ্রামে যাইয়া কাজ করিতে উৎসাহিত করিতেন। আমরা একটি পাঠশালা, একটি ডাক্তারখানা ও একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করি, এবং খরচ চালাইবার জন্য কয়েকজন মিলিতভাবে কিছু জমি কিনিয়া চাষবাস সুরু করিয়া দেই। ঐ একই উদ্দেশ্যে আমরা কলিকাতায় একটি মুদির দোকানও খুলিয়া বসি। এই সব কাজ তখনকার দিনে বিপজ্জনক বিবেচিত হইত। ইংরাজ সরকার জনসাধারণের মধ্যে

১। কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ৪।১২।৫৪ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ হইতে।

শিক্ষার বিস্তার পছন্দ করিতেন না এবং শরীর চর্চার কেন্দ্রগুলি নিষ্ঠুরভাবে নষ্ট করিয়া দিতেন। ঘরবাড়ী তন্নতন্ন করিয়া পুলিশ বইপত্র লইয়া চলিয়া গেল ও আমার উপরে নজর রাখিল। বাজেয়াপ্ত বইগুলির মধ্যে গীতা এবং স্বামিজীর পত্রাবলীও ছিল। সকল কথা শুনিয়া প্রেমানন্দ কহিলেন,—যতক্ষণ তোমাদের কাছে বোমা আর পিস্তল না থাকবে ততক্ষণ কিসের ভাবনা? এগিয়ে যাও, দেশের জন্য জীবন দান কর—তোমরা স্বামিজীর কাজ করছ।

একদিন দুপুরবেলা আমরা যখন মঠে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছি সেই সময় একটি লোক উঠানের গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রসাদ পাইতে আমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেমানন্দ আমাকে পাঠাইলেন। লোকটি জানাইলেন যে, তিনি সাদা পোষাকে কর্তব্যরত পুলিশের লোক, এভাবে খাইতে পারেন না। সেকথা শুনিয়া প্রেমানন্দ আদেশ করিলেন—যাও, তাঁকে ধরে নিয়ে এস। তারপরে ভদ্রলোক আসিতেই কহিলেন,—প্রসাদ একটু খান, তাতে আপনার দেহমন শুদ্ধ হবে। আমাদের সঙ্গে খান, আমাদের কথাবার্তা শুনুন, তা হলে আরো ভাল কাজ করতে পারবেন। ভদ্রলোককে তিনি যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন, বিশিষ্ট অতিথির মর্যাদা দিয়া। পরে শুনিয়াছি এই পুলিশ অফিসার তাঁহার অত্যন্ত গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দকে আমরা প্রেমের মূর্তবিগ্রহ মনে করিতাম। তথাপি একদিন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, কতটুকু ভালবাসা তোমাদের আমি দিতে পারি? ঠাকুর আমাদের যা ভালবাসতেন তার শতভাগের একভাগও নয়![১]

বিপ্লবী দলের অন্যতম নায়ক সতীশ (সত্যানন্দ) কাশীতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যোগদান করেন, শরৎ মহারাজের আদেশে। তাঁহার পিছনে গোয়েন্দা পুলিশ লাগিয়াই থাকিত। প্রায় চারি বৎসর কাশীতে থাকিবার পরে উত্তর প্রদেশের পুলিশ তাঁহাকে আর সেখানে থাকিতে দিল না, বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দিল (নভেম্বর, ১৯১৫)। বেঙ্গল পুলিশের একজন

১। Vedanta and the West পত্রিকা হইতে।

ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বেলুড় মঠে আসেন ও বাবুরাম মহারাজকে প্রশ্ন করেন,—এঁকে জানেন? এ কিরকম লোক? বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন, নিজের বুকে হাত রাখিয়া,—আমাকে দেখচেন? কিরকম মনে হয়? পুলিশ অফিসার সঙ্কুচিত হইয়া, 'সে কী? সে কী?' বলিয়া উঠিতেই কহিলেন, —তবে লিখে নিন, এ ঠিক আমারই মত![১]

বাবুরাম মহারাজ পত্রে কাহাকেও লিখিয়াছেন: যুবকগণ, সাবধান! এখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তোমাদের আদর্শ। উহাই অনুসরণ কর, তবেই নব বলে বলীয়ান হবে নিশ্চয় জেনো। সর্বশক্তির আধার আমাদের প্রভু।

নির্লেপানন্দ লিখিয়াছেন: বেলুড় মঠ। আন্দাজ ১৯১০-১১, বৈকাল। গঙ্গার সামনে বেঞ্চির উপর সমাসীন স্বামী প্রেমানন্দ। চারপাশে কলিকাতা হতে আগত কয়েকজন শিক্ষিত যুবক। স্বামী কথা কহিতে কহিতে ভাবস্থ—আত্মস্থ। বলছেন—'হাঁ, আমরা ঠাকুরের ছেলে—ঠাকুরের ছেলে—ঠাকুরের ছেলে। সত্যিই তাই—সত্যিই তাই—সত্যিই তাই। তোরাও ঠাকুরের ছেলে —তোরাও ঠাকুরের ছেলে—তোরাও ঠাকুরের ছেলে। তা না হোলে এখানে আসবি কেন?—এখানে আসবি কেন?—এখানে আসবি কেন?' উদার ব্যাপক দৃষ্টি!

১। গৌরীশানন্দ-কথিত।

মঠে মহোৎসবের অনুষ্ঠান

কোন সময়ে বাবুরাম মহারাজ পূর্ববঙ্গের ভক্তদের ভক্তির প্রশংসা করিতে থাকিলে শ্রীমহারাজ বলিয়াছিলেন, 'তোমার হচ্ছে সাপটা প্রেম, আমি বেছে বেছে প্রেম করি।' সাপটা প্রেম—সর্বজনীন প্রেম—সাধারণভাবে সকলকেই বিষয়ীভূত করিয়া আত্মপ্রকাশ করে যে ভালবাসা। বাবুরাম মহারাজের এই প্রেমের স্বরূপ তাঁহার পত্রাবলীর স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে সুন্দরভাবে।

'আমায় ঠাকুর ভালবাসায় কিনে নিয়েছেন, আমাদের সকলকেই তাই। অন্তর্বহিঃ ভালবাসা। গালমন্দও ঐ ভালবাসার জন্য। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। প্রভু আপনিই সব, গাল দিব কাকে? সবই যে তিনি—ধূলব একটু কম বেশী মাত্র।'

'আমরা যাদের ভালবাসি তাদের দোষগুণ দেখে নয়, সৎ অসৎ বলে নয়; আমাদের স্বভাবই ঐ একরকম, তাই তাদের আপনার মনে করি।'

'অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এও একপ্রকার খেলা চলুক। ভালবেসে এ জগৎকে আপনার করে ফেল। কেউ আর পর না থাকে, বৈরী না থাকে, অভিমান না থাকে। শত্রু বৈরী বিজাতীয় ভাবগুলি উঠিয়ে দাও। ভালবেসে সারা দুনিয়া একজাত হয়ে যাক।'

এই প্রেমের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই বাবুরাম মহারাজ যখন যেখানে উৎসবাদি করিতে গিয়াছেন, দল-মত-নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে আপনার জন মনে করিয়াছে, তাঁহার উপস্থিতিতেই যেন একটা উৎসবের পরিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে।

সর্বভাবঘনমূর্তি ঠাকুরের উদার সর্বগ্রাসী সমন্বয়ভাব যতই প্রচারিত হইবে ততই ভেদবিবাদের অবসান ঘটিয়া জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, তিনি বিশ্বাস করিতেন। জন্মোৎসবাদির অনুষ্ঠান সেই ভাবপ্রচারের অন্যতম এবং সর্বজনহৃদয়গ্রাহী পন্থা। মঠে তাই ঠাকুর ও স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি খুব ধুমধাম করিতেন। তিনচারি দিন আহার-

নিদ্রার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না, দেহের অবসাদ কাহাকে বলে জানিতেন না। সকল দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলে অবাক হইত।

একদা বলিয়াছিলেনঃ ঠাকুরকে মাঝে মাঝে বলি, গৌরাঙ্গ অবতারে নদে ভাসিয়ে দিলে, কিন্তু তোমার ভাবে তো দেশটা এখনও ভাসল না। আমি এই দেখে মরতে পারি, তার সাধ হয়!

ঠাকুরের জন্মমহোৎসব তাঁহার প্রকটকালের শেষের দিকে সুরু হইয়া বাবুরাম মহারাজের আমলে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ের শেষের দিকে সাধারণ মহোৎসবের দিন মঠে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইত। ষোল হইতে বিশ হাজার লোককে বসাইয়া প্রসাদ খাওয়ানো হইত। যাঁহারা বসিয়া প্রসাদ পাইতেন না এমন কত লোককে যে হাতে হাতে পাকা প্রসাদ দেওয়া হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতেও বিভিন্নভাবে উৎসবে সমাগত ভক্তগণকে আপ্যায়িত করিবার বন্দোবস্ত থাকিত। বসুমতী কার্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সরবৎ খাওয়াইতেন, ইঁটালি শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের সেবকেরা খাওয়াইতেন তামাক। বিভিন্ন সঙ্গীত-সমাজ সঙ্গীত পরিবেশণ করিতেন। উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাবুরাম মহারাজ কাহারও কাছে কিছু চাহিতেন না। আপনা হইতে সব জুটিয়া যাইত। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নিজেরাই উদ্যোগী হইতেন, প্রয়োজনীয় অর্থ ও রসদ জোগাইতেন।[১]

১। ১৩ই মার্চ ১৯১৬, সোমবা'র বাবুরাম মহারাজ লিখিয়াছেন হরি মহারাজকে, বেলুড় মঠের উৎসব সম্বন্ধে: 'কিরণবাবু পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতি আর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে আনাইয়া বক্তৃতা করাইয়াছিলেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। স্থান হয়েছিল গিরিশবাবু ও কালীবাবুর স্মৃতি মন্দিরের উত্তরে, সময় তিনটা হইতে ছয়টা। লোকে এই মহামেলার মধ্যেও আনন্দে স্থির হইয়া শুনিয়াছিল একদিকে কালীকীর্তন, মধ্যে ভবজা, অন্যদিকে বক্তৃতা।...কিছু কম ৫০ মণ চালডাল ছিল। পরিবেশন করেছিল কলেজের ছেলেরা, কি অদ্ভুত উৎসাহ তাদের মধ্যে...!'

ঠাকুরের মহোৎসবে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকেরা আসে। সমাজ যাহাদিগকে অবজ্ঞা উপেক্ষা করে তাহাদিগকে হীন দৃষ্টিতে দেখিয়া নূতন সাধুদের পাছে অকল্যাণ হয় সেইজন্য বাবুরাম মহারাজ বলিতেন ঃ ঠাকুরই নানা মূর্তি ধরে নিজের উৎসব নিজে দেখতে এসেচেন।[১]

মহোৎসবের দিন বিকালবেলা (১৯১৭) বাবুরাম মহারাজ দক্ষিণপূর্ব কোণের নীচের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সমস্ত দিন নানা বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর ভাবে লাল হইয়া গিয়াছে এবং এক দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছে। জানালা দিয়া বহুলোক একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতেছিল। এমন সময় তিনি এক ব্রহ্মচারীকে উপর হইতে 'হরিভাই'কে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন এবং হরি মহারাজ আসিতেই কহিলেন, আপনি কেবল উপরেই থাকতে চান, মাঝে মাঝে নীচে নেমে আমাদের দয়া করতে হয়। হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, আমরা কখনো উপরে, কখনো বা নীচে থাকি, কিন্তু তুমি তো নীচ-উপরের পার হয়ে গিয়েচ![২]

সত্যেন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির পূর্বদিন অপরাহ্ণে মঠে আসিয়া দেখি, চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) বসিয়া পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ ও প্রজ্ঞানন্দজীর সহিত আলাপ করিতেছেন। রাত্রে তিনি মঠে থাকিবেন। মঠের সংলগ্ন উত্তর দিকের বাড়ীতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রেম ও স্নেহের মূর্তবিগ্রহ বাবুরাম মহারাজ এই অতিথির যত্ন ও সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।...তিনি বলিলেন, অত বড বিলাসী সাহেব এই গরমে কেমন করিয়া ঘুমাইবে? চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে যতই নিষেধ করুন না কেন, বাবুরাম মহারাজের মায়ের মত স্বাভাবিক হৃদয়ের উৎকণ্ঠা যেন কিছুতেই দূর হয় না! তিনি রাত্রে বাতাস করিতে এবং চিত্তরঞ্জনের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জনৈক সেবককে পুনঃপুনঃ বলিয়া দিলেন।...উৎসবের দিন

১। জগদানন্দ-কথিত। ২। জিতেন্দ্র দত্ত-লিখিত।

সর্বসাধারণের মধ্যে বসিয়া চিত্তরঞ্জন প্রসাদ ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং ভাবানন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমার জাতির সহিত প্রাণের যোগসূত্র অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম।

বেলুড় মঠ সংস্থাপিত হওয়ার প্রায় তিন বৎসব পরে স্বামিজী মঠে ৺দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন (১৯০১)। বাবুরাম মহারাজেব মঠ পরিচালনার শেষের দিকে ইহা বার্ষিক মহোৎসবে পরিণত হয়. আর তিনিই ছিলেন এই মহোৎসবের প্রাণস্বরূপ।

পূজার প্রথম বৎসর যজমানরূপে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীব নামে সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, তদবধি সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুরের সন্তানেরা মাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের ভাবনায় তিনিই ছিলেন একাধারে যজমান ও যাজ্যা, অর্থাৎ আরাধ্যা দেবী। পূজার সময় কলিকাতায় থাকিলে মা মঠে আসিয়া পূজার কয়েকদিন উত্তরপাশের বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেন। তাঁহার আগমনে উৎসবের উল্লাস শতগুণ বৃদ্ধি পাইত।

"বোধনের দিন (১৯১২) মার গাডী আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বাবুবাম মহারাজ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং মঠের প্রবেশদ্বারে কদলীবৃক্ষ রোপিত ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় নাই দেখিয়া বলিলেন, এখনো কলাগাছ মঙ্গলঘটের দেখা নাই, মা আসবেন কি! দেবীর বোধন শেষ হইবামাত্র মার গাড়ী আসিয়া মঠে পৌঁছিল। গোলাপ-মা তাঁহাকে হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন, নামিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন : সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা-দুর্গাঠাকরুণ এলুম!...

"মহাসপ্তমীর দিন (১৯১৬) প্রত্যুষে চণ্ডীমণ্ডপে নব পত্রিকা প্রবেশের পর শ্রীশ্রীমা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া মঠে আসিলেন।...মঠের প্রবেশদ্বার হইতে চণ্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত সমস্ত পথ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রেমানন্দ-স্বামিজী মাকে সাদরে আহ্বান করিয়া মঠের ভিতর লইয়া আসিলেন।... 'মহামায়ী কী জয়' রবে গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। মা ঠাকুরঘরের

সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলে শুকুল মহারাজ তাঁহাকে পঞ্চপ্রদীপে আরতি ও বাবুরাম মহারাজ চামর-ব্যজন করিলেন।...

"...কৃষ্ণলাল মহারাজ আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, মা বলচেন, রাধুর অসুখের জন্য তাঁকে কলকাতা ফিরে যেতে হবে। আপনি গিয়ে একবার বলুন যাতে তিনি থাকেন। বাবুরাম মহারাজ হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মহামায়াকে কে বাবা নিষেধ করতে যাবে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কী করবে ? তাঁর যা ইচ্ছা তা তিনি করবেন। পরে দেখা গেল, রাধু (মায়ের পালিতা কন্যা) অনেকটা ভাল আছে, মারও যাওয়া হইল না।"[১]

৺পূজার তিনদিন মঠে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিত। সমবেতকণ্ঠে মহামায়ার জয় বিঘোষিত হইত। কলিকাতা ও দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে ভক্তেরা মঠে আসিতেন, কুটনো কোটা ও পরিবেষণাদি কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া জগন্মাতার প্রসন্নতা অর্জন করিতেন। বাবুরাম মহারাজ একাই একশ হইয়া সকল কাজ দেখিয়া বেড়াইতেন।

শ্রীশ ঘটক বলেন ঃ সেবার গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা। সন্ধিপূজার পর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ও প্রসাদ পাইয়া মঠের দ্বিতলের বারান্দায় গিয়া শুইয়া পড়ি। প্রত্যুষে উঠিয়া যেদিকে তাকাই সেই দিকেই কেবল বাবুরাম মহারাজকে দেখিতে পাই। নীচে নামিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া দেখি, বাবুরাম মহারাজ 'লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্' বলিতে বলিতে হাততালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সবাই শেষ রাত্রে শুয়েচে, ঠাকুর ভেল্‌কি না লাগালে তারা উঠবে কি ?

পূজার একদিন বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতি ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ 'মুগের ডাল' বলিয়া হাঁকিতেছেন, ডালটি নাকি অতি উপাদেয় হইয়াছে। সমাজপতির দিকে চাহিয়া বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—আপনার অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল—ভাব, ভাষা কোথায় পাব ? বসটস নেই। আপনার কলমের ডগায়

১। 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' হইতে।

রস টস্‌টস্‌ করে। সমাজপতি সহাস্যে উত্তর দিলেন,—আপনার কথায় আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করলুম আমার কলমের ডগায় রস আছে, কিন্তু রস আপনার কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে। সমাজপতির কথা শেষ না হইতেই বাবুরাম মহারাজ সরিয়া পড়িলেন।

বাঙ্গলা দেশে দুর্গাপূজার মত বৃহৎ ব্যাপারকে কলির রাজসূয় যজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। উহাতে বহু বিচিত্র উপকরণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই সমস্তই যেন বাবুরাম মহারাজের নখদর্পণে ছিল। জীবন-সায়াহ্নে (১৯১৭) বসু-ভবনে রোগশয্যায় থাকিয়াও তিনি মঠের পূজার জন্য মুখে মুখে সব ফর্দ বলিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাব সেবক সতীশকে দিয়া সকল জিনিস বাজার হইতে আনাইয়াও রাখিয়াছেন!

বাবুরাম মহারাজ একবার দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা হইতে দেলিয়া বলিয়াছিলেন, এ কুমারীকে কেন? তাঁকে কুমারী কল্পনা করে পূজা কর। জগদানন্দ মহারাজ কথাটি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, তিনি বলেন: এরূপ বলার তাৎপর্য আছে। দুর্বল মানুষ ঐসকল বিবিধ প্রশ্রয়ে পরে অনাচার আনিয়া ফেলে। ঠাকুর তো তান্ত্রিক সকল সাধনাই করিয়াছিলেন, তথাপি সকলকে সকল কিছু করিতে বলিতেন না। দুই শ্রেণীর সাধক আছে, একশ্রেণী ঐসকল তন্ত্রনির্দিষ্ট বস্তুর নিকটে থাকিয়া এবং অপর শ্রেণী উহাদিগকে দূরে রাখিয়া সিদ্ধ হইবে।

উৎসবাদিতে যোগদান ও ঠাকুরের বার্তা প্রচার

ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া শুনিয়া শ্রীবাবুরামের মনে একটা বাসনার ফুট উঠে যে, তিনিও বক্তা হইবেন, ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। আর বালকস্বভাববশতঃ একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া সমবয়সী ও ছোট ছেলেদের কাছে বক্তৃতার অভিনয় করিতেন। পরিণত জীবনে যে দৈবনির্দিষ্ট কাজটি তাঁহাকে করিতে হইবে, এই ঘটনা তাহারই পূর্বাভাস।

নিজ জীবনে বহু দুঃখভোগের স্মৃতি নিয়া, ঠাকুরের একান্ত ভক্ত গিরিশ একদিন সস্নেহে শ্রীবাবুরামকে প্রশ্ন করেন, বেবো, আবার আসতে ইচ্ছা হয়? বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বাবুরাম উত্তর দিলেন, ঠাকুর যদি নিয়ে আসেন তো আসব।[১] ইষ্টদেবে সমর্পিত, সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই ইচ্ছার অনুগত, পার্ষদগণের ঈদৃশ শুদ্ধ বাসনাই ভগবানের নিত্যলীলার পুষ্টি বিধান করিতেছে।

১৯০৮ সালে এবং ১৯১৩ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমন্ত্রিত হইয়া উৎসবাদিতে যোগদান করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায়, গমন করিয়াছেন। রাঁচির একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসের কর্মচারী বাঙ্গালী ভক্তেরা প্রতি বৎসর ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন করিতেন; একবার তাঁহারা বাবুরাম মহারাজকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। পূর্ববঙ্গের ভক্তেরা বাবুরাম মহারাজকে একান্তভাবে আপনার করিয়া পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদের ভক্তির প্রশংসা করিতেন। শুনা যায়, স্বামিজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'পূর্ববঙ্গ তোর জন্যে রইল।'

১। বিভূতি ঘোষ-কথিত।

বিভিন্ন স্থানের উৎসবের বা উহার আনুষঙ্গিক ঘটনার যেটুকু নির্ভরযোগ্য বিবরণ প্রবীণ প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সময়ের ক্রম অনুসারে তাহাই সঙ্কলন করিয়া দিলাম। কালের ব্যবধানে অনেক কিছুই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

স্বামিজীর অনুরাগী ভক্ত সুরেন্দ্র সেন ও তাঁহার বন্ধুরা উদ্যোগী হইয়া স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে বরিশালে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পরে (১৮৯৯)। তাঁহারাই উৎসবের আয়োজন করিয়া বাবুরাম মহারাজকে আমন্ত্রণ করিয়া বরিশালে লইয়া যান (মার্চ, ১৯০৮)। বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিলেন স্বামী নির্মলানন্দ ও অম্বিকানন্দ। আমেরিকা-প্রত্যাগত নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) ছিলেন ওজস্বী বক্তা, আর অম্বিকানন্দ সঙ্গীতকলাকুশল। উৎসবক্ষেত্রে এই ত্রয়ীর মিলনে, ভাবে ভাষণে ও গানে, এক অভিনব ধর্মবন্যা যেন আপ্লাবিত করিয়াছিল ক্ষুদ্র ববিশাল শহরটিকে, সাতদিন ধরিয়া। এই প্লাবন-জনিত স্রোতের টানে এক ভদ্রঘরের যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়া মঠে যোগদান করেন।

কলিকাতায় ফিরিবার জন্য স্বামিজীরা যখন ষ্টীমারে উঠিয়াছেন ও একে একে ভক্তরা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া যাইতেছেন, সুরেন্দ্র তখন নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, কিবে, তুই যে প্রণাম কবচিস না, সকলের শেষে করবি বুঝি? অভিমান-জড়িতকণ্ঠে সুরেন্দ্র উত্তর দিলেন,—না, তা নয়। ভাবচি আপনাদের প্রণাম করেই আর কী হবে? আমার দুঃখ দূর হল কই? ঠাকুরের কথা, তাঁর পার্ষদদের আশীর্বাদ, সব মিথ্যা। শুনিয়াই বাবুরাম মহারাজের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। খানিক আত্মস্থ থাকিয়া, হঠাৎ সুরেন্দ্রকে দুই বাহুর মধ্যে ধারণ করিয়া স্নেহকোমলস্বরে কহিলেন,—বাবা, কে বলেচে তোমাকে, ঠাকুরের কথা, তাঁর পার্ষদদের আশীর্বাদ—মিথ্যা? সেরা জিনিস যেটি সেটি তোমার জন্যে আছে, কিন্তু বাবা তোমার এদিকে (সংসারাশ্রমে) সুখ নাই।

১৯১৩ সালে বাবুরাম মহারাজ তিনটি বিভিন্ন স্থানের উৎসবে যোগদান করিতে যান। সেই স্থান তিনটি—রাণাঘাট, রাঁচির অন্তর্গত হিনু, আর ঢাকার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগাঁ। রাণাঘাটে এক মহতী জনসভার আয়োজন হইয়াছিল, সেই সভায় তিনি দেড় ঘণ্টা ধরিয়া 'যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

গুড্ফ্রাইডের ছুটিতে রাঁচির ভক্তেরা উৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিলেন ব্রহ্মচারী অশোক, ইটালি অর্চনালয়ের কৃষ্ণবাবু ও ঢাকার নীরদ মজুমদার। শেষোক্ত দুইজন সুগায়ক, নীরদবাবু স্বরচিত 'বন্দি কামারপুকুর' গানটি গাহিয়াছিলেন।

উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন :

হিনুতে উৎসব হইয়াছিল। বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরে যাইতেই জলের ট্যাঙ্কগুলি দেখা যায়। তারই দক্ষিণধারে দুই সারি ব্লকের মধ্যে যে মাঠ সেখানে সামিয়ানার তলে সভা হইয়াছিল। দেবেন্দ্র (দেবানন্দ) পশ্চিমের ব্লকের একটা ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরের সামনেই অনুষ্ঠান হয়। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ দলবল নিয়া উৎসবের আগের দিন আসেন ও উৎসবের পরের দিন বেলুড় ফিরিয়া যান।

উল্লেখযোগ্য কোন কথা বা ঘটনা মনে নাই। আমার নিজের সম্বন্ধে একটা ছোট ঘটনা জানাতে পারি, তাহা এই। উৎসবের পর তিনি যেখানে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল—সুরেন সরকার মহাশয়ের মেসে—সেখানে একখানা তক্তাপোষের উপর শুইয়াছিলেন, আর আমরা—সুরেন চক্রবর্তী, সুরেন সরকার, রাজেন মুখার্জী, শ্রীশ ঘটক, যতীন ঘোষ, উপেন রায় এবং অন্যান্য কয়েকজন——নীচে সতরঞ্চিতে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। কথাগুলি খুবই ভাল লাগিতেছিল, আমরা বাস্তবিক মহা আনন্দেই ছিলাম। দশটা বাজিয়া গেল, আমাকে পরিবার নিয়া ডুরেণ্ডা যাইতে হইবে, বিনয়ের সঙ্গে বলিলাম, মহারাজ, রাত অনেক হল, দূরে যেতে হবে, আমি এখন উঠি—উঠতে একটুও ইচ্ছা ছিল না মহারাজ। তিনি কাত হইয়া শুইয়াছিলেন আমার দিকে মুখ করিয়া।

দেখিলাম তাঁহার মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়া গেল, আর অস্বাভাবিককণ্ঠে সজোরে বলিয়া উঠিলেন, 'পা টিপ্।' কী বলিলেন আমি বুঝিতে পারি নাই। মনে হইল তিনি আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন। আমি তো অপ্রস্তুত, কী এমন অশোভন কাজ করিলাম! তিনি কী আদেশ করিলেন অপর অনেকেই বুঝিয়াছিলেন। সুরেন চক্রবর্তী আমাকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, যা যা, শীগ্‌গির পায়ে হাত বুলিয়ে দে। তখন আমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। এই দৃশ্যটি সকলের মনে চিরদিনের মত গাঁথিয়া রহিল। সামান্য একটা কথা—'উঠতে ইচ্ছা ছিল না, এত ভাল লাগচে!'—ব্যস্, ইহাতেই তাঁহার কৃপা উথলিয়া উঠিল!

বিদগাঁর কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজের বন্ধু ছিলেন, তিনজন একসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের ভক্তগণের উদ্যোগে ও কালীপ্রসাদের নেতৃত্বে 'নীলখোলার মাঠে' ঠাকুরের উৎসবের এক বিরাট আয়োজন হয়। সেই উৎসবে কালীপ্রসাদ শরৎ মহারাজকে লইয়া আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শরৎ মহারাজের শরীর সুস্থ না থাকায় তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভক্তগণের ঐকান্তিক আগ্রহে অবশেষে বাবুরাম মহারাজ বিদগাঁয় শুভাগমন করেন, ব্রহ্মচারী রামকে সঙ্গে নিয়া (১৭ই মে, ১৯১৩)।

লৌহজঙ্গ হইতে তাঁহারা নৌকায় করিয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হইতেছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা বিদগাঁ বাজারে পৌঁছিবার পূর্বেই বৃষ্টি থামিয়া যায়। কীর্তনাদি সহযোগে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট একটি ফাঁকা বাড়ীতে তাঁহাদিগকে লইয়া আসা হইল। ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্বুদ্ধানন্দ) সেবার ভার নিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, তোদের দেশ তো বেশ, কাশ্মীরের মত দেখায়!

কলমা গ্রামের জমিদার ভূপতি দাশগুপ্ত ও কলমা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত সেই সময়ে বিদগাঁয় আসিয়াছিলেন,

প্রধানতঃ বিনোদেশ্বরবাবুর বর্ণনা অনুসারে উৎসবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

রাত্রি তিনটার পর হইতেই নামসংকীর্তন করিতে করিতে আসিয়া বিভিন্ন গ্রামের কীর্তনদলসমূহ উৎসবক্ষেত্রে মিলিত হইতে লাগিল। উৎসবক্ষেত্রে যাইবার পূর্বে তাহারা বাবুরাম মহারাজের আবাসগৃহ পরিক্রমা করিয়া গেল। তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া দর্শন দিলেন।

সকাল বেলা ঠাকুরের চিত্রপট ও বাবুরাম মহারাজকে নিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। এক জায়গায় খালের উপর একটি বাঁশের সাঁকো ছিল, ঠাকুরের ছবি হাতে নিয়া একজন পার হইয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ হয়তো পার হইতে পারিবেন না, তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক—এইরূপ ভাবিয়া বিনোদেশ্বর-বাবু বলিলেন, একটু অপেক্ষা করুন, একটা নৌকা নিয়ে আসি। 'কী? ঠাকুর পেরিয়ে গেলেন, আর আমি পারব না?' বলিয়াই তর্‌তর্‌ করিয়া সাঁকো পার হইয়া গেলেন। তাঁহার শরীরে ওজন আছে মনে হইল না, অনেক সময়েই মনে হইত না।

শোভাযাত্রা উৎসবমণ্ডপে আসিয়া শেষ হইতে উপস্থিত সকলেই তাঁহার মুখে কিছু শুনিতে চাহিলেন। তিনি ঠাকুরের দুই একটি উপদেশ শুনাইলেন, ভগবানকে আপনার জন জানিয়া সকল অবস্থায় তাঁহার উপর নির্ভর করিতে বলিলেন। এই সময়ে দক্ষিণাকাশে কালো মেঘের সঞ্চার দেখিয়া ভক্তেরা ভয় পাইলেন, বাবুরাম মহারাজও গম্ভীর হইয়া গেলেন। হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া মেঘখানিকে আকাশময় ছড়াইয়া দিল, দুইচারি ফোঁটা জল না পড়িতেই বর্ষণ বন্ধ হইল। এরকম থাকলে কেমন হয়? বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। 'আচ্ছা, এরকমই থাকবে প্রভুর ইচ্ছায়। জয় প্রভু, জয় প্রভু!' বলিয়া তিনি বাসায় চলিয়া গেলেন।

স্নানান্তে গরদের নূতন বসন ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া যখন তিনি পূজা করিবার জন্য মণ্ডপে পুনরাগমন করিলেন, সকলে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল—তাঁহার গাত্রবর্ণ ও বস্ত্রবর্ণ কী অদ্ভুত সামঞ্জস্যেই না মিলিত

হইয়াছে! সেদিন তিনি কাছাকোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়াছিলেন। পূজার আসনে বসিবার পূর্বে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ঠাকুরকে, পূজার আগেই যেন নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিলেন নিজেকে। আসনে বসিয়া, আচমনাদি করিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। পূজা সম্পূর্ণ হইল।

উৎসবে দূরাগত ভক্তদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের জন্য ছিল না। দোকানীরা চিঁড়া মুড়ি খই দুধ দই কলা চিনি গুড় আনিয়াছে, যাহার যেমন ইচ্ছা ঐসকল জিনিস কিনিয়া, ঠাকুরকে মালসা-ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবে। এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—আমাদের মঠের ধারাটি তো এইরকম নয় গা! যার পয়সা আছে সে প্রসাদ পাবে, যার পয়সা নাই সে পাবে না? ঠাকুর, তুমি এ কী করলে!

তিনি প্রসাদ পাইতে বসিয়াও খাইতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একজন আসিয়া খবর দিল দুই ধনী ব্যবসায়ী—কৃষ্ণকুমার কাপুড়িয়া ও নিত্যানন্দ পাল—উৎসবক্ষেত্রে আনীত যাবতীয় আহার্য কিনিয়া নিয়াছেন, সকলকে খাওয়াইবেন। সকলকে পান-তামাক-সরবৎ খাওয়াইবার ব্যবস্থা ইহার আগেই দুইজন ধনী ব্যক্তি করিয়াছিলেন। জয়ধ্বনিতে উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও বিক্রমপুরের বহুগ্রাম হইতে অগণিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। অনেক উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আসিয়াছিলেন এবং বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ করিয়া তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। অপরাহ্ণে রামকৃষ্ণ সঙ্গীতসম্প্রদায়ের কীর্তন আরম্ভ হইল—'রাই উন্মাদিনী' পালা।

মুন্সীগঞ্জের উকীল রাইমোহন গোস্বামী ও তাঁহার দাদা হরিপ্রসন্ন গোস্বামী 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীতসম্প্রদায়' নামে কীর্তনের দল করিয়াছিলেন, নিজেদের ছেলেপুলে ও বন্ধুবান্ধব নিয়া। পালার প্রারম্ভে পরপৃষ্ঠার গানটি গাওয়া হইত।

জয় জয় রামকৃষ্ণ গুণধাম, কী মধুর নাম শ্রবণে।
নাহি ভেদজ্ঞান, করি নামসুধা দান জীবে তারিলে এ ভুবনে
(অকূল ভবসাগরে)॥
নাহি সুখের লেশ, নাহি বেশের বেশ, দীনহীন বেশ ধরিয়ে।
নাহি অন্য বেশ, সদাই ভাবাবেশ, মা মা বুলি সদা বদনে॥
হেন মনে হয়, ওহে দয়াময়, যুগে যুগে তুমি কাঁদায়েছ মায়,
তাই শুধিতে সে ঋণ জনম নিলে, মা মা বলে কেঁদে কাঁদালে॥

পরনে গরদের কাপড়, গায়ে নামাবলী, চারিটি সৌম্যদর্শন বালক আসরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গানটি গাহিয়া সকলকে মোহিত করিল। তাহারা প্রত্যেকে একগাছ করিয়া ফুলের মালা বাবুরাম মহারাজের গলায় পরাইয়া দিল ও তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন। তারপরে নিজের গলা হইতে মালাগুলি নিয়া স্বহস্তে তাহাদের গলায় পরাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার পরে কীর্তন শেষ হইল।[১]

বিনোদেশ্বরবাবু বলেন:

বিদগাঁর উৎসবের পরদিন মঠ হইতে মহারাজের এক টেলিগ্রাম আসিল, তাহাতে বাবুরাম মহারাজকে সত্বর মঠে ফিরিয়া যাইতে বলা হইয়াছে।[২] নানা স্থান হইতে ভক্তেরা আসিয়াছিলেন তাঁহাকে নিয়া যাইবেন বলিয়া, টেলিগ্রামের দোহাই পাড়িয়া তাঁহাদিগকে বিমুখ করা হইল। আহার ও বিশ্রামের পর তাঁহার কুশল জানিতে গেলে আমাকে কহিলেন, আমি কলমায় যাব—ভূপতিবাবুদের ওখানে যাব—শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। টেলিগ্রামের কথায় বলিলেন,—ও কিছু নয়, আমি

১। ব্রহ্মচারী শ্যামাচরণ (অচ্যুতানন্দ) কালীপ্রসাদবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন, তিনি কিছুদিন বাবুরাম মহারাজের পূজিত ঠাকুরের পটখানির নিত্যপূজা করিয়াছিলেন। ১৯১৯, আশ্বিনের ঝড়ে ঘরবাড়ী উড়াইয়া নেয়, পটখানিও নষ্ট হইয়া যায়।

২। এই টেলিগ্রাম মহারাজ করেন নাই, তাঁহার নাম দিয়া অপর কেহ করিয়া থাকিবেন। মহারাজ এই সময়ের বহু পূর্ব হইতেই কাশীতে ছিলেন।

মঠে এমন কোন কাজ ফেলে আসিনি যে দুইএক দিন পরে গেলে চলবে না। তুমি খবর দাও, আমি তোমাদের ওখানে যাব। পরদিন তিনি কলমায় আসিলেন (২০শে মে, ১৯১৩)।

আমার দাদা ভুবনেশ্বর দাশগুপ্ত পূর্ব জীবনে বিপথগামী ছিলেন। তিনি মৎস্য-শিকার ভালবাসিতেন। নৌকায় করিয়া কলমায় আসিতে আসিতে সারাটি রাস্তা, প্রায় দুই ক্রোশ, বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সঙ্গে কেবল মাছের গল্প করিলেন—পদ্মায় কী কী মাছ পাওয়া যায়, কেমন করিয়া ধরিতে হয়, ইত্যাদি। আর এই গল্পের মাধ্যমে তাঁহার মনটি জয় করিয়া নিলেন![1] পরদিন সকালে দাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, মা কালীর কাছে আজ পাঁঠাবলি, মাছভোগ দেব কি? উত্তর দিলেন, যদি দেবার নিয়ম থাকে দেবেন, আমি এসেচি বলে নয়। দাদার এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার শরীর যাইতে বাবুরাম মহারাজ আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'ভুবনবাবু আমাকে কতই ভালবাসিতেন!'

নৌকা হইতে নামাইয়া কীর্তন ও শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে লইয়া আসা হইল ভূপতিবাবুদের বাড়ীতে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে তখন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে ছেলেরা গান গাহিতেছিল, তিনি তাহাতে যোগ দিলেন ও হাততালি দিতে দিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গভঙ্গী ও ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হাতের মুদ্রা ঠিক ঠাকুরের মত, যেমন পটে দেখা যায়, হইয়া গেল। চক্ষু দুইটি মুদ্রিত, মুখে দিব্য হাসি ক্ষরিত হইতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, এই ভাবাবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করা বোধ হয় ঠিক নয়। ছেলেদিগকে সরাইয়া দিতে গেলে তিনি জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—না-ন্না-ন্না, থাক্ থাক্।

ছেলেদের প্রণামের ফাঁকে আমিও প্রণাম করিতে গেলাম, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিবার আগেই তাঁহার ভাবভঙ্গ হইল। 'জয় গুরু,

১। গুণনিধি, সর্বগুণ তাঁহাতে বিরাজে।
কেহ বা এ গুণে কেহ অন্য গুণে মজে॥ —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি

জয় গুরু' বলিতে বলিতে তিনি ঠাকুরঘরের দরজায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিবার উদ্যোগ করাতেই বোধ হয় তাঁহার ভাবভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইল, তিনি তো চোখ বুঁজিয়াই ছিলেন, আমি যে প্রণাম করিতে গিয়াছি তাহা জানিতে পারিলেন কিরূপে? এই সমস্যার সমাধান হয় পরে একদিন বেলুড় মঠে। তিনি বলিয়াছিলেনঃ গিরিশবাবুর ইচ্ছা ছিল তাঁহার এক বন্ধুকে ঠাকুর কৃপা করেন। সেই বন্ধুকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—তোর মনে কী-সব অঙ্কট বঙ্কট আছে, এক বুক গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে মা গঙ্গাকে তোর ভিতরের সব কথা খুলে বলে আয়। তুই একখানা আসন পেতে দিলেও তো আমি বসতে পারি না! একদিন থিয়েটারে অভিনেত্রীরা ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছে দেখিয়া গিরিশ ভাবিলেন এই সুযোগে বন্ধুকে দিয়াও প্রণাম করাইয়া নিবেন। ঠাকুর বক্‌সে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন, সে কাছে আসিবামাত্র তাঁহাব ভাবভঙ্গ হইল ও পা গুটাইয়া নিলেন। তাঁর কি শুধু দুটো চোখ ছিল রে? প্রতি রোমকূপ তাঁর চোখ ছিল—তাঁর দেহ যে চিন্ময়![১]

পরদিন সকালবেলা বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের গ্রামের প্রধান কে? আমি বলিলাম, ভূপতিবাবুর কাকা। কাকা ঠাকুরের ভাবের বিরোধী। বাবুরাম মহারাজ নিজে সাধিয়া কাকার বাড়ীতে গেলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন, এবং নিজে চাহিয়া নিয়া এক গ্লাস জল পান করিলেন। কাকাব বংশধরেরা অনেকেই ঠাকুরের ভক্ত হইয়া যান।

১। অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিবং জগন্তি।
আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ —ব্রহ্মসংহিতা

কলমায় তখন ঠাকুরের আশ্রমের সূচনামাত্র, ছোট একখানি চালা তুলিয়া তাহাতে ঠাকুরের একখানি ছবি রাখা হইয়াছে। বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আসিয়া তিনি এখানে বসিলেন ও কিছুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ পাঠ শুনিয়া কহিলেন, এখানে অনেক সাধু-ভক্তের সমাগম হবে। তারপরে নিজেই আমাদের বাড়ীর ভিতর আসিলেন। 'এটি বুঝি তোমাদের ঠাকুরঘর?' বলিয়া, নিজেই ছোট ঠাকুরঘরটির দরজা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ও রাম, দেখবে এস, দেখবে এস, আমরা ভাবি আমরা ঠাকুরকে প্রচার করতে বেরিয়েচি, ঠাকুর যে নিজেই এখানে প্রচার হয়ে বসে আছেন!—আমাদের কী অভিমান! তারপরে বেশ জোরে জোরে অনেকক্ষণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নাহং নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু তুঁহু।' ঠাকুরঘরের উপরে একটি বেলগাছ, সম্মুখে তুলসীমঞ্চ দেখিয়া পরিবেশের প্রশংসা করিলেন। ঠাকুরের গলায় জুঁই ফুলেব মালা দেখিয়া বলিলেন, এমন সুন্দর মালা, এটি কে গেঁথেচে গা? তারপবে স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরঘরে বসিয়া মিনিট পনর জপ করেন। যখন ঠাকুরেব অন্নভোগ হইতেছিল, কীর্তনেব দলের সঙ্গে তিনি ঠাকুরঘর পরিক্রমা করেন। বিকালে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে মেয়েদের এক সভা হয়, সেই সভায় ঠাকুর ও মা-কালী অভেদ, কালী কৃষ্ণ অভেদ, ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। কলমায় দুই রাত্রি থাকিয়া ভূপতিবাবুর সঙ্গে তিনি কলিকাতা যাত্রা করেন।[১]

১। বিনোদেশ্বববাবু আরও বলেন:

কলিকাতায় একদিন বসু-ভবনে গিয়াছি, সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র। মহারাজ ও বাবুরাম মহাবাজ সেই সময়ে বসু-ভবনে ছিলেন, মহাবাজ তাস খেলিতেছিলেন বড় হলঘরের পাশেব ছোট ঘবটিতে বসিয়া। বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে দেখিয়াই বাহির হইয়া আসিলেন ও বলিলেন, মহাবাজ, কলমায় আমি এদেব বাড়ী গেছিলাম। মহারাজ খেলায় তন্ময়। বাবুরাম মহারাজ মিনতি করিযা বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ, একটিবার চেয়ে দেখ, মহারাজ, একটিবার চেয়ে দেখ। তিনচাবি বার এইরূপ বলিবার পর মহারাজ চাহিয়া দেখিলেন।

তারপরে আমাদিগকে নিয়া চক্‌মিলানো বারান্দার পশ্চিম দিকে আসিয়া বসিলেন। গোলাপ-মা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, গোলাপ-মা, এস, এই দেখ,—আমি কলমায় এদের বাড়ী গেছিলাম, এরা সব ঠাকুরের ভক্ত, এদের বাড়ীর মেয়েরাও সব ভক্ত। গোলাপ-মা আমাদের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন ও তেজের সহিত বলিলেন, তা ভক্ত হবে না বাবুরাম? ঠাকুরের শ্রীমুখের কথা—আমায় যে দেখেচে তার যত না ভক্তি হবে, যে আমার নাম শুনে আসবে তার তার চাইতে বেশী ভক্তি হবে—একথা কি মিছে হবার? 'ইনি কথামৃতের শোকাতুরা ব্রাহ্মণী গোলাপ-মা।' এই বলিয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহার পরিচয় দিলেন। আমরা একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, গোলাপ-মা, দেখচ কী প্রণামের ঠেলা?—তুমি তো অবতার হযে গেলে। 'অবতার হব না? অবতারের সঙ্গে এসেচি, অবতার হব না? ব্রাহ্মণী সেই তেজের সহিত উত্তর দিলেন। বাবুরাম মহারাজ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

প্রচারকার্যে ময়মনসিংহে ও ঢাকায় গমন

১৯১৩, ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহের জিতেন্দ্র দত্ত ৺কাশী যান, এবং সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে বাবুরাম মহারাজের মুখে ঠাকুর-স্বামিজীর কথা শুনিয়া মুগ্ধ হন। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বাবুরাম মহারাজ যে কথাগুলি অনর্গল বলিয়া গিয়াছিলেন তাহার দুইএকটি এইরূপ: 'স্বামিজী বলে গেছেন এখন কথা বন্ধ হোক, কাজ কথা বলুক।' 'কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিভৃতচিন্তায় আছে নীরব কবির কথা; সেই প্রকার নীরব কবি হতে হবে, সমস্ত জীবনটাই কবিত্বময় করতে হবে।'

জিতেনবাবুর তাঁহাকে বড়ই আপনার বোধ হইতে থাকে, এবং বাড়ীতে ফিরিয়া ও বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, ঠাকুরের জন্মোৎসবে বাবুরাম মহারাজকে ময়মনসিংহে আনয়ন করিবেন। তদনুযায়ী প্রকাশ সরকার (গিরিশানন্দ) ও সুরেন্দ্র বসু মঠে প্রেরিত হন। ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন মঠে পৌঁছিয়াই তাঁহারা বাবুরাম মহারাজকে জানাইয়া দেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে ময়মনসিংহে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ যাইতে সম্মত হন এবং দিন কয়েক পরেই নারায়ণগঞ্জের পথে ময়মনসিংহ যাত্রা করেন (১৯১৪)। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন কৃষ্ণলাল মহারাজ, ব্রহ্মচারী রাসবিহারী (অরূপানন্দ) ও গায়ক কৃষ্ণবাবু।

যোগেশ ঘোষের কথা: সকালবেলা নীরদ মজুমদার আসিয়া বলিল, বাবুরাম মহারাজ কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জ আসচেন, আপনি যাবেন তো চলুন। আমরা নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিয়া দেখিলাম, ষ্টীমার আসিয়া গিয়াছে এবং মহারাজ ষ্টীমার হইতে নামিয়া রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিয়া আছেন, ময়মনসিংহ যাইবেন। তাঁহাকে দেখিয়া কত যে ভাল লাগিল! আমাদের আগ্রহ দেখিয়া ময়মনসিংহের ভক্তেরা বলিলেন,

আপনাদের ইচ্ছা হয় তো ময়মনসিংহে চলুন, আমরাই গাড়ীভাড়া দেব। আমি, সতীন্দ্র চক্রবর্তী, নীরদ মজুমদার, এবং আরও অনেকে সেই গাড়ীতেই ময়মনসিংহ চলিলাম। যেসব ষ্টেশনে ইঞ্জিন জল নেয় সেই সব ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়ায়, আর আমরা তখন মহারাজের কামরার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে থাকি—কী যে তাঁহার আকর্ষণ, প্রাণে কী যে শান্তির অনুভূতি! আমি ও সতীন্দ্র (জ্ঞানেশ্বরানন্দ) সেবার বি-এ পরীক্ষার্থী, আমরা পর দিনই ফিরিয়া আসিলাম। ময়মনসিংহে কৃষ্ণলাল মহারাজকে ভাবাবস্থায় কীর্তনে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম।

ময়মনসিংহে জিতেনবাবুর বাসা-বাড়ীতে বাবুরাম মহারাজের থাকার ব্যবস্থা হয়। গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া ভক্তেরা নিজেরাই গাড়ী টানিয়া আনিয়াছিলেন ষ্টেশন হইতে। উৎসব যথারীতি হইয়া গেল ভজন পূজন প্রসাদবিতরণ ও সভানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া। সভায় বাবুরাম মহারাজ কিছুই বলিলেন না, সভাটি হইয়াছিল ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের পৌরোহিত্যে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাবুরাম মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করিবার জন্য বহু লোক সমবেত হইতেন জিতেনবাবুর বৈঠকখানা ঘরে। নিজস্ব ভাবে ও ভঙ্গীতে এমনভাবে তিনি ঠাকুর-স্বামিজীর প্রসঙ্গ করিতেন যে, শ্রোতাদের মনে তাহা গভীর রেখাপাত করিত, আর সংসারের গ্লানি হইতে বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইত তাহাদের মন। ছেলেদিগকে তিনি বলিতেন : তোমরা আগে স্বামিজীকে বুঝতে চেষ্টা কর, পরে ঠাকুরকে বুঝবে ; ঠাকুর সূত্র, স্বামিজী সেই সূত্রের ভাষ্য।

তাঁহার সঙ্গগুণে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনজন সংসার ত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং বহুলোক ঠাকুরের ভক্ত হইয়া যান। 'আমি যেখানে যাব সেখানে বাইরে ঠাকুরকে বসাব না, মানুষের হৃদয়ে তাঁকে বসাব।' তিনি বলিতেন। সাতদিন তিনি ময়মনসিংহে ছিলেন।[১]

১। বিনোদেশ্বরবাবু বলেন : বাবুরাম মহারাজ যেবার প্রথম ময়মনসিংহে আসেন, একদিন সন্ধ্যার সময় বলিলেন, কারু বাড়ীতে শাঁক ঘণ্টা বাজে না, একি ম্লেচ্ছদেশে এলুম নাকি রে?

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ধীরেন্দ্র সোমের চেষ্টায় নারায়ণগঞ্জ শহরের অন্তর্গত ভগবানগঞ্জে ঠাকুরের নামে একটি আশ্রম স্থাপিত হয়।[১] ধীরেনবাবু ও তাঁহার ছাত্রবন্ধুরা মিলিয়া সেই আশ্রম পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা ময়মনসিংহে গিয়া বাবুরাম মহারাজকে নারায়ণগঞ্জে আসিতে আমন্ত্রণ করিলে তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণলাল মহারাজ ও ব্রহ্মচারী রাসবিহারীকে সঙ্গে নিয়া নারায়ণগঞ্জে আসেন। এখানে নিতাইগঞ্জের এক সদ্যোনির্মিত বাড়ীর দোতলায় তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানে এক সপ্তাহ থাকিবার পর—এই সময়ের মধ্যেই এখানে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—ভক্তেরা তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি ঢাকায় যাইতে সম্মত হইলেন না। বিদ্বান লোকের জায়গা, তিনি মূর্খ মানুষ, গিয়া কী করিবেন? ভক্তদের পীড়াপীড়িতে

১। ১৯১২, ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাবুরাম মহারাজ ধীরেনবাবুকে এই পত্র লেখেন:

প্রীতিভাজনেষু—

যদি তোমরা সুবিধা বোধ কর তাহা হইলে প্রাতে ঠাকুরঘর খুলিবার পর ধুনা দিবে এবং সক্ষম হইলে প্রত্যহ অন্ততঃ আধ পয়সার বাতাসা সকালে ও আধ পয়সার সন্ধ্যার সময় আরতির পর ভোগ দিবে এবং উপস্থিত সকলকে একটু একটু প্রসাদ বিতরণ করিবে।... অন্তরের ব্যাকুলতা শ্রদ্ধা প্রীতি ও সরলতার সহিত তাঁহাকে যাহা দিবে তিনি তাহাই গ্রহণ করেন।

সাবধান! কতকগুলা লোক নিয়া হৈ চৈ করিলেই ধর্ম হয় না। লোকমান্য পাবার ইচ্ছা হইলে ভক্তি প্রেম সেখান থেকে পলায়ন করে। অভিমান আসিলে লোকে মোহসাগরে ডুবিয়া মরে। খুব হুঁশিয়ার, এই মোহসাগর পার হবারই নাম ধর্ম—বুঝিলে?

অবসর হলে এবং ছুটির দিন সকলে মিলিয়া হরিসংকীর্তন করিবে, মাঝে মাঝে অন্ন বা খিচুড়ি বাঁধিয়া ভোগ দিবে।

পূজ্যপাদ স্বামীজির পুস্তকাদি ও কথামৃত প্রভৃতি নিয়মিতরূপে পাঠ ও চর্চা করিবে। ভাগবত পুরাণ এবং দর্শনাদির চর্চা করা খুব উচিত। বিদ্যার আলোচনা না থাকিলে বুদ্ধি মার্জিত হয় না, তাই দর্শনশাস্ত্রের—সাংখ্য ও পাতঞ্জলের চর্চা রাখা খুব দরকার।...

আগামী ৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ঠাকুরের জন্মতিথি-পূজা হইবে, তোমরা পূজা করিও।

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

কহিলেন, যদি মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে যাইতে আদেশ করেন তবেই যাইবেন। ভক্তেরা কলিকাতায় শরৎ মহারাজকে সকল কথা লিখিয়া জানাইলেন। তাঁহার নিকট হইতে এই মর্মে তার আসিল: প্রেমানন্দ ঢাকায় যাইতে পারেন, শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করিতেছেন।

দিন পনর নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাবুরাম মহারাজ ঢাকায় যান ও দুই সপ্তাহ সেখানে বাস করেন। তারপরে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া এক সপ্তাহ থাকেন। এখানে আসার পরদিন (৪ঠা এপ্রিল) অশোকাষ্টমীযোগে লাঙ্গলবন্দে যাইয়া তিনি ব্রহ্মপুত্রস্নান করেন মাঝ নদীতে কোমরজলে দাঁড়াইয়া। বহু ভক্ত তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী নেপাল নারায়ণগঞ্জে বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করেন এবং নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকায় বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন:

নারায়ণগঞ্জে বাবুরাম মহারাজ দুইবেলা বেড়াইতে বাহির হইতেন আমাকে সঙ্গে নিয়া। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, নাগ মহাশয়ের বাড়ী এখান থেকে কত দূর রে? আমি বলিলাম, মাইল দুই হবে। তিনি পরদিন সকালে যাইবেন বলিলেন ও গাড়ী করিতে মানা করিলেন। হাঁটিয়া চলিয়াছেন, আমি সের দুই অমৃতি কিনিয়া সঙ্গে নিলাম। নাগ-বাড়ীতে পৌঁছিয়া, যে মণ্ডপটিতে নাগ মহাশয়ের তৈলচিত্র ছিল সেখানে প্রণাম করিলেন। তাঁহাব স্ত্রী, মুখে ঘোমটা, অন্য লোক সঙ্গে নিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন ও সেই লোকটির মারফৎ নিবেদন করিলেন: উনি এভাবে হঠাৎ আসবেন তা তো আমরা জানি না, তাঁর কিছু সেবা করতে পারলাম না। কাল লোক দিয়ে আশ্রমে খাবার তৈরী করে পাঠিয়ে দেব, দয়া করে যেন গ্রহণ করেন। পরদিন তিনি ভাত-ডাল-ব্যঞ্জন-পায়স-পিঠা চারিপাঁচ জন লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে বাবুরাম মহারাজ আর একদিন নাগ-বাড়ীতে যান ও সেখানে বসিয়া আহার করেন, আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়া।

নারায়ণগঞ্জে আমার এক বয়স্য তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া খাওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি তাহাতে সম্মতি দান করিয়া বলেন, আর সব রান্না আপনারাই করবেন, আমার জন্যে ভাতটা শুধু (আমাকে দেখাইয়া) এ করে দেবে। তাহাই হইল। তিনি সব একটু একটু মুখে দিলেন, 'এরা বেশ লোক' বলিয়া প্রশংসাও করিলেন, কিন্তু আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার জ্বর হইল ১০২° ডিগ্রি। যাহা হউক, জ্বর একদিনেই সারিয়া যায়।

ঢাকায় আসিয়া বাবুরাম মহারাজ ফরাসগঞ্জে মোহিনীমোহন দাসের বাড়ীতে ছিলেন। মোহিনীবাবুর ভাগিনেয় যতীন্দ্র দাস তাঁহার সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। ঢাকায় আসিয়া স্বামিজীও এই বাড়ীতে ছিলেন এবং এই যতীনবাবুই তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। ষ্টেশন হইতে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া বাবুরাম মহারাজকে লইয়া যাওয়া হয়। সেই শোভা-যাত্রার পুরোভাগে ছিলেন ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত নিত্যগোপাল গোস্বামী —অতিবৃদ্ধ, সৌম্যমূর্তি, মুখে লম্বা দাড়ি—সর্বধর্মের প্রতীকবিশিষ্ট দণ্ড হাতে করিয়া। নবাবপুর হইতে ভক্তেরা নিজেরাই গাড়ী টানিয়া আনিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে শোভাযাত্রাটি যখন মোহিনীবাবুর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন সেখানে চারিপাঁচ শত লোক জমা হইয়া গিয়াছে। পৌঁছিয়াই বাবুরাম মহারাজ ছোট একটি ভাষণ দিলেন, বিশেষভাবে যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া।

মোহিনীবাবুর বাড়ীতে আসার দিন দুই পরে, এক শ্বেতশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিতে আসেন। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, দেখ ইনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, এখানে কয়েকদিন থাকবেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—সে কী বলচেন? আমি পণ্ডিত নই, সদ্য পুত্রশোকে কাতর। শুনেচি আপনি সাধু লোক, শান্তি পাওয়ার আশায় আপনার কাছে এসেচি। পরদিন সকালে আমরা সকলে যখন বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিতেছি, ব্রাহ্মণও প্রণাম করিলেন। 'আপনি সন্ধ্যাহ্নিক করেচেন?' বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—না। ছেলের

মৃত্যুর পর থেকে সন্ধ্যাহ্নিক আমার ঘুচে গেছে। সামনে সেই মৃত ছেলেকেই শুধু দেখি, আর কিছু মনে থাকে না! 'এ কী কথা বলচেন আপনি? ব্রাহ্মণ হয়ে নিত্যকর্ম ছেড়ে দিয়েচেন?' সজোরে এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের পিঠে হাতের চাপড দিয়া কহিলেন,—যান, বসে সন্ধ্যাহ্নিক করুন গে। আমি বলচি, তাতেই আপনার ব্রাহ্মণত্ব ফিরে পাবেন। মহামায়া এমনি ভুলিয়ে রাখেন, আপনাকেও ছেলে দিয়ে ভুলিয়েচেন। তিনদিন এখানে থাকার পরে ব্রাহ্মণ বাবুরাম মহাবাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন,— এবার আমাকে বিদায় দিন; ক্ষণেক সাধুসঙ্গে পুত্রশোকের মত মহাদুঃখও যে দূর হতে পাবে, আপনাকে পেয়ে সেটা উপলব্ধি হল। পুত্রশোকের জ্বালা আমার আর নাই!

'শুনেচি বিজয়গোস্বামীর আশ্রম এখানে আছে, তুই জানিস সে জায়গা?' বাবুবাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা সকালবেলা গেণ্ডারিয়ায় গোসাঁইজীব আশ্রমে গেলাম। তাঁহার শাশুড়ী দূর হইতে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজকে চিনিতে পারিলেন এবং ছুটিয়া আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। 'আপনি করচেন কি? আমি আপনার সন্তানতুল্য।' এই বলিয়া আপত্তি করিলেও, শাশুড়ী সেকথায় কান না দিয়া, বাবুবাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—বাবা, আপনি এখানে? আমি দেখেচি আপনাকে ঠাকুরের কাছে—একবার দুবার নয়, কয়েকবার। সে কি ভুলবার? আজ আমার সুপ্রভাত—সুপ্রভাত—সুপ্রভাত! বৃদ্ধা তাঁহার দৌহিত্রীকে 'শান্তি, শান্তি' বলিয়া ডাকিলেন, শান্তি আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিল।

বাংলাবাজার-নিবাসী এক ভদ্রলোক বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়াই চিনিতে পারেন, কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া খাওয়াইলেন।

ঢাকা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য বাবুরাম মহারাজকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন। বাবুরাম

মহারাজ যখন তাঁহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণলাল মহারাজ, রাসবিহারী মহারাজ ও আমাকে সঙ্গে করিয়া, দেবেনবাবু আনন্দে অধীর হইয়া কোথায় বসাইবেন, কী করিবেন, যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। নিজের শিশুকন্যা ও স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করাইলেন, আর নিজে পাণিনি ব্যাকরণের সভাষ্য দুই খণ্ড, যাহা তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন, লইয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনাকে দিয়ে অভ্যর্থনা করি এমন কিছুই আমার নাই ; এই সামান্য দুইখানি বই আপনাকে নিবেদন করচি, আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহার হাত হইতে বই দুইখানি নিয়া মাথায় স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, সামান্য বই বলচেন কী, যা বেদবেদান্তের সাব তাই আপনি আমাকে দিলেন। দেবেনবাবুর পাণিনিপ্রীতি এতই গভীর ছিল যে, তাঁহার কন্যাটির নাম রাখিয়াছিলেন পাণিনি ; একটি সবৎসা গাভী তাঁহাব ছিল, তাহারও নাম রাখিয়াছিলেন পাণিনি।

'এখানে নাগকেশর ফুল পাওয়া যায় না?' আমাকে একদিন বাবুবাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম. বোধ হয় যায় রূপবাবু-রঘুবাবুদের বাগানে, আপনার নাম বল্লেই তাঁরা লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি কহিলেন, না, তুই নিজে গিয়ে আনবি। অন্ধকার থাকিতেই আসিয়া বলিলেন. এখনো ঘুমচ্চিস? ফুল আনতে যাবি না? নাবায়ণগঞ্জ যাইবার রাস্তার পাশে সুদীর্ঘ পুষ্পোদ্যান। উদ্যানটি আগে পড়ে, যদি মালীকে বলিয়া ফুল নিতে হয় আরও অনেকটা রাস্তা হাঁটিতে হইবে। অনেক দূর হইতেই নাগকেশরের ভরভর গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। আমি দেয়াল টপকাইয়া—তোড়ার মত হইয়া ফুটিয়া আছে ফুলগুলি—কয়েকটি ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি ফুল লইয়া আসিলাম। ফুল দেখিয়া তাঁহার কী যে আনন্দ! ফুলগুলি তাঁহার বিছানার দুইপাশে ফুলদানিতে করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল। ফুলের গন্ধ নিয়াই তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, বিরহের অবস্থায় শ্রীমতী এই ফুল শুঁকতেন, আর তাতে কৃষ্ণ-অঙ্গের

গন্ধ পেতেন, কৃষ্ণের গায়ের গন্ধ এইরূপ ছিল![১] আর একদিন তাঁহার জন্য এইভাবে ফুল আনা হইয়াছিল, ফুল আনিতে যাওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, দেখ্ বেটা, যাচ্চিস ফুল চুরি করতে; যদি ধরা পড়ে যাস, আমার নাম যেন করিস নি।[২]

নীরদ মজুমদারের প্রযোজনায় একদিন বিকালে বাবুরাম মহারাজকে নিয়া নগরকীর্তন বাহির করা হয়। অনেকখানি রাস্তা পরিক্রমা করা হইয়াছিল। ফিরিবার সময় কীর্তন-শোভাযাত্রাটি যখন রূপবাবুদের বাড়ীর কাছে আসিয়াছে, ছাদ হইতে ঐ বাডীর মেয়ে-ভক্তেরা, সংখ্যায় বহু, পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকেন। মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হইতেই বাবুরাম মহারাজ 'এ কী দেখচি!' বলিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন, আর ঊর্ধ্ববাহু ও ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন! তাঁহার মুখমণ্ডলে দিব্যদ্যুতি খেলিয়া যাইতে লাগিল। পড়িয়া যাইবেন আশঙ্কা করিয়া আমি তাঁহাকে ধরিয়া রহিলাম, ভক্তেরা প্রণাম করিতে লাগিলেন।

যোগেশ ঘোষ বলেন ঃ

বাবুরাম মহারাজ যখন ঢাকায় আছেন সেই সময় আমরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। দিনান্তে একবার তাঁহার কাছে যাইতাম। একদিন বলিলেন, তোদের না পরীক্ষা সামনে? এখানে যে আসিস, লোকে বলবে, সাধুর পাল্লায় পড়ে পরীক্ষায় ফেল হল! আমি সতীন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলাম, —এ পড়ায় খুব ভাল, ফেল হবে না, মহারাজ। আমি সমস্ত দিন পড়াশোনা করি, বিকালে আপনার কাছে আসি, পড়ায় এত একাগ্রতা হয় যে, জীবনে

১। নাগকেশর ফুল ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল। শ্রীমতীর গাত্রবর্ণ নাগকেশর ফুলের কেশরের মত, তিনি বলিয়াছেন। নাগকেশর ফুলে শ্রীমতীর-গাত্রবর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ মিলিত হইয়াছে।

২। কুসুমানামলাভে তু চৌর্যাদানং ন দুষ্যতি।
দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ॥ —শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৭।৫৯

এমন কখনো আর হয় নাই। তিনি বলিলেন, বটে, বটে? সেবার আমরা দুইজনেই পাস করি।

তাঁহার কাছে অনবরত লোকজন আসিত, আর ঠাকুরের প্রসঙ্গ, উপদেশদানাদি চলিত। ইহারই মধ্যে একদিন কেহ এখানে ঠাকুরের নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, এ কথা উত্থাপন করেন। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে তখন। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, তুই যোগেশ দাসকে ডেকে নিয়ে আয় তো। কাছেই যোগেশবাবুর বাড়ী, আমি তখনই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। নিজের ডানপাশে তাঁহাকে বসাইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, কি যোগেশ, এখানে ঠাকুরের একটি আশ্রম করতে পারবে তো? 'হাঁ মহারাজ, আপনার কৃপা হলে কেন পারব না?' যোগেশবাবু উত্তর দিলেন। তাঁহার সাত হাজার টাকায় কেনা সাত বিঘা জমির উপরেই ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা হইতে বাবুরাম মহারাজ আবার যখন নারায়ণগঞ্জে আসিলেন, নানাস্থান হইতে সমাগত ভক্তেরাও আসিলেন। প্রায় পঞ্চাশ জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইল ও ধারে জিনিসপত্র আসিতে লাগিল। রাঁধিয়া রাঁধিয়া নেপালও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় নবদ্বীপচন্দ্র সাহা নামে এক সহৃদয় ব্যবসায়ী যুবক আসিয়া সমবেত সাধুভক্তগণকে সেবা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন। নবদ্বীপবাবুই অধিকাংশ ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।[১]

১। কথা ছিল, ঢাকার ভক্তেরা আসিয়া মহারাজদের জন্য কলিকাতার টিকেট কাটিয়া দিবেন, কিন্তু ষ্টীমার ছাড়িবার সময় হইয়া আসিলেও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি নবদ্বীপবাবুর নিকট হইতে পঁচিশ টাকা লইয়া আসিয়া ধীরেনবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কাটিয়া দেন। সদ্য সৈন্যদলে ভর্তি হইয়া 'বাঘা' নামে এক যুবক কলিকাতা যাইতেছিল, গোয়ালন্দ ষ্টেশনে সে মহারাজদিগকে জিনিসপত্র সহ গাড়ীতেতুলিয়া দেয় এবং শিয়ালদহে পৌঁছিয়া তাঁহাদের মঠে যাইবারও ব্যবস্থা করে। বাঘার সঙ্গীরাও সাহায্য করিয়াছিল। বাঘা ধীরেন্দ্র সোমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

মালদহের মহোৎসবে

মালদহের গোপীনাথ দাস বেলুড় মঠে ঠাকুরের মহোৎসব দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং মালদহে অনুরূপ একটি উৎসব করিতে অভিলাষী হইয়া, সহপাঠী ধীরেন্দ্র দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়া বসু-ভবনে বাবুরাম মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিদগাঁর উৎসবে যোগদান করিয়া ধীরেন্দ্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বাবুরাম মহারাজের কথায় উৎসাহিত হইয়া তিনিই উৎসব পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

ফজলি আমের দেশ মালদহের উৎসবায়োজনটিও বড রকমেরই হইয়াছিল। পৌরপ্রধান সতীশচন্দ্র আগরওয়ালা এই কার্যে অগ্রণী হন এবং জমিদার ও ধনিক শ্রেণীব লোকেরা ব্যয়ভাব বহন কবেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে, ১৯১৪) হইতে দিবসত্রয় উৎসব চলিবে স্থির করিয়া জেলার সর্বত্র এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হয়।

ইতোমধ্যে বাবুরাম মহারাজের জ্বর হইয়াছিল, তিনি সারিয়া উঠিলে শবৎ মহারাজ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এইরূপ অবস্থায় বাবুবাম মহারাজ স্বভাবতই মালদহ যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। যাহা হউক, শরৎ মহাবাজ অন্নপথ্য করিয়াছেন দেখিয়া এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীব অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি উৎসবের দুইদিন পূর্বে মালদহে শুভাগমন করিলেন কৃষ্ণলাল মহারাজ, ব্রহ্মচারী চারু, কৃষ্ণবাবু ও কতিপয় ভক্তকে সঙ্গে করিয়া।

দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জের শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতসম্প্রদায়, নবদ্বীপের বৃন্দাবনদাসের কীর্তনের দল ও বিক্রমপুরের ভক্তগণের কথা উল্লেখযোগ্য। বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত বলেন ঃ আমি, দাদা, ভূপতিবাবু, তাঁহার দাদা প্রভৃতি পনর কুড়ি জন বিক্রমপুর হইতে মালদহে যাই। সময়ে গাড়ী ধরিতে না পারিয়া আমরা অনেক রাত্রে সেখানে পৌঁছি ও পুরাতন মালদহের ধর্মশালায় উঠি। সকালবেলা বাবুরাম মহারাজ ধর্মশালায় আসিলেন এবং রাত্রে

আমরা কী খাইয়াছি, কী কী রান্না হইয়াছিল, খবর নিলেন।…আমাকে বলিলেন, তুমি ঠাকুর সাজাবে, জবাফুল দিয়ে। মালদহ গোঁড়া বৈষ্ণবের দেশ, আমি জবাফুল চাহিতেই যাহারা ফুল যোগাইতেছিল তাহারা অবাক হইয়া গেল। অনেক কষ্টে কয়েকটি মাত্র জবা দিতে পারিয়াছিলাম।

বিকালবেলা গোসাঁই প্রতাপচন্দ্র গিরির পৌরোহিত্যে এক বিরাট জনসভা হয়। সেই সভায় বাবুরাম মহারাজ আধ ঘণ্টা ধরিয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শ্রোতাদের কেহ কেহ প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করেন,—কে শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? প্রেমভক্তির কথা শোনার অধিকারী কে আছে এখানে? তারপরে শান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন: এক পসারী পাড়া ঘুরে ঘুরে হেঁকে যাচ্ছিল—'প্রেম নেবে গো, প্রেম নেবে? প্রেম চাই গো, প্রেম চাই?' দু পাশের সকল বাড়ীর মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই দরজা খুলে বেরুচ্চে আর বলচে, হ্যাঁ নেব, কী দর? পসারী বল্লে,—এর আবার দর কী হতে পারে? এ অমূল্য। তবে এক মূল্যে দিতে পারি—এর মূল্য হল মাথা। কেউ পারবেন মাথা দিতে? মূল্যের কথা শুনে সবাই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বাড়ীর ভিতর ঢুকল। তাই বলছিলাম, প্রেম-ভক্তির কথা শুনতে চান, উত্তম। কিন্তু কেউ পারবেন মাথা দিতে?—কেউ পারবেন প্রাণ বিলিয়ে দিতে?

প্রেমের প্রতিষ্ঠা যে আত্মবিসর্জনে, এই তত্ত্বটি গাঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন শ্রোতাদের মনে, ছোট একটি গল্পের মাধ্যমে।

উৎসবের তিনদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতসম্পদায় রাই উন্মাদিনী, নিমাই-সন্ন্যাস ও প্রভাস-যজ্ঞ পালাগান করেন। বৃন্দাবনদাসের কীর্তনগানও হইয়াছিল।

মালদহে তখনও আমের মরসুম সুরু হয় নাই। সঙ্গীতসম্প্রদায়ের ছেলে-দিগকে দেখাইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন,—ঠাকুরের নামে উৎসব করতে এরা মালদহে এসেচে, আর আম না খেয়ে যাবে? এরা দেশে গেলে এদের খেলার সাথীরা বলবে, মালদহে গিয়ে কেমন আম খেলি? তখন এরা কী বলবে?

আম ছাড়া মালদহের উৎসব, তাও আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে, সেই বা কেমন হবে ? এই কথা শুনিয়া বহু বৃহৎ আমবাগানের মালিক প্রতাপচন্দ্র শেঠ পাকা আম সংগ্রহের ভার নিলেন ও ঝুড়ি ঝুড়ি আম আসিতে আরম্ভ করিল। উৎসবান্তে একদিন বিকালে শতাধিক লোক সঙ্গে নিয়া বাবুরাম মহারাজ শেঠজীর এক বাগানে যান। সকলেই সেখানে ইচ্ছামত পাকা আম পাড়িয়া খাইলেন ও সশীষ আম সংগ্রহ করিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। ছাতা দিয়া নিজের হাতে গাছের ডাল নোয়াইয়া ধরিয়া বাবুরাম মহারাজ ছেলেদিগকে আম পাড়িয়া নিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একদিন উমেশচন্দ্র বসাকের গৃহে ভাণ্ডারা হয়, সেদিনও তিনি 'একে, দাও, ওকে দাও' বলিয়া সকলকে প্রচুর আম খাওয়াইয়াছিলেন।

ভক্তদের সঙ্গে যাইয়া তিনি বাঙ্গলার অন্যতন প্রাচীন রাজধানী পাণ্ডুয়া দেখিয়া আসেন এবং ইহার পরেই মঠে প্রত্যাবর্তন করেন (৭ই জুন)।

নাটশালে ও তমলুকে

নাটশালের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া স্বপ্নে ঠাকুরের দর্শন পান এবং পুরীধামে গিয়া মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ নৌকায় করিয়া বেলুড় মঠে ঢেঁকিছাঁটা ছাউল সরবরাহ করিয়াছিলেন চারিপাঁচ বৎসর ধরিয়া ; সেই চাউল ক্রয় করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে টাকা পাঠাইতেন।

নাটশাল রূপনারায়ণ নদের তীরে, গেঁওখালির সন্নিকটে অবস্থিত। দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ইচ্ছায়, মঠে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব হইয়া যাওয়ার পরে, বাবুরাম মহারাজ এখানে শুভাগমন করেন, গোপাল মহারাজ-প্রমুখ নয়জন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া (১৯১৫)। দশটি চকে বিভক্ত নাটশালের রাজচকে, হিজলী ক্যানেলের পাড়ে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে গেঁওখালিতে আসিয়া বাবুরাম মহারাজ তথাকার থানার দারোগার বাসায় মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রাম করেন। অপরাহ্ণে একটি কীর্তনের দল আসিয়া তাঁহাকে রাজচকে লইয়া যায়। রাজচক আশ্রমে তিনি সপরিকর তিনদিন বাস করেন।

গেঁওখালির দারোগা ছিলেন স্বামিজীর শিষ্য ও পূর্ববঙ্গের লোক। মহিষাদল রাজষ্টেটের ম্যানেজার শচীন বসুও—মহিষাদল ও নাটশালের ব্যবধান তিন মাইল মাত্র—ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত। উৎসবায়োজনে তাঁহারা উভয়েই সক্রিয় সাহায্য করেন।

দারোগার আহ্বানে শতাধিক চৌকিদার আসিয়া আশ্রমের সংলগ্ন ধান্যক্ষেত্রটি পরিষ্কৃত ও সমতল করিয়া ফেলে। সেই মাঠে বৃহৎ সামিয়ানা খাটাইয়া উৎসব-মণ্ডপ প্রস্তুত করা হয়। বিপুলপরিমাণ খিচুড়ি ও তরকারি রাঁধিবার জন্য একুশটি উনানে একুশ জন পাচক নিযুক্ত হইয়াছিল।

স্বয়ং বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরপূজা করেন এবং উৎসব-প্রাঙ্গণে সমবেত ভক্তগণকে ঠাকুরের কথা শ্রবণ করান। চৌদ্দ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। ব্রহ্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে পরিবেষণকার্যটিও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

একজন মুসলমান পংক্তিমধ্যে বসিয়া প্রসাদ খাইতেছে দেখিয়া জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি তাহাকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। বাবুরাম মহারাজ দ্রুতপদে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন এবং মুসলমানটিকে খাইতে অনুমতি দিয়া সানন্দে দুই বাহু উত্তোলিত করিয়া বলিতে থাকেন, 'এ পুরুষোত্তমপুরী! এ পুরুষোত্তম-পুরী!' পংক্তির পর পংক্তি ঘুরিয়া তিনি 'পুরুষোত্তমপুরী' কথাটি উচ্চারণ করেন।

শচীনবাবুর আহ্বানে বাবুরাম মহারাজ মহিষাদলে যাইয়া একদিন অবস্থান করেন এবং সেখান হইতে মোটরগাড়ীতে করিয়া তমলুক যান। তমলুকে তিনি ৺বর্গভীমা দেবী দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরের সেবাইত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শিষ্য গিরিজাচরণ অধিকারী তাঁহার সেবাযত্ন করিয়াছিলেন। তমলুক হইতে পুনরায় নাটশালে আসিয়া গেঁওখালির পথে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

রাড়িখালের মহোৎসবে

বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামের মুকুন্দলাল বসু, বঙ্কিমচন্দ্র দাস ও কামাখ্যাচরণ মিত্র স্বগ্রামে ঠাকুরের মহোৎসব করিতে উদ্যোগী হইয়া বাবুরাম মহারাজকে সেখানে লইয়া যান আমন্ত্রণ করিয়া (১৯১৫, এপ্রিলের শেষাশেষি)। বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিলেন চারু (ভজনানন্দ), রাসবিহারী (অরূপানন্দ), হরিহর (বাসুদেবানন্দ) ও বিমল (দয়ানন্দ)—এই চারিজন ব্রহ্মচারী। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সেই গ্রামে বাড়ী, তাঁহার বাড়ীতেই তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। জগদীশবাবুর ভ্রাতা সতীশবাবু তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন।

অরূপানন্দ বলেন ঃ

জগদীশবাবুর ঘরে যে খাটে বাবুরাম মহারাজকে শয়ন করিতে দেওয়া হয় সেই খাটটি ছিল ছারপোকায় ভর্তি; শোয়ার খানিক পরেই ছারপোকাগুলি তাঁহাকে দংশ করিতে লাগিল, আর নীচে নামিয়া আসিয়া আমাদিগকেও আক্রমণ করিল। অতিষ্ঠ হইয়া, 'এ কী?' বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন ও লণ্ঠন জ্বালিতে আদেশ করিলেন। তারপরে ছারপোকার বহর দেখিয়া, তখনই প্রতিকারের উপায় না থাকায়, মশারির ভিতর স্থিরাসনে বসিলেন। সত্যই ধ্যান করিতেছেন কিনা সন্দেহ হওয়ায় আমি একবার মশারি তুলিয়া দেখিলাম তিনি একই ভাবে বসিয়া। রাত্রি প্রভাত হইলে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন!

রাড়িখালে লোকের যেমন আকর্ষণ দেখিয়াছি এমন আর কোথও দেখি নাই। দুইতিন রাত তাঁহার ঘুমই হয় নাই, কিন্তু কাজের বিরাম নাই। অনবরত লোক আসিতেছে—হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা; আর সকলকে উপদেশ দিতেছেন। যে আসিতেছে সেই তৃপ্ত হইয়া ফিরিতেছে। ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, ভাবের বন্যা চলিয়াছে! সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে পূর্বে তাঁহাকে দেখি নাই, এখানে দেখিলাম চমৎকার সুসম্বদ্ধ বক্তৃতা

করিয়া ভাবের ঘোরে আসিতেছেন। একটি লোক পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলে অশুচি স্পর্শে চমকিয়া উঠিলেন।

যোগেশ ঘোষের কথা :

বঙ্কিম দাসের জ্ঞাতি রামতনু-সাধুর শিষ্যেরা কীর্তনের দল করিয়াছিল, একদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া তাহারা গান ধরিল :

এমন মধুমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে।
যে নাম একবার শুনে হৃদয়বীণে অমনি বেজে উঠেছে ॥
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম, কভু তো এমন করে নি পরাণ,
আজ কী যেন কী-এক নবভাবোদয় হৃদয়মাঝারে হতেছে।

... ...

আজ হতে নিমাই তোর সঙ্গে রব, জ্ঞানের গরব আর না করিব,
আজ সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে নাচিতে বাসনা হতেছে ॥

বাবুরাম মহারাজ অমনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কীর্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি এতই হেলিতে দুলিতে ছিলেন যে, পড়িয়া যাইবেন বলিয়া ভয় হইতেছিল। আমরা পাঁচসাত জন তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলাম। প্রায় পনর মিনিট পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হন।

সেই রাত্রেই স্থানীয় কতিপয় বালক বাবুরাম মহারাজকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে ও তিনি যাইতে সম্মত হন। চারিপাঁচটি লণ্ঠন নিয়া আমরা আটদশ জন তাঁহার সঙ্গে যাই, সাধুদের কেহ যান নাই। সেই বাড়ীতে যে-ঘরে তাঁহাকে বসাইবার কথা সেই ঘরে যাইবার সিঁড়িতে পা দিতে গিয়া তিনি পা ফেলিতে পারিলেন না, পা শূন্যেই রহিয়া গেল! আমাকে বলিলেন, বেটা কোথায় এনেচিস?—এ যে আঁধার দেখচি! তখন অন্য এক ঘরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে ঠাকুরের একখানা ছোট ছবি ছিল, দেখিবামাত্র আবেগভরে 'জয় গুরু শ্রীগুরু, জয় গুরু শ্রীগুরু' বলিতে বলিতে তিনি সেই ছবির সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। অসাড়ে পড়িয়া

আছেন দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, তিনি দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না তো? তিনচারি মিনিট পরে 'শ্রীগুরু শ্রীগুরু' বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও সেই বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলেন। অনুসন্ধানে পরে জানা গেল, যে ঘরের সিঁড়িতে তিনি পা দিতে পারেন নাই সেই ঘরে অনেক পাপানুষ্ঠান হইয়াছে।

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তের কথা :

রাড়িখালে খুব সকালে উঠিয়াই দেখি, বাবুরাম মহারাজ সিঁড়ির উপর বসিয়া বিড়বিড় করিয়া কী যেন বলিতেছেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিলাম তিনি বলিতেছেন : তিনি ছিলেন সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষ, তিনি বলেছিলেন, তোকেই প্রচার করতে হবে। তাই তো তিনি এ অধমকে, এ মূর্খকে দিয়ে প্রচার করিয়ে নিচ্চেন।

উৎসবের দিন (৩০শে এপ্রিল) সকালে সকলেই যখন প্রণাম করিতেছিল, এক বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়াই তাঁহার পায়ের অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় দুই হাত তুলিয়া 'আঃ, গেলাম গেলাম!' বলিয়া উঠিলেন। মেয়েটিকে সরাইয়া দিয়া পা ধোয়াইয়া দেওয়া হইল, তথাপি বিকাল পর্যন্ত তিনি যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। সেদিন তিনি বিকালেও স্নান করিয়াছিলেন।

রাড়িখালে ৭০।৮০ খানা পাত পড়িত। আমরা খাইতেছি, বাবুরাম মহারাজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা বলিয়া উঠিলাম, মহারাজ, আজ মাংস হয় নি। আগের দিন নিজেই তিনি মাংসের কথা বলিয়াছিলেন। বলিলেন : জানিস, দুই ভাইএর মাংস খাওয়ার খুব সখ ছিল, কিন্তু জুটত না। এক ভাই যখন খেতে বসত, অন্য ভাই দুই হাতে ভর দিয়ে পাঁঠার মত ভ্যা ভ্যা শব্দ করত। আবার সেই ভাই খেতে বসলে যে আগে খেয়েচে সেও ঐরূপে ভ্যা ভ্যা করতে থাকত। এখন আমি ভ্যা ভ্যা করতে থাকি, তোরা খা।

প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি :

ঢাকা পোগোজ হাই স্কুলের পণ্ডিত সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য রাড়িখালের অধিবাসী। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পবয়স্কা পত্নী রাখিয়া সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন, মাতা সন্তপ্তা। প্রেমানন্দ দুঃখিত হইয়া বলিলেন: মণি মল্লিকের বড় ছেলে কেশববাবুর সমাজে ঠাকুরকে দেখে এসে বাপকে বলেছিল, বেশ সাধু দেখেচি, আপনি দেখতে যাবেন? তারপর মণি মল্লিক এলে তাঁকে প্রথম দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, তুমিই না অমুকের বাপ?—তোমায় দেখে এই মনে হচ্চে। সেই ছেলেটি মারা গেল!

পরদিন সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীদিগকে বলিলেন: দেখ, এই যুবকদের উৎসাহ দেখে আমার ভারী আনন্দ হচ্চে। ঠাকুর আমাদের কত রসগোল্লা খাইয়েচেন, তবে আমরা তাঁর কাছে গেছি! আর এরা কী পেয়েচে? শুধু বইয়ে তাঁর কথা পড়েচে। এদের কী উৎসাহ, কী আনন্দ! এই রোদে পুড়ে ষ্টেশেন গেছে, নিজেরা সব জিনিস বয়ে এনেচে, খালি পায়ে শুধু মাথায়। আবার নিজেরা রেঁধে খাওয়াচ্চে। কলেরা-রোগীর সেবা করে এরা, নিজেদের মান-অভিমান ভয় সব বিসর্জন দিয়ে। এদিকে লেখাপড়ায় সকলেরই মনোযোগ। এসব দেখে আমার আনন্দ ধরে না। এই দেখতেই ছুটে ছুটে আসি, নাম কিনতে নয়। আমি কী করচি? তিনিই তো সব করে রেখেচেন আমি আসবার আগে। স্বামিজী বলেছিলেন, ঘরে ঘরে তাঁর পূজো হবে, প্রত্যেকে তাঁর ভাব নেবে, তোরা বেরিয়ে পড়্, সর্বত্র তাঁর নাম প্রচার কর্। সেই মহাপুরুষের আদেশে চারদিকে ছুটে বেড়াই। তা নইলে আমি মূর্খ, কী প্রচার করব? এসব দেখে মনে হয় দেহটা তো যাবেই, ঘরে বসে থেকে সময়মত চারটে খেয়ে শরীরটা সুস্থ রাখলে আর কী লাভ হবে? একটু কষ্ট করে এলে যদি আমায় দেখে এদের উৎসাহ ভক্তি বিশ্বাস বেড়ে যায় তা হলে আমার না হয় একটু কষ্ট হলই। এতটুকু পালকিতে চড়ে আসা, বেলা তিনটায় খাওয়া, রাত্রে অনিদ্রা, এতে যে কী সুখ তা তো দেখচ। কিন্তু তা হলেও, ঠাকুর-স্বামিজী যা বলে গেছেন এসব জায়গায় তা প্রত্যক্ষ দেখচি, আর ধন্য হয়ে যাচ্ছি! এসব তলিয়ে দেখ, তা হলেই তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস

আপনা আপনি আসবে। সর্বদা বসে ধ্যান করা কি সোজা কথা? মঠের কয়েকজনের বসন্ত হওয়ায় গঙ্গার ধারে একটি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে তাদের রেখে ভাত পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেরে গেলে ওখানেই তাদের ধ্যান-ধারণা করতে বলা হল। কিন্তু কিছুদিন বাদে তারা বলে পাঠাল—প্রথমে ভেবেছিলুম নির্জনে খুব ধ্যান করব, এখন এমন হয়েচে যে আর কিছুদিন এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব।

বিনোদেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন ঃ

১লা মে অপরাহ্নে উৎসবক্ষেত্রে একটি জনসভায় এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভাপতিরূপে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম তাঁহারই ভাষায় নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

"ধর্মকথা শুনতে যাঁরা আসেন তাঁরা কেউ যে ধর্ম নিয়ে যেতে পারেন না তার কারণ, তাঁরা উপযুক্ত পাত্র নন। ফুটো কলসীতে যেমন জল নেওয়া যায় না, অসংযমী ব্যক্তিও তেমনি ধর্ম ধারণ করতে পারে না। অধিকাংশ লোকই ফুটো কলসী—তাদের নয়টা দরজাই খোলা, নয়টাই ফুটো। যা শুনে, ঐ ফুটো দিয়ে সব বেরিয়ে যায়।

"আর ধর্মলাভের ইচ্ছা নিয়েই বা কয়জন আসেন। এই যে উৎসবে এত লোক জড় হয়েচেন, এদের অধিকাংশই হুজুগে মেতে এসেচেন। উৎসবে গিয়ে ধর্মলাভ করব, এ ভেবে আর কয়জন এসেচেন? সবাই দিতে চান, নিতে কেউ চান না।

"যেমন শ্রোতা, তেমন বক্তা। বিষয়ীরা সব ধর্মবক্তা হয়ে বসেচেন। ধনসম্পত্তি ও মানযশে যাঁরা মজে আছেন তাঁরা ধর্মের উপদেষ্টা কেন হবেন? এখনকার অনেক লোকেই ধর্ম সম্বন্ধে অমুক অমুক বাবুর আইডিয়েলের নজির দেন। বিষয়ী লোকদের আবার ধর্ম সম্বন্ধে আইডিয়েল! ঠাকুর আর স্বামিজী দূরে পড়ে রইলেন, নজির হলেন কিনা অমুক অমুক বাবু—যাঁরা কামকাঞ্চনের কীট, যাঁরা বিষয়ের দাস। বিষয়ীরা ধর্মবক্তা হয়েই তো এই অধঃপাত।

"এই সভায় আজ বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বালোচনা হল। সে তো খুব উঁচু কথা। সে কি আর সাধারণ লোক বুঝে? যাঁদের দেহবুদ্ধি একটুও আছে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের ভাব বুঝতে পারবেন না। যাঁরা কামকাঞ্চনের দাস তারা কী করে আর রাধারাণীর ভাব বুঝবেন? অত উঁচু কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

বিষয়ী বিষয়ের উপদেষ্টা হবেন, ধর্মের উপদেষ্টা হবেন না। দক্ষিণেশ্বরের বাগানের উত্তরে সরকারী বারুদখানা আছে। ঠাকুরের সময়ে সেখানে অনেক শিখ-সিপাহী থাকত। ঠাকুর মাঝে মাঝে তাদের ওখানে গিয়ে ধর্মকথা বলতেন। একদিন সঙ্গে ছিলেন নারায়ণ শাস্ত্রী। ধর্মকথা হচ্ছে, এমন সময় মাঝখানে শাস্ত্রী মশায় কী উপদেশের কথা বলতে যাচ্ছিলেন। অমনি শিখদের সর্দার চোখ লাল করে গর্জে উঠল—'ক্যা, গৃহী হোকে ধরম বাৎলানে আয়া!'...

"আমাদের উপযোগী ধর্মের কথা বলে গেছেন স্বামিজী। এ যুগে আমাদের আদর্শ হচ্চেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের কথা ছেড়ে দিন। লোকে আগে স্বামিজীকে বুঝুক। তাঁর ভাব ধারণা করুক। তাঁকে না বুঝলে ঠাকুরকে বুঝবার সাধ্য নেই।...

"স্বামিজী পবিত্রতার আধার ছিলেন, আর তিনি ছিলেন বীর। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে পবিত্র হতে হবে, বীর হতে হবে। কায়মনোবাক্যে পবিত্র হতে হবে, আর স্বামিজীকে অনুসরণ করে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে।...

"আমাদের হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। স্বামিজীর ভিতর হিংসাদ্বেষের লেশমাত্র ছিল না। তাঁর নিকট হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীষ্টান সব সমান আদর পেতেন। তাতেই তো বিশ্বব্যাপী তাঁর প্রভাব। অন্য ধর্মের উপর দ্বেষ রাখা ভাল নয়।...

"আমরা হিন্দু মুসলমান দুই ভাই। খুব নিষ্ঠার সহিত এবং অন্যের উপর দ্বেষ না রেখে আমাদের যার যার ইষ্ট ভজন করা কর্তব্য। ঠিক ঠিক ভজন হলে আমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে। তখন বুঝব সবই এক।

"আমি আর কী বলব, সর্বশেষ একটা কথা বলি—একটু ভালবাসতে

শেখা উচিত আমাদের। প্রীতিই সার, প্রেমই পরম পদার্থ। শুধু স্বার্থ নিয়ে বসে থাকলে কী হবে? অপরকে ভালবাসতে শিখতে হবে। ঠাকুরের কৃপায় সকলের মঙ্গল হোক!"

যোগেশ ঘোষ বলেন: রাড়িখালে বাবুরাম মহারাজ সাত আট দিন ছিলেন। তিনি নদীকে ভয় করিতেন; রওনা হইবেন ঠিক হইয়াছে এমন সময় মেঘ ডাকিয়া উঠিল, সেদিন আর যাওয়া হইল না। এইভাবে তাঁহাকে দুইএক দিন অধিক আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। যখন রাড়িখাল ছাড়িয়া যাইবেন—পালকিতে করিয়া ভাগ্যকুল পর্যন্ত দেড় মাইল পথ যাইতে হইবে—দুইতিন শত লোক, আবালবৃদ্ধবনিতা, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনিও চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন ও আমাদিগকে বলিলেন, ওদের থামতে বল্, আমার বড় কষ্ট হচ্চে। পালকির সঙ্গে ছুটিয়া আমরাও ভাগ্যকুল গেলাম ও ষ্টীমারে উঠিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিলাম। এদিকে ষ্টীমার বিদায়কালীন শিটি দিতেছে। বলিলেন: ওরে, তোরা নেবে যা, নেবে যা, জাহাজ ছেড়ে দেবে, কাঁদবি নি। তোরা যা ইচ্ছা তাই করিস, শুধু দিনে রাত্রে একবার ঠাকুরকে মনে করিস, তাতেই তোদের হবে—আমাদের ঠাকুর এত বড়!

বাড়িখালে প্রেমানন্দ পাপি-তাপি-নির্বিশেষে সকলকে প্রেম দান করিয়াছিলেন। সেই প্রেম বুকে নিয়া তাহারা তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিল; বিদায়কালীন দৃশ্যে তিনি স্বয়ং অভিভূত হন। জনৈক ভক্তকে মঠ হইতে তিনি লিখিলেন: 'আমায় ব্রজের কথা, নদীয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।'

বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে বাবুরাম মহারাজ ভীষণ কলেরারোগে আক্রান্ত হন। দুইজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসা সত্ত্বেও অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে, তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন।

যখন সকলে তাঁহার জীবনের আশা প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন ও বিষন্নমুখে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—ভয় নাই, এ দেহ এখন যাবে না, জননী জীবিতা। ঠাকুর তাঁহার জননীকে বর দিয়াছিলেন তিনি সন্তানশোক পাইবেন না।

রোগমুক্ত হইবার পর বাবুরাম মহারাজ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পুরী যান, সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। প্রায় তিনমাস পুরীবাস করিয়া তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন (১৬ই সেপ্টেম্বর)।

মহারাজের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ-পরিভ্রমণ

"ঢাকা ও ময়মনসিংহের ভক্তগণের আগ্রহে ও আমন্ত্রণে বাবুরাম মহারাজ ও অপর নয়জনকে[১] সঙ্গে নিয়া মহারাজ একবার পূর্ববঙ্গ-পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন (জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬)। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ তিনি কামাখ্যা-মহাপীঠে আসেন, এবং তথায় ত্রিরাত্র বাস ও কুমারীপূজাদি ক্ষেত্রকর্মসকলের অনুষ্ঠান করেন।...

"কামাখ্যাধাম হইতে ময়মনসিংহ শহরে শুভাগমন করিয়া তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য জিতেন্দ্র দত্তের গৃহে পাঁচদিন অবস্থান করেন। এখানে ব্রহ্মপুত্রতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়া, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে!

"ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় আসিয়া ৯ নম্বর ট্রেনিং কলেজ রোডে অবস্থিত কাশিমপুরের জমিদারবাটীতে দুই সপ্তাহ বাস করেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর সপরিকর কাশিমপুরে চলিয়া যান।

---

[১] শঙ্করানন্দ, অম্বিকানন্দ, হরিহরানন্দ, দুর্গানন্দ, মাধবানন্দ, চিদানন্দ, ব্রহ্মচারী বিনোদ, পুঁটিয়ার বিভূতিভূষণ মৈত্র, ঢাকার বীরেন্দ্র বসু।

তখনকার দিনে জয়দেবপুর ষ্টেশন হইতে কাশিমপুর পর্যন্ত তিন ক্রোশ পথ হাতীর উপর চড়িয়া যাইতে হইত, মহারাজের সম্মানার্থে ঐ পথের স্থানে স্থানে বৃহৎ তোরণসমূহ নির্মিত হইয়াছিল। কাশিমপুরে তিনচারি দিন থাকিয়া ঢাকা হইয়া তিনি নারায়ণগঞ্জে আসেন ও দুই দিন তথাকার পাট-ব্যবসায়ী ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর গৃহে অবস্থান করেন। নারায়ণগঞ্জের অদূরে দেওভোগ গ্রাম মহাতপা নাগ মহাশয়ের জন্মস্থান; সংকীর্তন-দলের সঙ্গে পদব্রজে মহারাজ দেওভোগ গিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে যাত্রা করিয়া তিনি সদলবলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।"[১]

বাবুরাম মহারাজ সকল সময়েই ভক্তদেব কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। ব্রহ্মপুত্রতীরে মহারাজ যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন তখন তিনি সঙ্গে আগত ছেলেদিগকে মহারাজকে প্রণাম করিতে বলেন এবং তাহাদের জন্য মহারাজের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। মহারাজ বলিয়াছিলেন, ছেলেদের অনেকে দেবতা হয়ে যাবে।

ময়মনসিংহে তাঁহাদের অবস্থান সময়ে "প্রত্যহ প্রাতঃকালে নীরদ মহারাজ (অম্বিকানন্দ) মধুরকণ্ঠে ভজন গাহিতেন, সেই গানের আসরে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন, আর ঘরের ভিতরে ও বাহিরে, দাঁড়াইয়া ও বসিয়া, বহুলোক ভজনানন্দের এই দুই ঘনীভূত বিগ্রহ দর্শন করিতেন। স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে দ্বিতীয় দিন বিকালে এক সভা আহূত হয় ও সেই সভায় বাবুবাম মহারাজ গল্পচ্ছলে কিছু উপদেশ করেন।"

ময়মনসিংহে ঐ সময়ে মতিলাল বিশ্বাস ও তাহার ছাত্রগণের সমবেত উদ্যোগে ও কায়িক পরিশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়। সন্ধ্যার পর সদলবলে আসিয়া মহারাজ এই গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন (২৩ শে জানুয়ারী)।

"বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর দুইখানি ফটো সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল,...মহারাজ বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—

১। 'ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা' হইতে।

দেখচ বাবুরামদা, ঠাকুর বসে আছেন! আমিই ঠাকুরের আরতি করব। ...পূজার আসনে বসিয়া মহারাজ ধ্যানস্থ হইলেন এবং ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, ঘন্টা ও পঞ্চপ্রদীপ-হস্তে আরতি করিতে লাগিলেন। ঘন্টার মৃদুমধুর ধ্বনি উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরময় একটা ভাবতরঙ্গ বহিয়া যাইতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া নাচিতে লাগিলেন। যাহারা আশেপাশে ছিল তাহাদের সকলের অঙ্গে, হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, নৃত্যের ভঙ্গিমা দেখা দিল—সকলের মধ্যেই ভাবটি সংক্রমিত হইয়াছে! আরতি-অন্তে মহারাজ হলঘরে আসিয়া বসিলেন; তাঁহার অনুমতি লইয়া বাবুরাম মহারাজ স্বামিজীর কর্মযোগ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন।"[১]

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত বলেন ঃ

ময়মনসিংহ হইতে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ যখন ঢাকায় আসেন, কলমা হইতে ছেলেদিগকে নিয়া আমরা পঁচিশ জন ঢাকায় যাই ও অধিক রাত্রে কাশিমপুরের জমিদারবাড়ীতে পৌঁছি। আমাদিগকে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ডাক্ সতীনকে, সাধু আনা চারটিখানি কথা ?—এবার পঁচিশ জনকে খাইয়ে দিক্।' সতীন্দ্র আসিয়া বলিলেন, পঁচিশ জনকে কেন, আমি এখন একশ জনকেও খাইয়ে দিতে পারি। শুনিয়া তিনি খুশী হইলেন, রান্না হইয়া যতক্ষণ আমাদের খাওয়া না হইল ততক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

ঠাণ্ডা লাগিয়া মহারাজের অসুখ হইয়াছে, বাবুরাম মহারাজ বলিলেন,—দেখচ কলির কী প্রভাব! মহাপুরুষ এসেচেন, লোকে দেখে উদ্ধার হয়ে যাবে, কলি দেখতে দিচ্চেন না, অসুখ করিয়ে দিলেন!

আমাদের ছেলেরা ফিরিয়া যাইবে, স্কুল আছে। তাহাদিগকে বলিলেন, দরজায় দাঁড়া, বিশ্বরঞ্জন যখন অন্যমনস্ক হবেন তখন ঢুকে পড়বি। বিশ্বরঞ্জনের কড়া পাহারার জন্য তাহারা ভিতরে যাইতে পারিল না। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, দূর্ তোরা কিছু না, আয় আমার সঙ্গে। তিনি অন্য দরজা দিয়া

১। 'ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা' হইতে।

তাহাদিগকে মহারাজের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, মহারাজ, এরা কলমা স্কুল থেকে এসেচে, তুমি চুপ করে থাকবে, এরা তোমায় প্রণাম করে যাবে। মহারাজ নিজের মুখে তর্জনী ঠেকাইয়া বলিলেন, হাঁ, এই আমি চুপ। সুরেন প্রণাম করিলে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, এ ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়, এর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। মহারাজ তাহাই করিলেন। আমার ভাইপো হিতেনকে বলিলেন, তুই বুঝি ক্লাশের লাষ্ট্ বয়, আয় তোর মাথায়ও হাত বুলিয়ে দি। সত্যই হিতেন পড়ায় ভাল ছিল না।

অবনীমোহন গুপ্ত লিখিয়াছেন ঃ

১৪১৪, একদিন স্কুলের ছুটির পর। মোহিনীবাবুর বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিলাম, একজন অত্যন্ত ফর্সা ব্যক্তি, যাঁহার দেহের কান্তি তাঁহার গেরুয়া বস্ত্রের রঙের সহিত মিশিয়াছে, মুখে অত্যন্ত শান্ত ভাব, উপরতলায় একটি বড হলঘরে গিয়া বসিলেন।...আমরা একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে বড এলাচেব দানা ও কাবাবচিনি দিলেন। কাবাবচিনি পূর্বে কখনও দেখি নাই। তিনি বহস্য করিয়া বলিলেন, কে বলছিল এগুলো লেজওয়ালা গোলমরিচ! তিনি এলাচের খোসাগুলি জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেন। দেখিলাম ঐ কালে তাঁহার সাবলীল দ্রুত এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক গতি। দেখিলাম তাঁহার সুন্দর মূর্তি, কপালে চিন্তার রেখামাত্র নাই, উহা প্রশস্ত এবং প্রশান্ত। মাথার চুল মিশকালো।...মনে হইল—এই একজন কিশোর বালক, বৃদ্ধ বয়সেও মল্লিকাফুলের মত নির্মল।

আর একদিন তাঁহাকে দেখি একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রার পুরোভাগে। ঐ শোভাযাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের একখানা বীরবেশের বড় প্রতিকৃতি ছিল। আমি উয়ারী হইতে নবাবপুরের দিকে যাইতেছিলাম, শোভাযাত্রাটি বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। দেখিলাম লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ীর নিকট উনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া।

তৃতীয় দর্শন ঢাকা কলেজ হোষ্টেলের ডাইনিং রুমে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।...খুব ধূপধূনা দেওয়া ও খানকতক চেয়ার পাতা হইল। অনেক

ছেলে মিলিয়া আমরা মেজেতে বসিলাম। কলেজের দুইএক জন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন—অঙ্কের অধ্যাপক বি-এম সেন এবং অর্থনীতির অধ্যাপক উইলিয়াম প্রভৃতি। কোন স্বামিজী (মাধবানন্দ) ইংরাজীতে ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল স্বামী প্রেমানন্দের বাঙ্গলায় কয়েকটি কথা। ব্রহ্মচয পালন করিলে, বীর্যধারণ করিলে মেধাবী হওয়া যায়। ঐরূপ, কেবল ঐরূপ হইলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হয়, অন্যথা হয় না। যেমন ফটোগ্রাফের নেগেটিভে কেমিক্যাল্‌স্ মাখা থাকিলে যে ছবি পড়ে তাহা ফিক্‌স্ করিলে স্থায়ী হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য পালন করিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা স্থায়ী হয়।

ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে উপদেশ সেদিন আমরা শুনিলাম তিনি আমাদিগকে তাহা ধারণা করিতে বলিলেন।...লেখকের মনে সংশয় উদিত হওয়া মাত্র তিনি যেন টের পাইলেন, এবং যে চেয়ারে বসিয়া ধীরে ধীরে কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতেই সোজা হইয়া বসিলেন এবং খুব জোরের সহিত বলিলেন যে, উহা (ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া) সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব —যে চেষ্টা করিবে তাহারই হইবে। এরূপ চকিতে এবং দৃঢ়তার সহিত ঐ কথা বলিলেন যে, তাহাতে লেখকের হৃদয়ের উপর যেন একটি হাতুড়ির ঘা পড়িল।

তারপর সেই সময়কার যুবকগণের রাজনীতিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও অদূরদর্শিতার জন্য আক্ষেপ করিলেন। বলিলেনঃ এদেরই বা দোষ কী ? কেউ কি এদের ডেকে বলেচে, ওরে তোরা সচ্চরিত্র হ', একটু বিনয়ী হ' ? যেন রাজনৈতিক বন্ধন অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভোগবাদের মোহপাশ ছিন্ন করাই তখনকার মত বড় কাজ, এই ভাব দেখাইয়া খুব জোর দিয়াই বলিলেন, ছিঁড়ে ফেল মোহের বন্ধন।

ঢাকায় আসিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়ায় মহারাজ কয়েকদিন বাহিরের লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন নাই; বাবুরাম মহারাজই তাহাদিগকে

ঠাকুর-স্বামিজীর জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন ঃ স্বামিজী পাশ্চাত্যে ঠাকুরকে প্রচার না করে বেদান্ত প্রচার করলেন। আমার তখন একএক বার মনে হত, যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে ঠাকুরের অভিন্নতা দেখিয়ে—যীশুখ্রীষ্ট ঠাকুরের দেহে লীন হয়েছিলেন, তারা ঠাকুরকেই নিক, এইভাবে—প্রচার করলে ভাল হত। পরে বুঝলুম স্বামিজীই ঠিক করেচেন।[১]

প্রত্যহ সকালে দুইতিন ঘণ্টা এবং বিকাল তিনটা হইতে পাঁচ ঘণ্টা সমবেত ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া বাবুরাম মহারাজের দেহ অবসন্ন হয় ও বায়ু চড়িয়া অনিদ্রা হইতে থাকে। রাত্রে শয়নের পূর্বে পায়ের তলায় সরিষার তেল মালিশ করার ফলে এই অনিদ্রার উপশম হয়।

পতিত তাপিত লোকদের প্রতি মহারাজের করুণা উদ্রিক্ত করিবার জন্য একদিন প্রাতঃকালে পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, স্বামিজী ছিলেন অধমতারণ পতিতপাবন। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ উত্তর দিলেন, আমিও অধমতারণ পতিতপাবন! ইহার পরে মহারাজ কাশিমপুরে যান এবং কাশিমপুরের পুত্রশোকাতুর জমিদার সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়কে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করেন। অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বাবুরাম মহারাজ সারদাপ্রসাদবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন, আর ময়মনসিংহের জিতেনবাবুকে বলিলেন, আজ একটা বিল্বমঙ্গল অভিনয় হল!

যদুনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন ঃ

একবার বাবুরাম মহারাজকে দেখা বিদগাঁয় ঠাকুরের উৎসবে; আর একবার দেখা নারায়ণগঞ্জে চৌধুরীদের বাড়ীতে।...সেদিন দুপুরের পরে, ঢাকার ছেলেদের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে, 'জয় গুরু মহারাজ' ধ্বনিতে শহর কাঁপাইয়া যখন তাঁহারা আসিলেন তখন তাঁহার কী আনন্দ!

১। অতুলচন্দ্র চৌধুরী-কথিত।

আমাদের সকলকে একত্র করিয়া বসিলেন ও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন ঃ দেখ্, মহারাজ তোদের একটা কথা বলতে বড় সঙ্কোচ বোধ করেন —সে ঠাকুরের কথা। ঠাকুরকে ভাবতে বল্লে কোন সাম্প্রদায়িকতা হয় না, তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতার জমাটবাঁধা মূর্তি। জগতে যত প্রকার অবতার-বিগ্রহ হয়েচে, তিনি সকলের সমষ্টিভূত।

তারপরে সকলে মিলিয়া দেওভোগ যাত্রা করিলেন। বাবুরাম মহারাজ নাগ মহাশয়ের সমাধিগৃহে প্রবেশ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপরে পুকুরে হাতমুখ ধুইয়া মহারাজের নিকট বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, নাগভূমির বৃক্ষপত্রাদি কেমন দেখচেন? মহারাজ বলিলেন, সব ঠিক। নাগাঙ্গনে সন্ন্যাসী ও ভক্তেরা মিলিয়া নাম-সংকীর্তন আরম্ভ কবিলেন—'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।' বাবুরাম মহারাজ বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে মহারাজকেও নাচিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহারাজ নৃত্যের উদ্যম করিতেই স্থির হইয়া গেলেন, তাঁহার ভাবসমাধি দেখিয়া ভক্তেরা বিচলিত হইলেন।

চট্টগ্রাম যাইবার কথায় বাবুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, তুই তার করে দে, আমি যাব। আবার যখন ভক্তেরা বলিলেন, 'আপনার শরীর খারাপ হয়েচে, এবার গিয়ে কাজ নাই', তখন তিনিও নিরস্ত হন। তাঁহার শরীরের রং তখন কালো হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন অসুখ দেখি নাই। পরদিন দুপুরের ষ্টীমারে তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করেন (২৪শে ফেব্রুয়ারী)।

মিহিজামে, কাশীতে, মেদিনীপুরে

মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরে বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ কয়েকদিনের জন্য মিহিজাম গমন করেন (১৯১৬)। সেখানে ভক্তেরা উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, স্থানীয় সাঁওতালদিগকে ভূরি-ভোজন করাইয়া তাহাদের প্রত্যেককে একমাথা তেল ও দুইএক পাতা দোক্তা তামাক দেওয়া হইয়াছিল।

এই বৎসর দুর্গাপূজার অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অনিয়মে বাবুরাম মহারাজের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, তিনি অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইতে থাকেন। নভেম্বর মাসে, কালীপূজার পর, তিনি ও মহাপুরুষ কাশী যান ; পথে মিহিজামে নামিয়া একদিন অবস্থান করেন।

বাসুদেবানন্দ লি'খয়াছেন ঃ

চন্দননগরের ভূষণবাবুদের বাড়ীতে আমরা উঠিলাম, পরদিন রাত্রের গাড়ীতে যাওয়া হইবে। সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে মহাপুরুষ ও বাবুরাম মহারাজ মিহিজাম ষ্টেশনে আসিলেন। সেখানে এক খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে দেখা, তিনি মহাপুরুষের পূর্বপরিচিত। দুইজনে করমর্দন করিলেন, বাবুরাম মহারাজ নমস্কার করিলেন। মিশনারী ভদ্রলোক বেশ বাংলা জানেন। কথাবার্তা হইতে লাগিল।

মহাপুরুষ। বাইবেলে বিশ্বাস, ভালবাসা, ত্যাগ—এই তিনটি খুব ভগবান দেখিয়েচেন। এসব আমাদের শাস্ত্রেও আছে।

মিশনারী। আমি উপনিষদ পড়েচি, তাতে ঐসব কথাই আছে ; কিন্তু প্রভু খ্রীষ্টের জীবনে সেগুলো যেরূপ অভিব্যক্ত—বিশ্বাস-ভালবাসা-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা—এরূপ জগতে আর কখনো দেখা যায় নি।

বাবুরাম মঃ। গঙ্গার ধারে কিছুদিন পূর্বে একজন রামকৃষ্ণ নামে সাধু ছিলেন, জানেন ?

মিশনারী। তাঁর নাম ও তপস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেচি। তবে ভাল করে তাঁর সম্বন্ধে আমি অধ্যয়ন করি নাই।

বাবুরাম মঃ। একবার পড়ে দেখবেন। ওই ওরই আর এক রূপ।

মহাপুরুষ। বাইবেলে জ্ঞানের কথাও আছে, যেমন সেণ্ট জনে শব্দব্রহ্ম-তত্ত্ব। আবার খ্রীষ্ট নিজেকে পরম পিতার সঙ্গে এক করেচেন, সকলকে তাঁর মতো পূর্ণ হতে বলচেন। তবে পিতৃভাব, দাস্যভাবটাই খুব প্রকট।...

মিশনারী। তিনি শুধু নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি, সকলেরই পূর্ণত্ব স্বীকার করেচেন।...খ্রীষ্টান সেণ্টদের মধ্যে কেউ কেউ ওয়ার্ড্‌কে (শব্দব্রহ্মকে) মাতৃভাবে উপাসনা করেচেন। বেবী ক্রাইষ্টের বাৎসল্যভাবের উপাসনাও আছে। মধুরভাবের উপাসনাও খুব পরিস্ফুট দেখা যায়। আপনারা বোধ হয় রসেটির মেরী ম্যাগডেলেন পড়েচেন? 'O loose me! Seest thou not ...ইত্যাদি। তার অনুবাদ—

তোমবা ছাড়িয়া দাও মোরে।
দেখিছ না, প্রিয়তম-মুখখানি সম্মুখে আমাব
আমারে করিছে আকর্ষণ!
তাহার চরণ তরে তৃষ্ণার্ত চুম্বন, চঞ্চল কুন্তলদাম,
নয়নের অশ্রুধারা আজি মোর মাঙিতেছে সে যে!

... ...

সে যে মোরে চায়, তার প্রয়োজন মোরে।
সকরুণে ডাকিছে আমায়, সে যে মোরে ভালবাসিয়াছে।
তোমরা যাইতে দাও মোরে।

বাবুরাম মঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসব হিন্দু আইডিয়া। তবে এ সকলেরও পরাকাষ্ঠা আমাদের চণ্ডীদাসে আছে—

তরুণ মুরলী করিল পাগলী রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইনু কী করিবে দোসর পরে॥

বাবুরাম মহারাজের অনুরোধে হরি মহারাজ এই সময়ে আলমোড়া হইতে কাশীতে আসেন। তিন গুরুভ্রাতার মিলনে দিনগুলি তাঁহাদের আনন্দেই কাটিতে লাগিল। জলবায়ুর গুণে বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্যেরও কিছুটা উন্নতি হইল। কিন্তু তিনি অধিকদিন এখানে থাকিতে পারিলেন না; কাজের তাগিদে, স্বামিজীর জন্মতিথির পূর্বেই তাঁহাকে মঠে ফিরিতে হইল (১৪ই জানুয়ারী, ১৯১৭)। কয়েকদিন পরে পরে হরি মহারাজ এবং মহাপুরুষও মঠে আসিলেন।

এই বৎসর ঠাকুরের উৎসবে যোগদান কবিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ মেদিনীপুরে গমন কবেন (৩রা মার্চ, ১৯১৭)। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন অক্ষরানন্দ, বরদানন্দ, উমানন্দ ও ব্রহ্মচারী যতীশ (রামানন্দ)। বরদানন্দ বলেন ঃ মেদিনীপুবের উৎসবে একদিন দবিদ্রনাবারণ-সেবা হইল। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, চল্ নারায়ণসেবা দেখে আসি। তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছি, ভক্তেরাও আছেন, মনে হইল সেবা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। দেখিলাম দুই হাত দিয়া নিজেব দুই বাহুমূল টিপিয়া টিপিয়া শরীবে মন আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। নানা রকমের নোংরা লোক বসিয়া আহার কবিতেছে, তিনি ঐরূপ একজনের পাত হইতে দুইএক দানা তুলিয়া নিজের মুখে দিলেন। আমবা 'করেন কী, কবেন কী?' বলিয়া বারণ করায় বলিলেন, নাবায়ণের প্রসাদ!

পূর্ববঙ্গে শেষবার

কলিকাতাস্থিত কোচবিহার প্যালেসের ওভারশীয়ার, শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর শিষ্য শৌর্যেন্দ্র মজুমদার টাঙ্গাইল মহকুমার ঘারিন্দা গ্রামের অধিবাসী। নিজের দেশে ঠাকুরের একটি মহোৎসব করিতে অভিলাষী হইয়া শৌর্যেনবাবু শরৎ মহারাজের সহিত দেখা করেন। শরৎ মহারাজ বলেন,—আমার যাওয়া অসম্ভব। তোমরা বরং বাবুরামদাকে ধর; পূর্ববঙ্গে তিনি আগেও অনেকবার গিয়েচেন, পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁর বিশেষ টানও আছে। বাবুরাম মহারাজ শুনিয়া বলিলেন, বেশ বেশ, অবশ্যই যাব, উৎসবের ব্যবস্থাটা ভাল করবি তো?

উৎসবের প্রাথমিক আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পর শৌর্যেনবাবু বাবুরাম মহারাজের সহিত আবার দেখা করিলেন। বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরঘরে গিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—আমার যাওয়া হবে না, ঠাকুর মানা করলেন। তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমাদের একপাও বাড়াবার ক্ষমতা নেই! তোমরা সকলে ঠাকুরের নিকট তোমাদের প্রার্থনা জানাও, যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তো পরে যাব। এই ঘটনার এক বৎসর পরে তিনি ঘারিন্দায় শুভাগমন করেন, কৃষ্ণলাল মহারাজ, বরদানন্দ, ব্রহ্মচারী যতীশ (রামানন্দ), নীরদ সান্যাল (অখিলানন্দ) প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া (২৯শে এপ্রিল, ১৯১৭)

তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে টাঙ্গাইল যাওয়া সহজ ছিল না। সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত রেলগাড়ীতে গিয়া, তথা হইতে ষ্টীমারে পোড়াবাড়ী এবং পোড়াবাড়ী হইতে টাঙ্গাইল শহর পর্যন্ত আট মাইল রাস্তা পদব্রজে, পালকিতে অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইত। ঘারিন্দা টাঙ্গাইলের দুই মাইল ব্যবধানে, পূর্বদিকে। বাবুরাম মহারাজ পোড়াবাড়ী ও টাঙ্গাইলের মধ্যপথে আলিসাকান্দা গ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য মন্মথনাথ রায়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্নকালীন আহার ও বিশ্রাম করেন।

আলিসাকান্দা হইতে তাঁহাকে পালকিতে ও অন্যান্য সকলকে ঘোড়ার গাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। টাঙ্গাইল হইতে এক সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া আসে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহীরা 'স্বাগতম্'-লেখা এক বৃহৎ পতাকা ধারণ করিয়া বসিয়াছিল এবং বিশপঁচিশ খানা খোল ও করতাল সহ গায়কদল অভ্যর্থনাসঙ্গীত গাহিতেছিল। উহা নিকটে আসিবামাত্র বাবুরাম মহারাজ পালকি হইতে নামিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি অবশিষ্ট রাস্তা হাঁটিয়া যাইতে চাহিলেও ভক্তেরা হাঁটিয়া যাইতে দিলেন না, রাত্রি আটটায় তিনি ঘারিন্দায় পৌঁছিলেন। পথে টাঙ্গাইল কালীবাড়ীতে বিশ্রাম ও বিগ্রহ-দর্শনাদি করিয়াছিলেন।

পরদিন সকালে তিনি একাই বেড়াইতে বাহির হন। অনেক বেলায় ভক্তেরা গ্রামস্থ এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া দেখেন, তিনি সেখানে বসিয়া ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিতেছেন। উক্ত ভদ্রলোককে উৎসবের উদ্যোক্তারা বর্জন করিয়াছিলেন, কারণ, ঠাকুরকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া মানিতেন না, ঠাকুরের কোন পার্ষদকে ঘারিন্দায় আনায়ন করা সম্বন্ধেও বিরূপ মন্তব্য করেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরাই শুধু ঠাকুরকে চিনেচ! ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিত্য নারায়ণসেবা হয়, তাতে কি ঠাকুরেরই সেবা হচ্চে না? যাও, এখনই ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে এখানে নিয়ে এস। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি হঠাৎ ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় গ্রামান্তর হইতে এক বৃহৎ কীর্তনের দল আসিয়া ঘারিন্দার জমিদার যোগেশগোবিন্দ মজুমদারের বাড়ীতে নামগান করিতে আরম্ভ করে। বাবুরাম মহারাজ বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া শুনিতে-ছিলেন, হঠাৎ কীর্তনের দলে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে থাকেন। কীর্তন খুব জমিয়া গেল।

পরদিন মহোৎসব। যোগেশবাবুর সুপ্রশস্ত অঙ্গনে পূজামণ্ডপ নির্মিত ও পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়াছে। কৃষ্ণলাল মহারাজ ষোড়শোপচার পূজা,

হোমাদি সুসম্পন্ন করিলেন। উৎসবের বিরাট আয়োজন ও বিপুল জনসমাগম দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ হৃষ্ট হইলেন এবং কোমরে চাদর বাঁধিয়া নিজেই সকল বিষয় পরিদর্শন করিতে ও জয়ধ্বনি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সন্ধ্যায় ভক্ত ও সেবকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক মানপত্র প্রদান করা হইলে সকলকে তিনি আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন।[১]

পরদিন সকালবেলা পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসেন। এক বিধবা ব্রাহ্মণী চরণস্পর্শ করিবামাত্র তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পা ধুইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, উক্ত বিধবা এক বিধর্মীর সহিত বিবাহিতা হইয়াছে।

বিকালবেলা তিনি একমাইল দূরবর্তী শিবপুর গ্রামের তালুকদার ভৌমিকদের বাড়ী যান, প্রকাণ্ড দলবল নিয়া। ভৌমিকবাড়ীতে সেদিন একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, সাধু-ভক্তেরা সকলেই তাঁহাদেব সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।[২]

দুর্গানাথ চক্রবর্তী টাঙ্গাইল হাসপাতালের ডাক্তার। সাধু ও ভক্তদিগকে সাথে নিয়া বেড়াইতে বেডাইতে বাবুবাম মহারাজ তাঁহার বাসায় গিয়াছিলেন অন্য একদিন বিকালবেলা। সেখানে একটি আলোচনাসভার মত অনুষ্ঠান হয়। রাত্রে ডাক্তারবাবু শুধু ডাল ও রুটি খাওয়াইলেন সকলকে। ফিরিয়া আসিতে আসিতে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ডাক্তারবাবু কী সেবাটাই করেচেন! ভক্তেরা কিন্তু সেবার কোন বিশেষত্বই দেখিতে পান নাই।[৩]

১। মানপত্রখানি আঁাটপুবে আছে।

২। এই ভৌমিক পবিবাবেব আটজন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবাণীর মন্ত্রশিষ্য। মায়ের শিষ্যা সোহাগিনী ভৌমিক 'একলা নিতাই'-এব সেবিকারূপে নবদ্বীপে বাস করিতেন। ১৯৪২ সালে নবদ্বীপে থাকিষা লেখক যখন 'বাঙ্গলার দুই ঠাকুব' প্রণষন করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার স্নেহযত্ন প্রাপ্ত হন।

৩। বঙ্কিম সেন-কথিত।

একদিন এক অনুন্নত শ্রেণীর স্ত্রীলোক নিজ বাড়ীর আমগাছ হইতে একটি ছোট পাকা আম মাটিতে পড়িয়াছে দেখিয়া কুড়াইয়া লন, এবং উহা হাতে করিয়া বাবুরাম মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, এটি আমার গাছের নূতন ফল, আপনার জন্যে এনেচি ![1]

উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা নীলকান্ত চক্রবর্তী নিজ বাড়ীতে বাবুরাম মহারাজকে লইয়া গিয়া সেবা করিবার বাসনা অন্তরে পোষণ করিতেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতেন না। বন্ধুদের পরামর্শে, সাহসে ভর করিয়া শেষে যখন তিনি বলিতে আসিলেন, বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে, তোর বাড়ী যাব কখন ? নীলকান্তবাবুর চক্ষে জল আসিল। তাঁহার এক বন্ধু জানাইলেন যে, বাড়ীতে টিনের ঘর, গরমে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, কোন চিন্তা নেই, ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন। শেষরাত্রি হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আবহাওয়া স্নিগ্ধ হইয়া গেল, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। মধ্যাহ্নে সপরিকর আসিয়া তিনি ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। সেখান হইতে বাসায় ফিরিবার পথে দেখা গেল, এক দরিদ্র তাঁতি তাহার বাড়ীর সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাবুরাম মহারাজ তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলে সে যে কোথায় বসাইবে, কী করিবে, খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়া তিনি মাটির উপরেই বসিয়া পড়িলেন ও এক কুচি সুপারি চাহিয়া লইয়া চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন !

সন্ধ্যার পর গানের আসর বসিল। সেই আসরে বরদানন্দ উচ্চাঙ্গের কালীকীর্তন ও ভজন শুনাইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, ঠাকুর-স্বামিজীর গান শুনে শুনে এমন হয়েচে যে, অন্য কারো গান কানে লাগে না, তাঁদের গানের সঙ্গে ভাবের বন্যা বয়ে যেত।

ছয় রাত্রি ঘারিন্দায় থাকিয়া সকাল আটটার মধ্যে আহারাদি করিয়া বাবুরাম মহারাজ সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিলেন (৫ই মে)। তাঁহার গাড়ী

১। রামানন্দ-কথিত।

টাঙ্গাইল বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রধান শিক্ষক ঈশান ঘটক তাঁহাকে বিদ্যালয়গৃহে পদধুলি দিয়া যাইতে প্রার্থনা জানাইলেন। তাড়াতাড়ি বিদ্যালয়ে আসিয়া তিনি মেয়েদিগকে সত্ত্বগুণ আয়ত্ত করিতে উপদেশ দিলেন এবং তাহাদিগকে মিষ্টিমুখ করাইবার জন্য ঈশানবাবুর হাতে কয়েকটি টাকাও দিলেন।[১]

পাবনা জেলার সলপ গ্রামের অধিবাসী ভূপেন্দ্র সান্যাল বাবুরাম মহারাজকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে আগ্রহান্বিত ছিলেন, ঘারিন্দায় থাকিতে সেকথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়াও আসিতেছিলেন। উৎসবজনিত ক্লান্তি, বৈশাখের খরা, রাস্তায় বিলম্ব করিতে সঙ্গীয় ভক্তগণের অনিচ্ছা, ইত্যাদি কারণে তিনি সলপ যাইতে চাহেন নাই। পোড়াবাড়ী পৌঁছিয়াও ভূপেনবাবু ক্রমাগত তাঁহাকে সলপ যাওয়ার প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে তিনি বলিলেন, যদি ঠাকুরকে বলে বৃষ্টি আনতে পারিস তবে যাব। ষ্টীমার আসিতে বহু বিলম্ব হইল, জলঝড় হইয়া আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটিল। সেই রাত্রি সিরাজগঞ্জে ডাক্তার শশিধর নিয়োগীর বাসায় অবস্থান করিয়া বাবুরাম মহারাজ পরদিন বিকালের গাড়ীতে সলপ গমন করিলেন।

কলিকাতা হইতে আসিয়া উমেশ সেন সিরাজগঞ্জে বাবুরাম মহারাজের সহিত মিলিত হন ও এই সফরের শেষ পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

ভূপেনবাবু শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য, বাড়ীতে ঠাকুরের সেবাপূজা করেন। তাঁহার বড় ভাই ইহার বিরোধী, এইজন্যই নাকি বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান। ভূপেনবাবুর মা বাবুরাম মহারাজের নিকট তাঁহার এই দুঃখ নিবেদন করিলেন, মহারাজের অনুরোধে বড় ভাই বাড়ীতে আসিলেন। তিনি বাঁয়াতবলায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার ও সুগায়ক স্বামী বরদানন্দের সহযোগে খুব ভজন-

১। ঘারিন্দার উৎসবের বিবরণ নীলকান্ত চক্রবর্তীর লেখা হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত।

কীর্তন হইল, কিন্তু ভদ্রলোক প্রেমানন্দ-প্রেমে ধরা দিলেন বলিয়া মনে হইল না। মহারাজ খুব উত্তেজিতভাবে ভূপেনবাবুকে একচোট বকিলেন ঃ ঠাকুর-স্বামিজী সকলকে ভালবেসে আপনার করেছিলেন, আর তুমি যদি তাঁদের নাম করে আপন ভাইকে পর করে দাও তো ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার ঠাকুরের নাম লওয়া।...

একদিন ভূপেনবাবুর এক জ্ঞাতির বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ হইল। তাঁহাদের একটি ছেলের খুব জ্বর ছিল, সেই ছেলেটিকে বাবুরাম মহারাজ দেখিতে চাহিলেন এবং দেখিয়া 'ভয় নাই, ভাল হবে' বলিয়া আশ্বাস দিলেন। একদিন পার্শ্ববর্তী কানসোনা গ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য সুরেন্দ্র ভৌমিকের বাড়ীতে বেড়াইয়া আসিলেন, সেখানে বিশিষ্ট গায়কগণের কণ্ঠে ভজন খুব জমিয়াছিল।

সলপে পাঁচরাত্রি থাকিয়া বাবুরাম মহারাজ ময়মনসিংহের পথে সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিলেন। সিরাজগঞ্জে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য শ্রীকালীপদ রায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে সকলের সেবা করিলেন। মহারাজ কহিলেন, পেট ভরে খেয়ে নাও, আজ রাত্তিরে আর খেতে পাবে না। স্থানীয় মুন্‌সেফের আহ্বানে মহারাজ তাঁহার ষ্টীমারঘাটের সন্নিকটস্থ বাসায় যান এবং সন্ধ্যার একটু পূর্বে ষ্টীমারে উঠেন। মুন্‌সেফবাবু লুচি-মিষ্টান্নাদি প্রচুর খাবারের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই ষ্টীমারে তুলিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার খোট্টা দারোয়ান ভক্তিভরে পাখা করিয়াছিল, সে প্রণাম করিতেই মহারাজ তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন।

ষ্টীমারে উঠিতেই এক অভিনব ব্যাপার দেখা গেল। ষ্টীমারের হিন্দু কর্মচারীরা আসিয়া ভক্তিভরে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিতেছে, আর তিনিও পরম স্নেহের সহিত তাহাদিগকে মিষ্টান্নাদি খাবারগুলি বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার স্নেহবিগলিত মূর্তি আর তাঁহার হাতের মিষ্টান্ন ষ্টীমারের লোকগুলিকে যেন পাগল করিয়া তুলিল ; হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে যাবতীয় লোক তাঁহার পদধূলি ও একটু প্রসাদ পাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল, আর 'শ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়' 'স্বামিজী মহারাজজী কী জয়' রবে

ষ্টীমারখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। ষ্টীমারের কর্মচারীরা তাঁহার সহযাত্রীদিগকে প্রথম শ্রেণীর ডেকে বিশ্রামের অনুমতি দিলেন। শেষরাত্রে ষ্টীমার যখন জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের নিকটে আসিল তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। ষ্টীমার ভিড়িতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মহারাজ উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এত গম্ভীর যে তাঁহার দিকে তাকানো যায় না।

জগন্নাথগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। ময়মনসিংহে তিনি সদলবলে শ্রীজিতেন্দ্র দত্তের বাসায় উঠিলেন (১২ই মে)। তাঁহার আকর্ষণে বৈঠকখানায় বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। সুপুরুষ এক ভদ্রলোককে এই বৈঠকে দেখিতে পাইতাম। তিনি মৌনীই থাকিতেন, হঠাৎ একদিন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন: আমি সি-আই-ডির লোক, উপরওয়ালার আদেশে একদিন বেলুড় মঠে যাই। গ্রীষ্মকালে দুপুরের রোদে হাঁটিয়া মঠে পৌঁছি এবং অবসন্ন হইয়া বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া পড়ি। মঠ তখন নিঝুম, সকলে বোধ হয় বিশ্রাম করিতেছিলেন। কোথা হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে পাখার হাওয়া করিতে লাগিলেন। আমি তখন এত অবসন্ন যে, কোন আপত্তি করিলাম না। পরে তিনি কিছু প্রসাদ ও পানীয় জল আনিয়া দিলেন। আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম ও পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁহার অজানা ছিল না, তথাপি তিনি আমার এরূপ সেবা করিলেন! কে তিনি জানেন? (বাবুরাম মহারাজকে দেখাইয়া) ইনি, ইনি![১]

এখান হইতে নেত্রকোণা। পঁচিশ মাইল রাস্তা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইবে; প্রত্যুষে রওনা হইয়া সহজেই পনর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া

১। উমেশবাবুর লেখা হইতে বুঝা যায়, নেত্রকোণার পথে ময়মনসিংহে আসিয়া বাবুরাম মহারাজ জিতেনবাবুর বাসায় কয়েকদিন ছিলেন। অথচ জিতেনবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার বাসায় তিনি মাত্র একরাত্রি ছিলেন। জিজ্ঞাসু গ্রন্থকারকে বরদানন্দ বলিয়াছেন, নেত্রকোণায় যাওয়ার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব ঘটে, সেইজন্য ময়মনসিংহে তাঁহারা দুইতিন দিন আটক পড়েন।

শ্যামগঞ্জের ডাকবাংলোয় উঠা গেল। এখানে আহারের সময় এক পুলিশ অফিসার (ডি-এস্-পি, মুসলমান) আসিয়া উপস্থিত। এই অফিসারটির আমাদিগকে দেখিয়াই মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছিল, এবং তিনি নাকি বাবুরাম মহারাজকে কী কড়া কথাও বলিয়াছিলেন। মহারাজ সমস্তই হজম করিয়া গেলেন, কেবল তাঁহার মুখ অতিশয় রক্তিম ও গম্ভীর দেখাইতে লাগিল। তখন তাঁহার খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। দারুণ রোদ, হাওয়া নাই, গাড়ীর ছাদ ভয়ানক তাতিয়া গিয়াছে। কাঁচা সড়ক অনেক স্থলে ভাঙ্গা, কতবার যে সহিস গাড়ী উলটাইয়া যাওয়ার ভয়ে উহাকে ঠেলিয়া ধরিয়াছে, আর আরোহীদিগকেও যে কতবার নামিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। অল্প বেলা থাকিতে নেত্রকোণায় পৌঁছিলাম অর্ধমৃত অবস্থায়। দেখিলাম বিরাট জনসভা, মহারাজ দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন! শ্যামগঞ্জ হইতে পালকিতে করিয়া তিনি আমাদের কিছু আগে পৌঁছিয়াছিলেন।

একদিন নেত্রকোণার এস্-ডি-ও আসিয়া দেখা করিলেন। তিনি নৈশাহারের নিমন্ত্রণ করিলে বাবুরাম মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, আপনার উপর-ওয়ালারা তাতে অসন্তুষ্ট হবে না তো আপনার উপর? তিনি উত্তর দিলেন, সে আমি ঠিক করে নেব এখন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার বাংলোয় গিয়া শুনিলাম বিকালে তিনি একটি ছোটখাট সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই সভায় সম্রাটের যুদ্ধজয়ের জন্য—তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলিতেছিল—মহারাজকে দিয়া প্রার্থনা করাইয়াও নিয়াছিলেন! আমাদের আহারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না, চাকর-বামুনকে দিয়াই কাজ সারিয়াছিলেন।

অন্যদিন সরকারী ডাক্তার নৈশাহারের নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা নিমন্ত্রিতদের আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। আহারের সময় ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন না এবং আয়োজন যথেষ্ট থাকিলেও, কোন কোন জিনিস খাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। এই সব বিষয় নিয়া কেহ কেহ আলোচনা

করিতে থাকিলে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, ওরে নেমকহারামি কচ্চিস ?
—যার খেলি তারই নিন্দা কচ্চিস ?

নেত্রকোণা হইতে চলিয়া আসার দিন মধ্যাহ্নে গৌরীপুর ষ্টেটের কাছারীর ম্যানেজার সকলকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। বাবুরাম মহারাজ ম্যানেজার-গৃহিণীর ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। যাত্রাকালে অনেকেরই চোখে জল দেখা দিয়াছিল। এক বৃদ্ধ উকিল একেবারে হাউ .হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহারাজ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন ঃ আপনি বেলুড় মঠে গিয়ে কিছুদিন আমাদের গেষ্ট্ হাউসে থেকে আসবেন—গঙ্গার ধার, ফাঁকা জায়গা, খুব নিরিবিলি আর শান্তিময় স্থান।

নেত্রকোণা হইতে শ্যামগঞ্জ পর্যন্ত আসিতে পালকির নীচু ছাদের গরমে তাঁহার খুব কষ্ট হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে ব্রহ্মপুত্রের ধারে যখন আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিল, নিজের ছোট পুঁটুলিটি ঘাড়ে করিয়া খেয়া নৌকায় আসিয়া উঠিলাম। পুঁটুলিটি নামাইয়া তাহার উপর বসিব ভাবিতেছি এমন সময় বাবুরাম মহারাজ পিছন হইতে আসিয়া অবসন্নভাবে তাহাতে বসিয়া পড়িলেন। ময়মনসিংহে আবার জিতেনবাবুর বাড়ীতেই উঠা গেল। রাত্রে একটা শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখি মহারাজ দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। দরজা খুলিয়া দিয়া, লণ্ঠন লইয়া তাঁহার সঙ্গে বাহিরে আসিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিলেন না। অগত্যা ফিরিয়া শয্যা আশ্রয় করিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরে শুনিলাম ঘরে ঢুকিবার সময় তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন।

সুধাংশু সান্যাল বলেন ঃ ময়মনসিংহ হইতে আমার দাদা নীরদ পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে নেত্রকোণা শহরে লইয়া আসেন। নীরদ তখনও সাধু হন নাই, কিন্তু শ্রীমহারাজের কাছে তাঁহার দীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। ময়মনসিংহে কেহ কেহ তাঁহাকে নেত্রকোণা যাইতে নিষেধ করিলে তিনি নীরদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলেন,—না, আমি যাব। নেত্রকোণার প্রসিদ্ধ উকিল আনন্দমোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে

তাঁহার ও অন্যান্য সাধুদের থাকার ব্যবস্থা হয়। তিনদিন ধরিয়া নিত্য প্রায় দুইশত লোক তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। ভজনগান হইয়া প্রসঙ্গ সুরু হইত ও অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলিত। ইহার পর হইতেই ঐ অঞ্চলের বহু লোক ঠাকুরের ভক্ত হইয়া পড়েন।

রামানন্দ বলেন: নেত্রকোণা হইতে ময়মনসিংহে ফিরিবার পথে শ্যামগঞ্জের ডাকবাংলোয় পৌঁছিয়া আমরা বাবুরাম মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, তাঁহার পালকি পশ্চাতে আসিতেছিল। ডাকবাংলোয় আসিয়া তিনি পালকি হইতে কতকগুলি কচি জামরুল ও লিচু বাহির করিয়া বলিলেন, এই দেখ, এগুলি ভক্তেরা দিয়েচে! 'এমন জিনিসও ভক্ত দেয়!' সকলেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় জানা গেল, নেত্রকোণা শহর ছাড়িয়া খানিক দূর অগ্রসর হইলে পাড়াগাঁয়ের কয়েকটি লোক তাঁহাকে দেখিতে পায় ও সাগ্রহে তাঁহার গতিরোধ করে। তাহারা দৌড়াইয়া গ্রামে ছুটিয়া যায়, এবং স্ত্রী-পুরুষ-বাল-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলকে ডাকিয়া আনে। তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া গ্রামবাসীরা এতই বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, কী দিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া—গরীব তাহারা—নিজেদের গাছে যে অপরিপক্ব জামরুল ও লিচু ছিল তাহাই দিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছে!

উমেশবাবুর বর্ণনা: নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্নের আহার ও বিশ্রামের পর সেই দিনই সোনারগাঁ অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ কতকগুলি সঙ্গী লইয়া একটি ষ্টীম লঞ্চে উঠিলেন, অবশিষ্ট সকলে সেই লঞ্চ-বাহিত মালবাহী নৌকায় চলিলেন। কী কারণে মনে নাই, লঞ্চ বেশীদূর অগ্রসর হইল না। তখন মহারাজ নৌকায় আসিলেন এবং নৌকার অনেক লোক হাঁটিয়া চলিল।...সোনারগাঁর ঘাটে[১] পৌঁছিয়া মহারাজকে

১। সোনারগাঁ যাইতে পঞ্চমীঘাটে নামিতে হয়। পঞ্চমীঘাট ব্রহ্মপুত্রের পূব পারে, পশ্চিমপারে লাঙ্গলবন্দ।

অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ তাঁহার জন্য পালকি ও ব্যাণ্ড আসিয়া পৌঁছায় নাই। অবশেষে ব্যাণ্ডের বাদ্যে গ্রাম কাঁপাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। ...ধীরেনবাবু (উদ্যোক্তা) কিছু তিরস্কার শুনিলেন। পরের দিন মহোৎসব, জনসভা, অভিনন্দনপত্র প্রদান প্রভৃতি হইল। সন্ধ্যার পূর্বেই নারায়ণগঞ্জের দিকে রওনা হওয়া গেল। মহারাজের সঙ্গে এক নৌকায় উঠিলাম ও অনেক রাত্রে নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে পৌঁছিলাম। পরদিন মহারাজের সর্দি হইল।

যোগেশ ঘোষের কথা ঃ

ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত বাবুরাম মহারাজকে সোনারগাঁয় লইয়া যান। আমিনপুর গ্রামে স্থানীয় জমিদারদের বাড়ীতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হয়। যেদিন তাঁহার সোনারগাঁয় যাওয়ার কথা, সেইদিন সকালে ধীরেনবাবু আমাকে বলিলেন, তুমি আগেই চলে যাও, এতগুলি লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখো। আঠারো মাইল রাস্তা বাইক করিয়া আমি ঢাকা হইতে তখনই সোনারগাঁ চলিয়া গেলাম, কিন্তু স্থানীয় সহযোগিতার অভাবে খাওয়ার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলাম না। রাত্রি দশটায় বাবুরাম মহারাজ বাসায় পৌঁছিলেন, রান্না করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে একটা বাজিয়া গেল। সতীন্দ্র (জ্ঞানেশ্বরানন্দ) রান্না করিয়াছিলেন। মহারাজ বলিলেন, একজন ভক্ত অভুক্ত থাকতে আমি খাব না। অনেকের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, রাত বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ তিনি বারান্দায় একখানা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ উমানন্দ আসিয়া, ছোট ছেলেকে যেমন করে, বলিলেন, মহারাজ, উঠুন উঠুন, শীগ্‌গির খাবেন চলুন। তিনি আর কথাটি না বলিয়া সুবোধ ছেলেটির মত সুড়সুড় করিয়া গিয়া খাইতে বসিলেন।

আমাদের ঘুম ভাঙ্গিতে বেলা হইল। উঠিয়া গিয়া দেখি, উঠান-ভর্তি লোক বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছে। তিনি বলিতেছিলেন ঃ সংসারী লোকেরা কী নিয়ে আছে জান? এক বনে এক বাঘ ও এক বাঘিনী থাকত। একদিন বাঘিনী ঝগড়া করে বাঘকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। কিছুদিন পরে বাঘটা ফিরে এল, আসতেই বাঘিনী তার মুখে তিন লাথি মেরে আবার

তাড়িয়ে দিলে। বাচ্চাগুলো মাকে বল্লে, তুমি যে আবার বাবাকে লাথি মেরে তাড়ালে, সে কি আর আসবে? বাঘিনী বল্লে, আমার কাছে এমন জিনিস আছে যে তাড়িয়ে দিলেও আবার আসবে। সংসারীরা কী মোহ নিয়ে আছে জান?...শুনিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল, মহারাজ যেভাবে সংসারী লোকদের খিস্তি করিতেছেন তাহাতে রাগিয়া গিয়া কেহ তাঁহাকে প্রহার করিয়া না বসে!

বৈরাগ্যবৃদ্ধির জন্য ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী ছেলেদিগকে এই জাতীয় কথা বলিতেন। সাধুদের প্রতি স্থানীয় বিষয়ী লোকদের অবজ্ঞার ভাব বাবুরাম মহারাজ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে অবজ্ঞার জন্য সাধু ও ভক্তদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। শুনা যায়, সোনারগাঁয় পা দিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, এ যে আঁধার দেখচি!

নারায়ণগঞ্জে দুইতিন দিন থাকিয়া বাবুরাম মহারাজ ঢাকা মঠে চলিয়া আসেন। ঢাকায় আসিবার পূর্বদিন বিকালে তিনি নাগ মহাশয়ের বাড়ী যান। নাগ মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহাকে ও কৃষ্ণলাল মহারাজকে দুইখানি নূতন বস্ত্র দান করিলে সেই কাপড় মাথায় জড়াইয়া তাঁহারা নাগাঙ্গনের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

বিধুরঞ্জন দাস লিখিয়াছেন ঃ

প্রত্যূষের গাড়ীতে আমরা বাবুরাম মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে নিয়া ঢাকা পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে ঠাকুরচরণ মুখার্জি, প্রফুল্ল ব্যানার্জি প্রভৃতি ভক্তেরা অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা মঠে পৌঁছিলে বাবুরাম মহারাজ ও কৃষ্ণলাল মহারাজকে মাল্যভূষিত করা হইল, সামনের লনে বৃক্ষমূলে দুইখানি চেয়ারে বসাইয়া। মঠে নিত্যই উৎসব চলিতে লাগিল, সাধু, ভক্ত, জিজ্ঞাসু, ধর্মার্থীর আনাগোনায় ভিড় জমিয়া গেল।

একদিনের কথা মনে হইতেছে। লতপ্‌দীর যোগেন্দ্র পাল ও হরেন্দ্র পাল দুই ভাই গ্রাম হইতে খালি পায়ে নদীনালা পার হইয়া বহু পথ হাঁটিয়া

বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিতে আসেন। মহারাজ অতি স্নেহভরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের পথের শ্রম ও ক্ষুৎপিপাসা দূর করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভক্তের প্রতি তাঁহার মমতা দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। কিছুদিন পরে তাঁহাকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাসাড়া গ্রামে লইয়া যাওয়া হয় (জুনের প্রথম সপ্তাহ)। এই ব্যাপারে যোগেশ গাঙ্গুলী ও রামগোপাল ঘোষ অগ্রণী হইয়া সব বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উমেশবাবুর বর্ণনা ঃ

ঢাকায় থাকিতে বাবুরাম মহারাজ সকালবেলা একটু বেড়াইতেন, আমরা তাঁহার ছাতাটা লাঠিটা বহন করিয়া ধন্য হইতাম। একদিন প্রফুল্লবাবুর শ্বশুরকে বলিলেন ঃ ভগবানের ধ্যানচিন্তা করবার আগে হাততালি দিয়ে হরিনাম করা ভাল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে যেমন গাছেব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম কবলে পাপপাখী পালিয়ে যায়। এই বলিয়া নিজেই হাততালি দিয়া হবিনাম করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে ভাবাবেশে উঠিয়া পড়িলেন এবং হরিবোল হরিবোল বলিয়া নাচিতে লাগিলেন!

হাসাড়ায় দীনবন্ধু সেনের পাকাবাড়ীর দোতলার হলঘরে তিনি ও কৃষ্ণলাল মহারাজ থাকিতেন, আমরা কয়েকজন থাকিতাম পাশের বারান্দায়। মহোৎসবের পূর্বদিন নগরসংকীর্তনের সঙ্গে তিনিও বাহির হইয়াছিলেন এবং ফিরিয়া ক্লান্তিবশতঃ অনেকক্ষণ ধরিয়া শুইয়াছিলেন। সেবক যতীশ মহারাজ দুইএক দিনের জন্য ঢাকায় চলিয়া গেলে তিনি আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা গ্রহণ করিতেন। হাত পাতিয়া যখন দুটি লবঙ্গ বা অন্য মুখশুদ্ধি গ্রহণ করিতেন তখন মনে হইত, এ কি মানুষের হাত? এত কোমল, এত রক্তিম! তাহা হইলে করকমল, পাদপদ্ম প্রভৃতি কথাগুলি নিছক কবিকল্পনা নয়। সকাল-বিকাল অনেক লোক আসিত, তাহারা এতদূর আকৃষ্ট হইত যে, 'এখন উঠুন' বলিলেও উঠিতে চাহিত না।

পাঁচদিন হাসাড়ায় থাকিয়া, মধ্যাহ্নের আহারের পর, ঢাকার দিকে রওনা

হইলাম। নৌকায় করিয়া ষ্টীমার ষ্টেশনে যাইতে হইবে, নৌকা ঘাটে আসিলে বাবুরাম মহারাজ আমাকে তাঁহার নৌকায় উঠিতে বলিলেন। ষ্টীমারে নীরদ মজুমদার এসরাজ বাজাইয়া গান ধরিলেন ঃ 'মলয় পবন পরশে যেমন মালতী ফুটেরে বনে, সাধুর অঙ্গের বাতাস লেগে নাম ফুটেরে মনে।'

যোগেশ গাঙ্গুলীর কথা ঃ

হাসাড়ায় বাবুরাম মহারাজের কাছে বসিয়া সকলে ঐ অঞ্চলে কচুরী-পানার উপদ্রব সম্বন্ধে বলাবলি করিতেছিল। তিনি সব কথা শুনিয়া প্রফুল্ল ব্যানার্জির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এ ইঞ্জিনীয়ার, তুমি এর প্রতিকার কর। সেন-বাডীর ছোট পুকুরটিব চারি কিনারে কচুরীপানা রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, চল, এখুনি এটা পরিষ্কার করব। সকলে বলিয়া উঠিল, মহারাজ, আপনাকে যেতে হবে না, আমরাই করচি। সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তখনই পুকুবপাড়ে আসিলেন ও পাড হইতে নামিয়া, হাঁটুজলে দাঁড়াইয়া স্বহস্তে একগোছা কচুরীপানা টানিয়া উপরে উঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক জলে নামিয়া পডিল ও অল্প সময়ের মধ্যেই পুকুরটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাঁহার অনুপ্রেরণা এখানেই শেষ হইল না, তিনি চলিয়া যাওয়ার পরেই গ্রামের ছেলেদের সমবেত উদ্যোগে যাবতীয় পুকুর, ডোবা ও খালের কচুরীপানা ধ্বংস করা হইল। বেশ কয়েক বছর ধরিয়া এই কাজটি চলিয়াছিল। আমাকে ও হাসাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট লালমোহন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে করিয়া প্রফুল্লবাবু পার্শ্ববর্তী শেখরনগর, যোলঘর প্রভৃতি গ্রামে যান এবং এইভাবে কচুরীপানা ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেন।

ঢাকা মঠে দিনকয়েক থাকিয়া বাবুরাম মহারাজ সদলবলে কলিকাতায় ফিরিলেন এবং উদ্বোধনে আসিয়া শরৎ মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শরৎ মহারাজ প্রতিপ্রণাম করিয়া, পার্শ্বস্থিত সেবককে বলিলেন ঃ বাবুরাম মহারাজ, a new prophet (নূতন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ)—তাঁর পদার্পণে ঢাকা ডুবুডুবু, ময়মনসিংহ ভেসে যায়! বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, তা বইকি, প্রভুর নামে সব ভেসে যাবে!

প্রেমানন্দ-প্রেমে মুসলমান নরনারী

'হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যেই মঠে আসুক না কেন, আমি তাদের আলিঙ্গন করে আপনার করে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছি।'

'একদিন এখানে কুমিল্লা থেকে একজন মুসলমান ভক্ত এসে বল্লে, ঠাকুর তাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েচেন, বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর দর্শন ও প্রসাদগ্রহণ করবার জন্যে। দেশ থেকে সে একজন হিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। মুসলমানটি ঠাকুরঘরে ঢুকে ভাবে গদগদ হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে, তারপর প্রসাদ নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে খেলে।'

'সেদিন একজন খ্রীষ্টান এসে বল্লে, আমাদের ধর্ম সব সামাজিকতা; স্বামিজীর ধর্মে দয়া করে আমাকে গ্রহণ করুন। সে এখানে কয়েকদিন থেকে সকলের সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলে।'

উপরের কথাগুলি বাবুরাম মহারাজ বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন।

ডায়মণ্ডহারবার হইতে এক মুসলমান ভদ্রলোক, সাব্‌রেজিষ্ট্রার মতিউদ্দীন, কয়েকজন হিন্দুর সহিত বেলুড় মঠে আসেন। তাঁহাকে পাতায় করিয়া প্রসাদ খাইতে দেওয়া হয়। বাবুরাম মহারাজ নিজে তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাতাটি তুলিয়া নিয়া স্থান পরিষ্কার করেন।

বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া দীন মহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান 'দীননাথ' নামে পরিচিত হন। তিনি স্বামিজীর অনেকগুলি বক্তৃতা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গৌরীশানন্দ বলেন :

ঢাকায় মোহিনীবাবুর বাড়ীতে বাবুরাম মহারাজ আছেন (১৯১৪)। একদিন আমাকে বলিলেন, হ্যাঁরে, এখানে কেউ মুসলমান আসে না?— আমি তো কাউকে দেখি না! পরদিন সকালে দেখা গেল, ৬০।৬৫ বছর

বয়সের এক সৌম্যমূর্তি মুসলমান হলে ঢুকিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন, প্রেমানন্দস্বামী এখানে এসেচেন শুনেচি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি। বাবুরাম মহারাজ প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। বিদায়ের সময় ভদ্রলোকটি অতি ভক্তির সহিত দুই হাতে বাবুরাম মহারাজের দুই হাঁটু স্পর্শ করিয়া বারবার কুর্ণিশ করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, যা আশা করে এসেছিলাম তাই পেয়েচি, আমার জীবনে এ বস্তু আর পাই নাই।

বাবুরাম মহারাজ ও কৃষ্ণলাল মহারাজকে দ্বিতীয়শ্রেণীর কামরায় তুলিয়া দিয়া ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে লইয়া যাইতেছিলাম। নারায়ণগঞ্জের আগের ষ্টেশনে সেই কামরায় উঠিয়া দেখি, এক মুসলমান ভদ্রলোক দুই হাতে বাবুরাম মহারাজের হাঁটু স্পর্শ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন ও ভাবাবেগে বলিতেছেন, আমার সৌভাগ্য যে, অল্প সময়ের জন্য হলেও আপনাকে আমি পেয়েচি! নারায়ণগঞ্জে আসিয়া সকলেই যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, তিনি পুনরায় বাবুরাম মহারাজের দুই হাঁটু স্পর্শ করিয়া কুর্ণিশ করিলেন। শুনিলাম তিনি একজন সাব্‌ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কর্মস্থলে যাইতেছিলেন।

মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা বাবুরাম মহারাজকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া যান এবং স্বয়ং অভিনন্দিত করিয়া ধর্মগুরুর প্রতি প্রযোজ্য সম্মাননার চূড়ান্ত প্রদর্শন করেন (১৯১৪)। শুনা যায়, এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহারা নিজেদের মুসলমান পীরের প্রতিও কখনও প্রদর্শন করেন নাই। নবাব পরিবারের অসূর্যম্পশ্যা কুলমহিলারা বাবুরাম মহারাজের প্রেমপবিত্রতাময় জীবনের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হন এবং নবাব গণি মিঞার নির্মিত রংমহলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার মুখে ঠাকুরের কথা—সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা শ্রবণ করেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাদের জন্য ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া গিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কাজ নবাবের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। মুসলমান যুবকদের দ্বারা ঢাকায় অনুরূপ একটি সেবাসমিতি গঠন করিতে

আগ্রহান্বিত হইয়া তিনি বাবুরাম মহারাজের পরামর্শ গ্রহণ করেন।[১] চলিয়া আসিবার আগে নবাবের হাত ধরিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, নবাবসাহেব, গো-কোরবানি বন্ধ করে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের সেতু নির্মাণ করুন।[২] নবাব উত্তর দেন, আপনি মুসলমানদের চিনেন না, তাই এমন কথা বলচেন ; তবে আমি আপনার অনুরোধ রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করব। অতিবৃহৎ নবাব-পরিবারে প্রত্যহ কয়েক মন গো-মাংসের প্রয়োজন হইত। তিনি ধীরে ধীরে ইহার পরিমাণ কমাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই শুভ প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

১৯১৪, ৺পূজার পরে। মোটরগাড়ীতে করিয়া নবাব সলিমুল্লার আত্মীয়া বেগম পরী বানু ও অপর তিনচারি জন মহিলা বেলুড় মঠে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গীয় হিন্দু কর্মচারী আসিয়া সংবাদ দিলে বাবুরাম মহারাজ নিজে যাইয়া তাঁহাদিগকে মঠের ভিতর আনয়ন করেন। প্রবীণ কর্মচারীটি হিন্দু হইলেও তাঁহার সাজপোষাক, দাড়ি-গোঁফের কাটছাঁট ছিল মুসলমানী ধরণের, আর তাঁহার হাতে ছিল ঠাকুরের ভোগের জন্য আনীত মিষ্টি। বাবুরাম মহারাজ

১। ইহার পূর্বে নবাব সলিমুল্লা কলিকাতায় শরৎ মহারাজের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। চিৎপুর রোডে গাড়ী রাখিয়া, তিনি একদিন খুব সকালে উদ্বোধনে আসিয়া ছোট বৈঠকখানা ঘরটিতে বসিয়া থাকেন। শরৎ মহারাজ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান ও পরিচয় জানিয়া লইয়া সসম্ভ্রমে আধ ঘন্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত কথা কহেন। কী বিষয় নিয়া তাঁহদের মধ্যে কথাবার্তা হইয়াছিল, জানা যায় না। চিৎপুর রোড অবধি সঙ্গে যাইয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দেন। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক ঠাকুরচরণ মুখার্জি ও প্রফুল্ল ব্যানার্জিকে নবাব বলিয়াছিলেন : স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়িয়া তাঁহাকে অতি বুদ্ধিমান মনে হইয়াছিল, স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাকেও অতি বুদ্ধিমান লোক মনে হইল। [গৌরীশানন্দ-কথিত]

২। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্বে কলমা উচ্চ বিদ্যালয়ের মৌলবীর পিঠ চাপড়াইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, মৌলবীসাহেব, দেখবেন যেন হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ না হয়।

তাঁহাদিগকে ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুরঘরে গিয়াই মহিলারা মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলেন। তখন দেখা গেল তাঁহারা সকলেই তরুণবয়স্কা ও শ্রীসম্পন্না, নবাব-পরিবারের কন্যা বা বধূ হইবেন। ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহারা হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন ও তিনবার কুর্ণিশ করিয়া আনতমস্তকে জোড়হাতে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবুরাম মহারাজকে হিন্দুপ্রথায় প্রণাম করিলেন, দুই হাতে তাঁহার দুই পা স্পর্শ করিয়া ও সেই হাত দুইখানি নিজেদের কপালে ঠেকাইয়া। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাদিগকে ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি দেখাইলেন, তাঁহারাও হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী কিনা বলা যায় না, কিন্তু বাঙ্গলা বুঝেন। তারপরে নীচে নামিয়া আসিলে বাবুরাম মহারাজ একটি সুদৃশ্য আধারে করিয়া তাঁহাদের একজনের হাতে ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন, তাঁহারাও উহা কপালে ঠেকাইয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাঁহারা কয়েকখানা আকবরী মোহর দিয়াছিলেন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া।[১]

এই সরলপ্রাণা সৌভাগ্যবতী কুলাঙ্গনারা প্রেমানন্দের মধ্যে কোন্ অপার্থিব বস্তু দেখিতে পাইয়াছিলেন, কে জানে! ১৯১৭ সালে বাবুরাম মহারাজ যখন ঢাকার নবনির্মিত মঠে কিছুদিন আছেন তখন ইঁহারা বহির্ভ্রমণের ছলে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার কথামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়া ফিরিতেন।[২] সলিমুল্লার ভগিনী বেগম আখতারা বানু ঢাকা মঠে একখানি গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা নবাব আসানুল্লার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে। 'আসান-মঞ্জিল' অদ্যাবধি তথায় রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বাবুরাম মহারাজ যখন রাড়িখাল গমন করেন (১৯১৫) সেই সময়ে স্থানীয় মুসলমানরা তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। হিন্দুদের সঙ্গে

১। মুক্তেশ্বরানন্দ-কথিত। ২। রামানন্দ-কথিত।

বসিয়া তাহারা তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিত, তাঁহার সহিত কীর্তনে যোগ দিত, তাঁহাকে গান গাহিয়া শুনাইত। আপন মনে ঠাকুর কখন কখন গাহিতেনঃ এসেছেন এক ভাবের ফকির। (ওসে) হিন্দুর ঠাকুর মুসলমানের পীর॥[১] বাড়িখালে ভাবের ফকিরের রূপটি প্রকট হইয়াছিল বাবুরাম মহারাজের মধ্যে। সরল বিশ্বাসে মুসলমানরা বলিত, ইনি আমাদের পীর। মঠে ফিরিবার জন্য যখন তিনি ভাগ্যকুল ষ্টেশন অভিমুখে যাইতেছেন পালকিতে করিয়া, তখন দেখা গেল ক্ষেতের কাজ ফেলিয়া মুসলমানরা ছুটিয়া আসিতেছে ও তাঁহাকে সেলাম করিয়া তাঁহার দোয়া ভিক্ষা করিতেছে। মঠে ফিরিয়া যখন তিনি কঠিন কলেরারোগে আক্রান্ত হন, রাড়িখালের মুসলমানরা তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া শিরণি মানত করিয়াছিল, এবং তাঁহার কুশলবার্তা পাইবার জন্য মঠে রিপ্লাইপেড্ টেলিগ্রাম করিয়াছিল।

বাবুরাম মহারাজ যেদিন ধারিন্দায় আগমন করেন (১৯১৭) তাহার পরদিন বেলা দুইটায় দূরপল্লী হইতে অনেকগুলি মুসলমান তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে। তিনি বিশ্রাম করিতেছেন শুনিয়া তাহাদের একজন বলিয়া উঠে, আমরা কত কষ্ট করিয়া এই মাথাফাটা রৌদ্রে সাধুদর্শনে আইলাম, আর

১। মন্মথনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন। তিনি বলিয়াছিলেন কুমুদবন্ধু সেনকে: "অনেক চেষ্টায় বোল ব্রাদার্সে চাকরি যোগাড় করলাম। বেশী মাইনে নয়, তাই ধর্মতলা থেকে গেঁড়াতলা হয়ে বীডন ষ্ট্রীটে হাঁটা পথে যেতাম। একদিন সন্ধ্যা হয় হয়, গেঁড়াতলা মসজিদের সম্মুখে দেখি একটি মুসলমান ফকির দাঁড়িয়ে চীৎকার করচে, 'প্যারে আও।' চোখ দিয়ে জল পড়চে, বেশ প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকচে, 'প্যারে আজাও, আজাও।' আমি শুনে মুগ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী হতে নেমেই সবেগে চল্লেন সেই মুসলমান ফকিরের দিকে। পরে দুইজন একেবারে প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ। ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আর দুইজন লোক ছিল —একজন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল।…ঠাকুর কালীঘাটে কালীমাতাকে দর্শন করে ফিরছিলেন, পথে এই অপূর্ব দৃশ্য।" [উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ, ১৩৬২]

সাধু কিনা ঘুমাইতেছেন! তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহিরে আসিয়া জোড়হাতে ক্ষমা চাহিলেন ও অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিলেন।

দুইদিন পরের ঘটনা। প্রায় তিনটার সময় একদল মুসলমান আসিয়া আমগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসে। বাবুরাম মহারাজ সেইখানেই তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় নীলকান্ত চক্রবর্তীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ওরে গরমে এদের বড় কষ্ট হয়েচে, এদের সরবৎ খাওয়া। মুসলমানদের দলে প্রায় চল্লিশ জন লোক, এত লোকের উপযোগী সরবৎ তৈরী করা সময়সাপেক্ষ, অথচ তিনি পুনঃপুনঃ তাগিদ দিতে লাগিলেন। যতক্ষণ না তাহারা মিশ্রির পানা খাইয়া ঠাণ্ডা হইল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বস্তি বোধ করিতে পারেন নাই।

ঐদিন রাত্রি দশটার সময় একদল মুসলমান গায়ক তাঁহাকে মুর্শিদভজন (গুরুতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের গান) শুনাইতে আসে। চারি ঘণ্টা ধরিয়া তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহাদের গান শুনিলেন ও গান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে বলিলেন, আহা, কত কষ্ট করে ওরা আমাকে গান শোনাতে এসেচে, গানগুলিও অতি উচ্চভাবের।

ইহার পরের দিন একটি অতি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। প্রায় তিনটার সময় টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের আরবী-শিক্ষক মৌলবী ইয়াসিন আলি খাঁ বাবুরাম মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসেন ও কিছুক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়াই বলিয়া উঠেন, আপনারা তো সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলেন, আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে খেতে পারেন? মৌলবীর ডান হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিয়া দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন, হাঁ পারি। তাঁহার আদেশে বৈঠকখানার একটি ছোট কক্ষে সতরঞ্চ ও জাজিম পাতিয়া আহারের স্থান করা হইল এবং একটি থালায় করিয়া নিবেদিত কিছু ফলমিষ্টি আনিয়া সেখানে রাখা হইল। উভয়ে একসঙ্গে বসিয়া খাইতেছেন এমন সময় মৌলবী বলিলেন, আপনার তালবিলিমদের (চেলাদের) ডাকুন, তারাও খাবে। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, আমিই তো খাচ্চি, তাদের আর প্রয়োজন

কী, তারা খাবে না। এই সময় ভক্তেরা লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার চেহারা ভাবভঙ্গী সবই যেন অন্যরূপ হইয়াছে। মৌলবী অতঃপর সঙ্গে আনীত একটি ছোট ছেলের উপর সম্মোহনবিদ্যা প্রয়োগ করিয়া কিছু বুজরুকি দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। সহশিক্ষক নীলকান্তবাবুকে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমাদের সাধুটি খুব উঁচুদরের সাধু।

হিন্দুধর্মের সমদর্শিতাকে উহার প্রকৃত অর্থে না বুঝিয়া, এবং উহাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া, ঈর্ষাকাতর মুসলমান বাবুরাম মহারাজকে একপাতে খাইতে আহ্বান করিয়াছিল। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাবও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু ভোগপঙ্কিলদেহ বিজাতীয়ভাবাপন্ন লোকের সঙ্গে একপাতে খাইয়া তাঁহার ভাবময় শুদ্ধ দেহে যে বিষ সঞ্চারিত হয় উহাই অগোণে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীমহারাজ বলিয়াছিলেন, দেহ ধারণ করলে এসব (আচার) মানতে হয়, ঐতেই বাবুরামদার শরীর এত শীগ্‌গির গেল।

প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া, মুসলমানদের ভারতে প্রথমাগমনের সমকাল হইতেই, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা এদেশের এক অতি বড় সমস্যা হইয়া আছে, এবং উহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকে পদে পদে ব্যাহত করিয়া চলিয়াছে। উহার সমাধানে মধ্যযুগের নানক-কবীরাদি অবতারকল্প মহাপুরুষগণের এবং সম্রাট আকবর ও যুবরাজ দারাশিকোর মত অতি প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের সমূহ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক নেতাদের হিন্দু-মুসলমান-মিলন-প্রচেষ্টা একান্তভাবে বাহ্যিক ও কেবলমাত্র সমস্বার্থভিত্তিক হওয়ায় স্থায়ী ফল প্রসবে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হইয়াছে। সর্ব-ধর্মসমন্বয়কারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলামধর্মসাধনা উভয় সম্প্রদায়ের আন্তর মিলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু সেই ভিত্তির উপরে যে বিপুলায়তন সমাজসৌধ নির্মিত হইবার কথা, তাহা হইবে কিভাবে এবং কতদিনে ?

বাসুদেবানন্দ লিখিয়াছেন ঃ

শশী মহারাজ একবার মুসলমান শাস্ত্র আলোচনা করছিলেন, ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করলেন, বল্লেন, এখনো অনেক দেরী, পর্বত ব্যবধান—পরে হবে। আবার রামলালদাদা বলেন, উইলিয়াম নামক এক খ্রীষ্টান সাধককে নিজের ঘরের মধ্যে বসালেন, তাঁর মাদুরের এক আঙ্গুল ব্যবধানে ঐ সাহেবের মাদুর পাততে বল্লেন, এবং বল্লেন, একেবারে মিশিয়ে দেব না, একই ঘরে থাকবে, কেবল এই এক আঙ্গুল তফাৎ রইল। স্বামিজী কন্‌ভার্শনের (ধর্মান্তরী-করণের) কথা বলেচেন। এখন কন্‌ভার্শনটা ঠিকঠিক ঠাকুরের সম্মত কিনা বিচার্য, কারণ তাঁর বিশ্ববাসীর নিকট প্রধান দান—যত মত তত পথ।

বাবুরাম মহারাজ শুনে বল্লেন ঃ মা-ঠাকরুণ যেভাবে গুরু ও ইষ্টকে দেখিয়ে দেন সেইভাবে দিলে আর কোনও গোল থাকে না। খ্রীষ্ট ভজুক আর আল্লাই ভজুক, তাতে কিছু এসে যায় না, ঠাকুরকে তাদের গুরু করে দিতে হবে। কারণ, তিনি সব মত পথ জানেন, এবং এ যুগে তিনিই সর্বভাবের গুরু। তা হলেই খ্রীস্টান বা মুসলমান বা বৌদ্ধ বা পারসী সবই হোক, তাতে তাদের ধর্ম ছাড়তে হবে না, কেবল তাদের ধর্মটা ঠাকুরের উদার জীবনরূপ ভাষ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতে হবে। হিন্দুধর্ম বলতে ঠাকুর, ঠাকুরই মূর্তিমান বেদান্ত। স্বামিজী বলেন নি ? পড়েচিস তো,— 'খ্রীষ্টান বাইবেল ত্যাগ করবে না, বেদান্তের আলোকে বাইবেল পড়বে।' প্রত্যেক ধর্মের যা কিছু অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা বা কুৎসিতাচার, ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং বেদান্তের যুক্তির সহিত যা না মিলবে তা নির্মম-ভাবে ত্যাগ করতে হবে। ঠাকুরের প্রধান শিক্ষা 'কামকাঞ্চনত্যাগ' এবং 'যত মত তত পথ'। সামাজিক আচার-ব্যবহার দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিচার করে নিতে হবে, কিন্তু ধর্ম হবে সার্বভৌমিক—যেমন পতঞ্জলির অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহ। ঈশ্বরে ভক্তি, আত্মস্বরূপজ্ঞান, নিরভিমানতা, সেবা, অক্রোধ, ক্ষমা ইত্যাদি গীতার দৈবী সম্পদের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন ঠাকুর। এইসব যেখানে আছে সেখানে ধর্ম আছে, যে ঠিক ঠিক ধার্মিক সে ঠাকুরকে

গুরু করবেই। বর্তমান যুগের আধ্যাত্মিক আদর্শ মানুষ ঠাকুরের চাইতে আর অধিক কল্পনা করতে পারে না।[১]

আরও বলেছিলেন: যে উদার নয় তার ভিতর ঠাকুরের ভাব কখনই প্রবেশ করে নি। পুরীতে মন্দিরের সামনে খ্রীষ্টান প্রচারকরা যীশুর নাম প্রচার করছিল। আমি আর সহ্য করতে না পেরে 'হরিবোল হরিবোল হরিবোল' বলে সেখানে দুহাত তুলে চীৎকার করতে লাগলুম। আর যত রাস্তার লোকেরা তাতে যোগ দিয়ে 'হরিবোল হরিবোল' করতে লাগল। তাতে খ্রীষ্টানদের সভা ভেঙ্গে গেল। পাণ্ডারা বল্লে, আমরা ভয়ে এতদিন কিছু করতে পারি নি, এইবার বেশ হয়েচে। রাত্রে স্বপ্নে দেখি, ঠাকুর এসে হাজির, গম্ভীর। আমাকে বকতে লাগলেন—'হাঁরে, ওদের সভা ভেঙ্গে দিলি কেন? ওরা তো আমার কথাই প্রচার করছিল, তাতে বিঘ্ন করলি কেন? ভোরে উঠেই গিয়ে ক্ষমা চাইবি ওদের কাছে।' আমি ভোরে উঠেই অনেক সন্ধান করে তাদের বাড়ী বের করে ক্ষমা চেয়ে এলুম।

স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন বাবুরাম মহারাজকে: এই যেসব ধর্মটর্ম দেখছিস এই সমস্ত কিছুই থাকবে না—ঠাকুর সব খেয়ে ফেলবেন।[২]

বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছেন: বুড়োগোপালদা (অদ্বৈতানন্দ) দেহ রাখবার আগে ঠাকুরকে দেখলেন, গদা-কাঁধে গদাধর। জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাঁধে গদা কেন? ঠাকুর বল্লেন, আমি গদাধর, এবার এই রকমই, সব ভেঙ্গেচুরে নতুন করে গড়ব।[৩]

১। উদ্বোধনে একজন শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মিটবে না কি? শরৎ মহারাজ কহিলেন,—ঠাকুরের দিকে চাইলেই সমস্যার সমাধান দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বিবাদভঞ্জন। ধর্ম নিয়া বিবাদ, গোঁড়ামি অদূর ভবিষ্যতে লোপ পাবে। প্রত্যেক ধর্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম বেদান্তরূপ সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়বিশেষরূপে পরিগণিত হবে। 'মুসলমান ধর্মও?' 'হাঁ, মুসলমান ধর্মও।' তিনি বেশ জোরের সহিত উত্তর দিলেন। [শ্রীশ ঘটক-কথিত]

২। জিতেন্দ্র দত্ত-লিখিত ৩। বাসুদেবানন্দ-লিখিত।

সদ্‌গুরু

বাবুরাম মহারাজ বিভিন্ন ভাব সম্বন্ধে বলিতেনঃ আমি তাঁর সন্তান, তাঁর অংশ—এ একটি ভাব: আমি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, লীলায় অবতীর্ণ—এ আর একটি ভাব।

ঠাকুর-ভাঁড়ারে ডাব আসিয়াছে, একটি হিন্দুস্থানী সাধু সেই সময়ে মঠে ছিলেন, ডাব দেখিয়া খাইতে চাহিলেন। ভাঁড়ারী দিলেন না, ঠাকুরের ভোগের জিনিস বলিয়া। সাধু চটিয়া গেলেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, একটি ডাব ঠাকুরের জন্যে রেখে, একটি কেটে সাধুকে দাও—এও একটা ভাব আছে।[১]

জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি-আমার কী করে যায়? বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস হলে যায়। সন্ন্যাসী হইয়াও কি ঈশ্বরে বিশ্বাস হইল না? জগদানন্দ ভাবিতে লাগিলেন। অমনি বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস কি এতই সহজে হয়?

১। জগদানন্দ-কথিত।

১৯১৭, জানুয়ারী মাস। মঠের প্রাঙ্গণে আম্রবৃক্ষের নীচে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, বাবুরাম মহারাজ নিজে জল পরিবেষণ করিলেন। একটি পশ্চিমা সাধুও সেই সঙ্গে বসিয়াছেন, অন্ন পরিবেষণের বিলম্ব দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহার নিকট গিয়া করজোড়ে ক্ষমা চাহিলেন ও নানাভাবে বুঝাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। [ধীরেন্দ্র গুহঠাকুরতা-লিখিত]

১৯১৫, সকালবেলা। বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া উঠানে আসিয়াছেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক জটাজুটধারী উদাসী সাধু—নাম ঠাকুরদাস বাবা। তাঁহাকে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, বাবাজী তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তুলিলেন ও স্বয়ং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। গদগদকণ্ঠে বাবাজী বলিলেন, শুনেছিলাম—প্রেমানন্দ, আজ যথার্থ উপলব্ধি করলাম—প্রেমানন্দ। বাবুরাম মহারাজও গদগদভাবে বলিলেন, আমার আজ সুপ্রভাত—আপনার মত সাধু মহাত্মার দর্শন হল। [গৌরীশানন্দ-কথিত]

কোন ভক্তকে বাবুরাম মহারাজ লিখিয়াছেন: 'সে লিখিয়াছে কৃষ্ণের ছবি ঠাকুরঘরে রাখিতে পারিবে কিনা। সমস্ত দেবদেবীর, সমস্ত ধর্মের সকলপ্রকার ছবি রাখিতে পারে। ঠাকুর যে সকল ধর্মের দলপতি ছিলেন।'

আর একজনকে লিখিয়াছেন: 'আমাদের ঠাকুর মাপা জোখা জমির মধ্যে বদ্ধ থাকেন না। প্রভু যথা রাখবেন তাঁর ভক্তকে, সেই তাঁর স্থান জানবে।'

হরিপদ তখন মঠে নূতন আসিয়াছেন। একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন,—তিনি মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাব শবীবটাকে পোড়াইতেছে, আর চারিপাঁচ হাত দূরে দাঁড়াইয়া নিজেই দেখিতেছেন। বাবুরাম মহারাজকে তিনি স্বপ্নের কথা জানাইলেন, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই বলিলেন না। দুইতিন মাস পরে আবার সেই স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে একটু বিশেষত্ব ছিল—মড়াপোড়ার গন্ধ নাকে ঠেকিতেছিল বলিয়া নাক টিপিয়া ধরিয়াছিলেন। এই স্বপ্নেব কথাও তিনি বাবুরাম মহারাজকে জানাইলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, এ জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

মঠের সাধুদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন:

শাস্ত্রে আছে 'ঊর্ধ্বসৌরতম্'। ঠাকুরকে না দেখলে একথা কখনও বিশ্বাস হত না। সমস্ত দেহের প্রত্যেক নাড়া, এমনকি প্রত্যেক পেশীটির উপর তাঁর কী অদ্ভুত আধিপত্য ছিল। যে গলার ঘায়ের জন্যে যন্ত্রণার শেষ নেই সেই ঘা ধোয়াবার সময় একটু অপেক্ষা করতে বলে বলতেন, এইবার ধো। তখন আর কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকত না।...যোগীরা সর্বদেহের উপর আধিপত্য করতে পারেন, হৃৎপিণ্ডের গতি পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারেন, যখন খুশি প্রাণ দেহের যে কোন অংশ হতে সরিয়ে নিতে পারেন। তখন দেহের সেই অংশটা জড়ের মত হয়ে যায়। কোন প্রকারের অনুভূতি আর তাতে থাকে না, ছুরি দিয়ে খোঁচা দিলেও তার কোন সাড় হয় না।...এসব আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে বিহার করতেন কামদেহের উপর থেকে

প্রাণটা সরিয়ে নিয়ে। 'ঊর্ধ্বসৌরতম্' কথাটা এইবার বোঝবার চেষ্টা কর।[১]

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষেরা অন্তঃপ্রকৃতির ন্যায় বাহ্যপ্রকৃতির উপরও যে অন্ততঃ কিছুটা আধিপত্য করতে পারেন, ইহার প্রমাণ বাবুরাম মহারাজের জীবনে অনেকবার পাওয়া গিয়াছে। এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। গৌরীশানন্দ বলেন: ঠাকুরের আরতির পর বাবুরাম মহারাজ স্বামিজীর ঘরের সামনের বারান্দায় ধ্যানে বসিয়াছেন পূর্বমুখ হইয়া। তাঁহার পেছন দিকে একটু দূরে আমিও বসিয়াছি। বর্ষাকাল। বারান্দার দুইপাশে দুইটি লতাফুলের গাছ—সন্ধ্যামালতী ও লবঙ্গলতিকা। একটা ব্যাঙ কট্‌কট্‌কট্‌ কর্কশ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। বার দুই এইরূপ হইবার পর বাবুরাম মহারাজ স্বগতভাবে বলিলেন, তুমি যেই হও, এইভাবে যদি ধ্যানের বিঘ্ন করতে থাক তো ধরে একেবারে গঙ্গায় ছেড়ে দেব। আমি ভাবিলাম, দেখি প্রভুর বাক্যের দৌড় কতখানি। অনেকক্ষণ পরে তিনি ধ্যান হইতে উঠিলেন, ব্যাঙের আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাসাড়া গ্রামে অবস্থানকালে বাবুরাম মহারাজ একদিন পাপবাদের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছিলেন। শ্রোতাদের একজন[২] বলিলেন: স্বামিজীর কথা গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-বিরোধী। বৈদিক সন্ধ্যায়ও পাপের কথা আছে। যেমন, আপোমার্জনমন্ত্রে—আপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ (জল আমাকে পাপ হইতে শুদ্ধ করুক)। আচমনমন্ত্রে—যদ্ রাত্রিয়া পাপম-কারিষম্‌···রাত্রিস্তদবলুম্পতু (আমি রাত্রিতে যে পাপ করিয়াছি রাত্রি তাহা নাশ করুক)। যদহ্না পাপমকারিষম্‌···অহস্তদবলুম্পতু (আমি দিবাভাগে যে পাপ করিয়াছি দিবস তাহা নাশ করুক)। যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি (আমাতে যা কিছু পাপ আছে)। বিষয়টি নিয়া উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। আলোচনার শেষে স্থির হইল: বেদান্তসিদ্ধান্তে জীবকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এবং গোস্বামিসিদ্ধান্তে নিত্যকৃষ্ণদাস বলা হইয়াছে।

১ ওঁকারেশ্বরানন্দ-লিখিত।
২। লালমোহন ভট্টাচার্য।

ঐ দুই মতের কোনটিতেই স্বরূপসংস্থ জীবে পাপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই ; উহা স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধকসৃষ্টিকারী মায়িক বস্তুমাত্র। মায়িক বস্তু চিন্তা অপেক্ষা স্বরূপের চিন্তা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'আমি পাপী, আমি পাপী' ইত্যাদি কথা সর্বদা বলিতে নিষেধ করিতেন। অতঃপর কোন ভক্ত বলিলেন, আপনাদের গোস্বামিশাস্ত্রে যে ভাব-মহাভাবের কথা আছে এই স্বামিজীর জীবনে সেই সবই হয়েছে। গোস্বামি-শাস্ত্র-প্রবক্তা শ্রদ্ধা-বিস্ময়-বিমিশ্রিত চোখে স্বামিজীর মুখের পানে চাহিলেন। বাবুরাম মহারাজ সমগ্র আলোচনাটিই মনোযোগের সহিত শুনিয়া যাইতেছিলেন, প্রসন্নমুখে কহিলেন, ঠাকুরের কৃপায় এই দেহে নির্বিকল্প সমাধি, মহাভাব এসব হয়েছে।[১]

লোকহিতচিকীর্ষু ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণই প্রকৃতগুরুপদবাচ্য ; তাঁহাদের মধ্যেই জগদ্‌গুরুর জীবোদ্ধারকারিণী শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই ঐশী শক্তির প্রেরণায় প্রেমানন্দ তাঁহার মর্তলীলার শেষদিন পর্যন্ত বহুসংখ্যক লোকের জীবন ভগবন্মুখী করিয়া ধন্য করিয়াছেন। সপ্রেম সেবার মধ্য দিয়া কিভাবে তিনি অভক্তকে ভক্তে রূপান্তরিত করিতেন ইহার পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। কিভাবে তিনি ভক্তদের সাধনপথের বিঘ্ন অপসারিত করিতেন, কিংবা তাঁহাদের চেতনাকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া দিতেন, কোন কোন ঘটনায় ইহা জানিতে পারা যায়।

বিধুরঞ্জন দাস লিখিয়াছেন ঃ

১৯১৭, মে মাস। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ সোনারগাঁ হইতে নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঢাকা মঠের তরফ হইতে আমরা তিনজন তাঁহাকে ঢাকায় আনয়ন করিতে যাই। তিনি সেই সময় নারায়ণগঞ্জের পাট-ব্যবসায়ী ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর বাড়ীতে মধ্যাহ্নকালীন আহার করিয়া সেখানেই বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমাদের

১। অতুলচন্দ্র চৌধুরী-কথিত।

বক্তব্য জানাইলাম। আমি তখন দেখিতে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান বালকের মত ছিলাম। তিনি আমাকে স্নেহ আদর করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তুই সাধু হবি, না ভক্ত হবি? সাধু ও ভক্তের মধ্যে কী সূক্ষ্ম পার্থক্য জানিতাম না, তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলাম, মহারাজ, আপনি দয়া করে যা করবেন তাই হব। উত্তর শুনিয়া তিনি মৃদু হাসিয়াছিলেন।

ততক্ষণে একঘর লোক জড় হইয়াছে ও নানা বিষয়ের আলোচনা চলিয়াছে। লক্ষ্য করিলাম, কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যেন উন্মনা হইয়া যান ও অতি মধুর স্বরে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া উঠেন। তেমন মধুমাখা হরিনাম জীবনে আর কাহারও মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তারপরে বেলা চারটা নাগাদ তিনি সদলবলে নাগ মহাশয়েব বাড়ীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন।...

নাগ মহাশয়ের বাড়ী হইতে আমরা তাঁহাকে নিয়া নারায়ণগঞ্জ আশ্রমের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিলাম। একতলা বাড়ীর খোলা ছাদে বসিয়া শীতলক্ষ্যা নদীর চমৎকার দৃশ্য দেখা ও মুক্ত শীতল বায়ু সেবন করা যাইত। অনেকখানি পথ হাঁটিয়া মহারাজ খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ছাদে মাদুর পাতিয়া আমরা তাঁহার বিশ্রামের স্থান করিয়া দিলাম। শুক্লপক্ষের পূর্ণচন্দ্র তখন শুভ্রকরজালে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছিলেন।

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যার আরতি ও স্তবপাঠ হইয়া গেলে সাধু-ভক্তেরা সকলেই ছাদে আসিয়া বসিলেন। নীরদ মজুমদার হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখন সুযোগ বুঝিয়া মহারাজের অঙ্গসেবা করিতে অগ্রসর হইলাম। তাঁহার গায়ে হাত দিয়াই ভয় হইতে লাগিল, পাছে এই ননীর মত নরম শরীরে আঘাত লাগে। তাই মৃদুভাবে হাত বুলাইয়া ম্যাসেজ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় একপ্রহর গত হইল, ক্ষুদ্র শহরের কোলাহলও শান্ত হইয়া আসিল। নীরদবাবু তখন বাগেশ্রী রাগিণীতে স্বামিজীর বিখ্যাত গানটি ধরিয়াছেন : নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্কসুন্দর। এমন সময় মহারাজ হঠাৎ নিজের একখানি পা উঁচু করিয়া

আমার পিঠের দিকে কটি হইতে গ্রীবা পর্যন্ত মেরুদণ্ড বরাবর চালনা করিয়া দিতে দিতে বলিলেন, ঠাকুরের হয়ে যা, ঠাকুরের হয়ে যা! তন্মুহূর্তে আমি অননুভূতপূর্ব আনন্দে মগ্ন হইয়া গেলাম। মহারাজের এই অহেতুক কৃপা প্রাপ্ত হইয়া, আমার মনে হয়, ভক্তি না বাড়ুক, চৈতন্য না জাগুক, অন্ততঃ ঠাকুরের দরজায় খানদানী চাষার মত পড়িয়া আছি। এই কৃপা না পাইলে হয়তো বিপ্লবীদের দলে ভিড়িয়া যাইতাম, কারণ তখন ঐরূপ মনোভাব ছিল, আর তদনুকূল পরিবেশেও বাস করিতাম।

অতুলচন্দ্র চৌধুরীর কাছে শুনিয়াছি, বাবুরাম মহারাজ একদিন তাঁহাকে অনুরূপভাবে কৃপা করিয়াছিলেন ও ইহার ফলে তাঁহার মন সুগভীর একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার কাছে আরও শুনিয়াছি যে, ঢাকায় আরও অনেকের চিত্তবিক্ষেপের কারণ তিনি বিদূরিত করিয়াছিলেন স্পর্শাদির দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া।

সৎপ্রকাশানন্দ লিখিয়াছেন: এক সকালে গভীর ধ্যান হইতে উঠিয়া বাবুরাম মহারাজ আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন এবং আমার দুই কাঁধে তাঁহার দুই হাত রাখিয়া ঝাঁকুনি দিলেন। আমার সমগ্র সত্তায় একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। আর একদিন তিনি আমাকে তাঁহার দুই বাহুর মধ্যে ধরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।[১]

জিতেন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন: একদিন ঠাকুরের আরতির পর বাবুরাম মহারাজ মঠবাড়ীর পশ্চিমদিকের বারান্দায় বড় বেঞ্চে বসিয়াছেন, আর আমি দক্ষিণদিকের ছোট বেঞ্চে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছি। মনে হইল, তিনি ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। তাঁহার সমস্ত মুখখানাই লাল হইয়া গিয়াছে। একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আমি একটা দিব্য আকর্ষণ অনুভব করিলাম। মনে হইতে লাগিল, তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতেছেন। আমার মন একটা অতি উচ্চ স্তরে উঠিয়া গেল।

১। **Vedanta and the West** পত্রিকা।

অনেকে বলেন ঃ এই শক্তিশালী মহাপুরুষ নিজে একটিও মন্ত্রশিষ্য করিয়া যান নাই। স্বামিজী একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—চেলা করিস না, চেলা করলে শেষকালে তোর চেলাতে আর রাখালের চেলাতে লাঠালাঠি করবে। মন্ত্র দেওয়ার জন্য অসংখ্য ভক্ত বারবার তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে একবার ভাবিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ নিয়া দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে স্বামিজীর আদেশ প্রতিপালিত হইবে না ভাবিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতেও বিরত হইয়াছিলেন। দীক্ষা দেওয়ার জন্য কেহ তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিলে অনেক করিয়া বুঝাইয়া মায়ের কিংবা মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। জনৈক ভক্তকে দীক্ষা দিবার জন্য মহারাজের কাছে তিনি কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া।

পি. শেষাদ্রি লিখিয়াছেন ঃ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার মানসে হরিপাদ আশ্রমের চিৎসুখানন্দ বেলুড় মঠে যান, আর মহারাজও তাঁহাকে পরদিন দীক্ষা দিবেন বলেন। সেই পরদিন যখন আসিল তিনি বলিলেন, তাঁহার মাথাটা ধরিয়াছে, তারপর দিন দীক্ষা দিবেন। তারপর দিনও সেই একই কথা—তাঁহার শরীরটা ভাল নাই। দীক্ষার্থীর মনে নৈরাশ্য দেখা দিল। শ্রীপ্রেমানন্দের মাতৃহৃদয়ে ইহা সহ্য হইল না, তিনি বলিলেন, মহারাজ, ছেলেটি কত দূরদেশ থেকে—ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে এসেচে, তাকে তুমি কৃপা কর। মহারাজ উত্তর দিলেন, তার ওপর যখন তোমার এতই দরদ, তুমিই কেন তাকে দীক্ষা দাও না? প্রেমানন্দ বলিলেন, সে তো আমার কাছে আসে নি, এসেছে তোমার কাছে, তোমারই দেওয়া উচিত। আমার কাছে এসে থাকলে আমি সেই মুহূর্তে তাকে দীক্ষা দিতুম। তখন মহারাজ কহিলেন, কাল আমি নিশ্চয়ই ওকে দীক্ষা দেব।[১]

গৌরীশানন্দ বলেন ঃ

দুইটি যুবক, তন্মধ্যে একটি নীরদ (অখিলানন্দ), বিকালে মঠে আসিয়াছে,

১। ইংরাজীর অনুবাদ।

পরদিন মহারাজের কাছে তাহাদের দীক্ষা হইবার কথা। মহারাজ তাঁহাদিগকে বাবুরাম মহারাজের ঘরে পাঠাইলেন তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য। আমি তখন বাবুরাম মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম, ছেলে দুইটি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া আছে শুনিয়া বলিলেন, ওদের ডাক, তাহারা আসিয়া মহারাজের কথা নিবেদন করিল। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—মহারাজের কাছে দীক্ষা নেবে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কৃপা পাবে, এর চেয়ে আর কী চাই? ধন্য হয়ে যাবে। আমার সম্পূর্ণ অনুমতি আছে। তাহারা প্রণাম করিয়া গিয়া মহারাজকে সেকথা জানাইল। তিনি আবার তাহাদিগকে পাঠাইলেন দীক্ষায় কী কী লাগিবে জানিবার জন্য। ধীরভাবে উঠিয়া বসিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে দীক্ষা নিতে হলে দুইটি জিনিস (তর্জনী ও মধ্যমা দেখাইয়া) চাই—একটি শুদ্ধ চরিত্র আর একটি পবিত্র অনুরাগ। মহারাজ শুনিয়া আবার তাহাদিগকে পাঠাইলেন আর কিছু লাগিবে কিনা জানিবার জন্য। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, আমি আর কিছু জানি না।

মাষ্টার মহাশয়ের অনুগত ভক্ত দুর্গাপদ মিত্র মাঝে মাঝে মঠে গিয়া মিশনের সেবাকর্মের বিরুদ্ধে কথা কহিতেন ও তর্ক করিতেন। শুদ্ধানন্দ-প্রমুখ সাধুরা ইহাতে চটিয়া গিয়া তাঁহার মঠে আসা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, না না, সে কী কথা, দুর্গাপদ মঠে আসবে না—তা কি হয়? শরীর যাওয়ার পর, তিনি একদিন দুর্গাপদবাবুকে স্বপ্নে দেখা দিয়া ইষ্টমন্ত্র দান করেন। সকালবেলা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে গিয়া সেকথা বলিতেই—তিনি স্বপ্নে প্রাপ্ত নাম এবং বীজও উল্লেখ করিয়াছিলেন—মাষ্টার মহাশয় কহিলেন,—তিনি ছিলেন প্রেমিক মহাপুরুষ, অহেতুক ভালবাসা ছিল তাঁর আপনার উপর; শরীর থাকতে দীক্ষা দিতে পারেন নাই, তাই শরীর যেতে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়ে গেলেন।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ চলচ্ছক্তিরহিত চন্দ্র মহারাজকে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন: যদি আর কেউ না আসে, শেষ সময় আমি এসে তোকে হাতে ধরে নিয়ে যাব, চন্দর।

গৌরীমার কাছে দীক্ষা নিয়া, নির্মল ধর তাঁহার স্কুলবাড়ীতে থাকিয়া কাজকর্ম করিতেন। নানা বিষয়ে মতভেদ হইতে থাকায় নির্মল সেই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিন্ন করেন, গৌরীমার দেওয়া মন্ত্রটিও গঙ্গায় বিসর্জন দেন। গৌরীমা তাঁহাকে শাপশাপান্ত করেন। পূর্ব হইতেই নির্মলের মঠে যাতায়াত ছিল, তিনি বাবুরাম মহারাজের কাছে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করেন। একদিন যখন গৌরীমা মঠে আসিয়াছেন, বাবুরাম মহারাজ নির্মলকে তাঁহার কাছে উপস্থিত করিয়া ক্ষমা ও আশীর্বাদ করিতে বলিলেন। আবেগের সহিত তিনি বলিয়াছিলেন,—কৃপা করুন, কৃপা করুন, আপনারা কৃপা করতে এসেচেন! গৌরীমা তখন নির্মলের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করেন।[১]

কাশীতে স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছেন (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮): তোমাদের ধারণা যে, স্বামী প্রেমানন্দের কোন শিষ্য ছিল না, কিন্তু আমি জানি তাঁর তিনজন বা চারজন মন্ত্রশিষ্য ছিল।

ইহার মীমাংসা কী?

জয়রামবাটীতে যখন মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা হয় (১৯২৩), শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গসেবক শরৎ মহারাজ সেই সময় সম্পূর্ণরূপে মায়ের ভাবে ভাবিত হইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস বা পূর্ণাভিষেক—যে যাহা তাঁহার কাছে চাহিয়াছে সে তাহাই পাইয়াছে। ইতঃপূর্বে মঠের অছিদের সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, প্রেসিডেন্ট ব্যতীত অপর কেহই ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দিতে পারিবেন না। স্বীকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া শিষ্যস্থানীয় দুইজন অছি অভিযোগ করিলে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, দেখ বাপু, আইন করার সময় আমি শরৎ মহারাজ বলেছিলুম (ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস) দেব না; দেবার সময় আমি শরৎ মহারাজ দিই নি! অতি-বিশ্বস্তসূত্রে আমরা এই ঘটনাটি জানি।

১। অতুলবাবু ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাবুরাম

শ্রীবাবুরাম একান্তভাবে শ্রীশ্রীসারদামাতার অনুগত ছিলেন। ভক্তদের কাছে শতমুখে কীর্তন করিতেন তাঁহার অনন্ত ধৈর্য ও অপার করুণার কথা। শক্তিরূপিণীর শক্তির কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরেরও উর্ধ্বে তাঁহাকে স্থান দিয়া বসিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে সেই সব কথা বলা হইয়াছে। মায়েব উপর তাঁহার ভক্তিবিশ্বাসের পরিচায়ক কয়েকটি ছোট ঘটনামাত্র এখানে উল্লেখ কবিতেছি।

উদ্বোধন হইতে কার্তিক (নির্লেপানন্দ) মঠে আসিয়াছেন। তিনি প্রণাম করিতেই বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ওরে, যাবার সময় নৌকায় ওঠবার আগে আমাকে বলে যাস। তখন মঠের তরকারি-বাগান ও ফুলের বাগিচা রান্নাঘরের নিকটে ছিল। তিনি যথেষ্ট বাছা ফুল ও তরকারি এবং শ্রীশ্রীমার প্রিয় আমরুল শাক ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। বলিলেন, বাবুরামের দণ্ডবৎ বলিস, আর এগুলো মাকে দিস। এক সময় মঠ হইতে নিত্য মাকে দুধ ও ফুল পাঠাইতেন।

মামাদের বিষয় জমিজমা ভাগ করিয়া দিবার জন্য শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী যাইবেন। মঠে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—মা-ঠাকরুণের আদেশে যাচ্ছি, ভাগবাঁটোয়ারার কাজ জানি না। তুমি আশীর্বাদ কর যাতে কাজটা সুষ্ঠুভাবে করে মা-ঠাকরুণকে উদ্বোধনে নিয়ে আসতে পারি। বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন,—তুমি যাঁর আদেশে যাচ্ছ তাঁর আদেশ পেলে আমরা বর্তে যাই। আমি বলচি, তুমি যাও, ঠিক পারবে।

বাবুরাম মহারাজ মালদহের উৎসবে যোগদান করিতে যাইবেন, শ্রীশ্রীমার অনুমতি নিতে উদ্বোধনে আসিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া মা

প্রথমটায় তাঁহাকে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি না গেলে উৎসবটি একেবারে পণ্ড হইবে শুনিলেন তখন তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, বাবুরাম, এরা এত করে বলচে, তবে কি তুমি যাবে? বাবুরাম উত্তর দিলেনঃ আমি কী জানি মা, আমি কী জানি? আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করব—জলে ঝাঁপ দিতে বলেন, জলে ঝাঁপ দিব; আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আগুনে ঝাঁপ দিব; পাতালে প্রবেশ করতে বলেন, পাতালে প্রবেশ করব। আমি কী জানি? বলিতে বলিতে আবেগে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মা কহিলেন, যাও একবার এসো গিয়ে, তবে বেশী দিন থেকো না।[১]

জয়রামবাটী হইতে ফিরিয়া নীলকান্ত চক্রবর্তী-প্রমুখ তিনজন ভক্ত মঠে গিয়াছেন বাবুরাম মহারাজকে কয়েকটি কথা বলিবার জন্য। কথাগুলি বলিতে শ্রীশ্রীমা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন। বলার কাজটি আগে করিয়া, যেমন তাঁহারা প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন, বাবুরাম মহারাজ দুইতিন হাত পিছাইয়া গিয়া বলিলেনঃ তোমরা জয়রামবাটী হতে এসেচ, তোমরা সোনা হয়ে গেছ—সোনা হয়ে গেছ! আমি কি তোমাদের প্রণাম নিতে পারি? জয় মা! জয় মা!! মায়ের টানে নিজেও তিনি একাধিক-বার জয়রামবাটী গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার এক শিষ্য তাঁহার হাত হইতে গৈরিক বস্ত্র নিয়া কাশীতে গিয়াছেন, বাবুরাম মহারাজ তখন কাশীতে। জনৈক সাধু বলিলেন, মা নিজে সন্ন্যাসী নন, তোমাকে কি করে সন্ন্যাস দেবেন? সঙ্গে সঙ্গে বাবুরাম মহারাজ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, মার দেওয়া গৈরিককে যদি সন্ন্যাস বলে স্বীকার না কর তো তোমাদের এই বিধির সন্ন্যাসও আমি মানি না।[২]

১। সম্বুদ্ধানন্দ-লিখিত।

২। শ্রীবাবুরাম তাঁহার শ্রীগুরুদেবের মত সহজ মানুষ ছিলেন। একদিন শ্রীমহারাজকে তিনি বলিয়াছিলেন, এস আমরা গেরুয়া ছেড়ে দি, এতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, আমরা সাধু। [প্রভবানন্দ-লিখিত]

গৌরীশানন্দ বলেন ঃ

জয়রামবাটী হইতে আমি ও জগদানন্দস্বামী তারকেশ্বর হইয়া মঠে ফিরিয়াছি (১৯১৬)। ঠাকুরের আরতি হইয়া গিয়াছে। উপরের বারান্দায় ঠাকুরের সাতজন সন্ন্যাসী সন্তান বসিয়াছিলেন ও মহারাজ আরাম কেদারায় বসিয়া শটকায় তামাক খাইতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তিনটি ছেলেকে চিঠি দিয়ে মার কাছে পাঠিয়েছিলুম, তিনি তাদের কৃপা করেচেন কি ? আমি বলিলাম,—আপনার চিঠি আমিই মাকে পড়ে শোনাই। চিঠি শুনে, সদ্য জ্বরমুক্ত হয়েচেন, দুর্বল শরীর, স্বগতভাবে বল্লেন,—ছেলে আমার বিদেশ থেকে শেষকালে এই জিনিস পাঠালে ? মহারাজ স্তব্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহার হাত হইতে শটকা খসিয়া পড়িল। সকলেই চুপচাপ। কয়েক মিনিট পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন ঃ ধন্য মা ! তিনি ঐ সব বিষ নিজে গ্রহণ করে আমাদের মতন সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখচেন ! তিনি ঐ বিষ গ্রহণ না করলে আমরা কবে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম। বলিয়াই দুই হাত তুলিয়া ভাবাবেগে বারবার মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

গুরুভাইদের সাহচর্যে

আনন্দময়বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংসারত্যাগী সন্তানেরা নিজেরাও আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। অনেকবার তাঁহারা 'প্রেমের বাজারে আনন্দমেলা' দেখিয়াছিলেন। যুগপৎ তপস্যা ও রঙ্গরসের খেলার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের ভাগবত জীবন। যখনই তাঁহারা অনেকগুলি গুরুভাই একত্র হইতেন, পূর্বানুভূত আনন্দমেলার ভাবটি তাঁহাদের ভিতর জাগিয়া উঠিত, তাঁহাদের হৃদয়স্থ, আনন্দের উৎসমুখটিই যেন খুলিয়া যাইত। পরস্পরের সাহচর্যে তাঁহারা উল্লাস বোধ করিতেন। কিছুটা মাত্রাধিক্য ঘটিলে সেই উল্লাসই আবার নৃত্যগীতের ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিত।

জিতেন্দ্র দত্ত একদিন মঠবাড়ীর উপরতলায়, গিয়া দেখেন, মহাপুরুষ, হরি মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ, তিনজন গুরুভাই, একটি ঘরের ভিতর হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন!

প্রভবানন্দ লিখিয়াছেন ঃ

আমার মনে পড়ে বেলুড় মঠের অছিগণের একটি অধিবেশনের কথা। মহারাজ (অধ্যক্ষ), স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ পুরাতন মন্দির ও মঠবাড়ীর মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন, এমন সময় স্বামী সারদানন্দ (সম্পাদক) উদ্বোধন হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুরামদা কোথায়? কেহ বলিল, উপরে ঠাকুরঘরে। সারদানন্দ ধীরপদে ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন। ঘরের এক কোণে প্রেমানন্দ গভীর ধ্যানে মগ্ন। সারদানন্দ ছিলেন বিশালবপু শক্তিমান পুরুষ, তিনি গুরুভাইয়ের স্পন্দনহীন ক্ষীণ দেহটি পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া নিলেন। নীচে আসিয়া যেমন তাঁহাকে কোল হইতে নামাইবেন, প্রেমানন্দ পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন ও উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন! সেই উল্লাস সকলকেই পাইয়া বসিল। মহারাজ মাঝখানে থাকিয়া এবং অন্যান্য গুরুভাইরা তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সমগ্র স্থানটি তাঁহাদের দিব্যভাবে স্পন্দিত হইতেছে। এইরূপে প্রায়

এক ঘণ্টা নাচিয়া ও গাহিয়া তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন। মনে হইতেছিল, তাঁহারা যেন বলিতেছিলেন,—যে যেখানে আছ এস, প্রেমভক্তি আস্বাদন কর, মুক্ত হও।[১]

বেলুড় মঠে একদিন মহারাজ খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতমুখ ধুইবার জন্য ঘটিতে জল রাখিয়া খুদুমণি কার্যান্তরে গিয়াছিলেন এমন সময় তিনি হঠাৎ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়েন। বাবুরাম মহারাজ ঘটী নিয়া তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে যাইতেই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, বাবুরামদা, তুমি কেন, তুমি কেন? তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া খুদুমণি ঘটী ছিনাইয়া নিলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, তোমার সেবা তো আমাদেরই করবার কথা, আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তোমার সেবা থেকে এরা আমাদের বঞ্চিত করেচে।

চায়ের টেবিলে মহারাজ বসিয়া আছেন, বাবুরাম মহারাজ একগাছি মালা হাতে করিয়া আসিলেন এবং 'মহারাজ, দেখ কেমন সুন্দর মালাটি!' বলিয়াই তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। তারপরে পরস্পর মুখনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দুই মহাপুরুষ অনেকক্ষণ অবধি স্থির নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরস্পরের মুখে তাঁহারা কি তখন নিজ নিজ ইষ্টমুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন?

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। প্রেমের গতি স্বভাবকুটিলা, ঠিক সাঁপের গতির মত—রসশাস্ত্র একথা বলেন। মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের মধ্যে কখন কখন মানের অভিনয়ও হইত। ঠাকুরের বাগানের একটি লাউ বাবুরাম মহারাজ 'জয়-মা-কালী'কে দিয়াছেন। জয়-মা-কালী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, অতি দরিদ্র, জয়-মা-কালী বলিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিত। লাউটি লইয়া যাইবার সময় মহারাজের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। বাবুরাম

১। **Vedant and the West** হইতে। ঘটনাটি ১৯১৫ সালের প্রথম দিকের—এইরূপ মুদ্রিত আছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন কাশীতে ছিলেন। ১৯১৭সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বেলুড় মঠে আসেন। ইহার পূর্বে ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে একবার আসিয়াছিলেন।

মহারাজকে উদ্দেশ করিয়া মহারাজ বলিলেন, সবাই যদি যাকে তাকে এমনিধারা দিতে থাকে, ঠাকুরের সেবা চলবে কেমন করে? সেকথা শুনিবামাত্র গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া বাবুরাম মহারাজ গেটের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু গেট পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। বলিয়াছিলেন,—ঠাকুর পথ আগলে দাঁড়িয়ে, গামছা-কাঁধে কোথায় যাচ্চ চাঁদ?—বলে, গামছাখানা আমার গলায় জড়িয়ে টেনে নিয়ে এলেন![1]

শ্রীবাবুরামের স্বভাবগত দানপ্রবৃত্তি কিছুটা সংযত করিবার জন্যই মহারাজ পূর্বোক্তরূপ মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। যেখানে সেখানে উৎসব করিতে যাইয়া ও নির্বিচারে যাহাকে তাহাকে প্রেমে কোল দিয়া প্রেমানন্দ নিজের পরমায়ুকে দ্রুত নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার এই বাড়াবাড়ির প্রতি কটাক্ষ করিয়াই মহারাজ বলিয়াছিলেন, তোমার এখনো একটু "ইয়ে" (অহং?) আছে। মঠের পশ্চিমদিকের বারান্দায় কথাটি বলিয়াই তিনি উপরতলায় চলিয়া গেলেন, আর তাঁহাকে শুনাইয়া বাবুরাম মহারাজ বেশ জোরের সহিত বলিলেন,—আমি সিদ্ধের সিদ্ধ, আমি নিত্যসিদ্ধ—আমি স্বামিজীর চেলা, স্বামিজী আমাকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঠাকুরের কথা শোনাতে বলেচেন।[2]

মহারাজ প্রায় আড়াই বৎসর বেলুড় মঠের বাহিরে থাকায় সাধুদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠিয়াছিল যে, বাবুরাম মহারাজের উপর রাগ করিয়াছেন

১। 'ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা' হইতে।

আর একবার বুড়োগোপালদার শরীর যাওয়ার পরেই, বাবুরাম মহারাজ কোন প্রাচীন সাধুর আচরণে ত্যক্তবিরক্ত হইয়া মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। ঠাকুরের গৃহস্থ পার্ষদ পূর্ণবাবু তখন বেলতলায় বসিয়াছিলেন, কহিলেন, বাবুরামদা, কোথায় যাচ্চ?—ঠাকুরকে কার কাছে রেখে যাচ্চ? তিনি সেই কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। গেটের কাছে গিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন ও ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি কি পূর্ণর কথায় ফিরেচি? ঠাকুর দুহাতে গেট আগলে দাঁড়িয়ে! [অশোক মহারাজ-কথিত]

২। জিতেন্দ্র দত্ত-লিখিত।

বলিয়াই তিনি মঠে আসিতেছেন না। তাঁহার এই রাগ বা অভিমানের কারণ কিছু বুঝিতে পারা যায় নাই। এক বৎসর আগে কাশীতে যাইয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সঙ্গে বেশ কিছুদিন বাস করিয়াও আসিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার মানভঞ্জন করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ কাশীতে ছুটিলেন, আর তিনিও বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ করিয়া বসিলেন! কাশী হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সঙ্গে গেলেন, এবং তথায় ত্রিরাত্র বাসের পর একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে লইয়া মঠে ফিরিলেন (২৫শে নভেম্বর, ১৯১৪)।

অনেকদিন পরে মহাপুরুষ বাহির হইতে মঠে আসিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোড়হাতে প্রতিনমস্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—আমি অতটা পারব না ভাই, আমি অতটা পারব না ভাই!

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া, স্বামিজীর মহাসমাধির পরে, হরি মহারাজ তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় বৃন্দাবনে চলিয়া যান। বাবুরাম মহারাজের প্রেমের টানে, কাশ্মীর-পরিভ্রমণের পরে, তিনি মঠে আসেন। মঠের নূতন সাধুদিগকে ও যুবক ভক্তগণকে বাবুরাম মহারাজ শাস্ত্রার্থদর্শী এই মহাপুরুষের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিতেন।

আলমোড়া হইতে হরি মহারাজ কাশীতে আসিয়াছেন (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৬), পায়ে বাত। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে লাল কাপড়ের একজোড়া চটি দান করিলেন, ঘরের মধ্যে বেড়াইবার জন্য। সেই চটি মাথায় করিয়া হরি মহারাজ নাচিতে লাগিলেন।

বাবুরাম মহারাজকে লিখিত হরি মহারাজের তিনখানি পত্রের অংশ-বিশেষ পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

৺কাশী

১০।২।১৪

প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ,...যখনই তোমার পত্র পাই ও পড়ি, কত যে আনন্দ লাভ করি তাহা কি জানাইব। মনে হইতেছে ছুটে গিয়ে তোমাদের নিকট জুড়াই, কিন্তু পোড়া শরীর সে সাধে বাদী।...তোমার সঙ্গে এখানে কি সুখেই দিন কাটিত।...তুমি কৃপা করিয়া তাঁহার কত কথাই না সে সময়ে হৃদয়ে উদয় করাইয়া দিতে ; আলোচনা করিয়া মনপ্রাণ শীতল হইয়া যাইত। প্রভু তোমা দ্বারা তাঁহার নামের মহিমা ঘোষণা করাইতেছেন—আমরা শুনিয়া ধন্য হইতেছি। ধন্য এ যুগ, ধন্য তাঁহার কৃপা, ধন্য তাঁহার নাম।...

দাস—শ্রীহরি

আলমোড়া

১২।১২।১৫

...ভালবাসার বড় জোর সন্দেহ নাই। লোকের জন্য কল্যাণ-কামনা, কিসে তারা শান্তি পাবে, আনন্দের সন্ধান পাবে—এ বাসনা যদি বন্ধনের হয় তা হলে প্রেমের বন্ধন। সে বন্ধনে ভববন্ধন-মোচন হয়ে লোক অমৃতত্ব লাভ করে ধন্য হয়। আশীর্বাদ করো আমরা যেন তার বিন্দুমাত্রেরও অধিকারী হতে পারি। আমার উপর কৃপাদৃষ্টি রেখো। অধিক আর কি বলব ?

আলমোড়া

১৪।৩।১৬

...ঢাকায় তোমায় একঘেয়ে বলে—এতে কি হবে। এবার ঢাকা খুলে গিয়ে সকলে জেনেছে তুমি এক ভিন্ন আর কিছু জান না। একজন লিখেছে, "শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের কাছে গেলে, পর থাকবার জো নেই, তিনি

আপনার করে নেবেনই নেবেন।"...প্রভু তো আপনার কর্ম আপনি করেন, তথাপি আধারবিশেষ দিয়ে উহা সম্পন্ন করেন—ইহা সিদ্ধান্তবাক্য।

ঠাকুরপূজা সমাপন করিয়া বাবুরাম মহারাজ বারান্দায় নামিয়া আসিয়া পায়চারি করিতেছেন; শরৎ মহারাজ মঠের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া, ভিজা গামছা পরিহিত অবস্থায় আসিতে আসিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। 'আরে, কর কী শরৎ', বলিয়া বাবুরাম মহারাজ নিজেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিপ্রণাম করিলেন।

শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেই বাবুরাম মহারাজ তাঁহার জন্য মৎস্যাদির বন্দোবস্ত করিতেন। একদিন আহারের সময় মাছের মুড়ার সামান্য অংশমাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া শরৎ মহারাজ প্রায় আস্ত মুড়াটিই বাবুরাম মহারাজের পাতে ফেলিয়া দিলেন ও বলিলেন, খাও বাবুরামদা, ঠাকুরের প্রসাদ—খেলে বৈষ্ণববংশ উদ্ধার হবে। 'তুমি ভাই, ভালবাস তাই দাও, কিন্তু আমি যে অত খেতে পারি না। এই বলিয়া, প্রসাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য কিয়দংশ নিজে খাইয়া বাবুরাম মহারাজও মুড়াটি অন্য একজনের পাতে তুলিয়া দিলেন।[১]

সেদিন ৺বিজয়া। মঠের পুরাতন ঘাটের নিকটে খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া শরৎ মহারাজ সাধু ও ভক্তগণের প্রণাম গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময় বাবুরাম মহারাজ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া নতশিরে তাঁহাকে প্রণাম করিবার উপক্রম করিলেন। শরৎ মহারাজ অমনি খপ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং দুইহাতে এমনভাবে শূন্যে উঠাইলেন যে, তাঁহার পদযুগল শরৎ মহারাজের কপালে ঠেকিয়া গেল। 'কেমন, এবার হয়েচে তো?' শরৎ মহারাজ কহিলেন। বাবুরাম মহারাজ যুক্তকরে নমস্কার করিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা। মঠে গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে বাবুরাম মহারাজ যেন কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে একটি নৌকা

১। রামানন্দ-কথিত।

আসিয়া ঘাটে ভিড়িল ; সেই নৌকা হইতে শরৎ মহারাজ অবতরণ করিলেন দেখিয়া তাঁহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরৎ মহারাজ গঙ্গাজলে আচমন করিলেন এবং ঘাটে উপবিষ্ট বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া গণ্ডদ্বয় চুম্বন করিলেন।[১]

ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া শশী মহারাজ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন ও উদ্বোধনে আছেন। মাঝে মাঝে আসিয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। একদিন তিনি সকালবেলা আসিয়া সেবকদিগকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কোন কথায় শশী মহারাজ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বাবুরাম মহারাজ চলিয়া গেলে শশী মহারাজ গম্ভীর হইয়া শুইয়া রহিলেন। কোন কথা বলেন না, কিছু আহারও করেন না। শেষে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেবকদের পীড়াপীড়িতে বলিলেন, যা, বাবুরাম মহারাজকে ডেকে আন। খবর পাইয়া, বসু-ভবন হইতে বাবুরাম মহারাজ ব্যস্ত হইয়া আসিলে শশী মহারাজ তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'কী হয়েছে ভাই, বল না?' বারবার প্রশ্ন করায় উত্তর দিলেন, আমার ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েচে, আমার মুখে লাথি মার। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন,—শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েচে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, যদি আর কেউ একথা বলতেন তো কতকটা মেনে নিতে পারতুম। কিন্তু শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস—এ যে কল্পনাতীত! শশী মহারাজ গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—বাবুরাম মহারাজ, ছেলেদের ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু তুমি যে কী বস্তু তা ঠাকুর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েচেন। সেই তোমাকেই যখন কটু কথা বলতে পারলুম, তখন ঠাকুরে অবিশ্বাসের বাকি আর কী রইল? বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন,—কই, তুমি তো আমায় কোন কটু কথা বল নি। তথাপি বলচি, যদি তোমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে, আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করচি। ভাই, তুমি খাও, শরীর যে একেবারে

১। ওঁকারেশ্বরানন্দ-লিখিত।

ভেঙ্গে পড়বে। তখন শশী মহারাজ কহিলেন, যদি সত্যি ক্ষমা করে থাক, তবে প্রসাদ করে দাও। থালায় করিয়া আনিত প্রত্যেকটি ফলের অর্ধেক খাইয়া বাবুরাম মহারাজ বাকিটা শশী মহারাজকে দিতে লাগিলেন, আর তিনিও সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী সেবক[১] বলেন,—বাবুরাম মহারাজের এমন রূপ পূর্বে আর কখনো দেখি নি, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে তপ্ত কাঞ্চনের আভা ফুটে বেরুচ্ছিল—তিনি যেন আগেকার মানুষটিই নন, যেন দেবলোকের কোন এক দেবতা!

মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের প্রতি স্বামী নির্মলানন্দ এতই ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁহাদের জীবৎকালেই বাঙ্গালোর মঠের ঠাকুরঘরে তাঁহাদের প্রতিকৃতি রাখিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৯১৪, দুর্গাপূজার সময় তিনি ত্রিবাঙ্কুরের দুইজন ভক্তকে[২] সঙ্গে নিয়া বেলুড় মঠে আসেন। দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন ভক্তগণের অনেকেই তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবন গঠনের প্রেরণা পাইয়াছিলেন স্বামী নির্মলানন্দের কাছে, আর সেইজন্যই তাঁহারা তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত দুইজন নিম্নোক্ত ঘটনা দুইটি প্রত্যক্ষ করেন।

৺বিজয়ার দিন গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা নিরঞ্জন করিবার পর মঠের সাধুরা, বাবুরাম মহারাজের প্রস্তাবে, স্বামী নির্মলানন্দকে শিব সাজাইলেন। তিনি শিব সাজিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে বাবুরাম মহারাজ স্বহস্তে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিলেন, আর প্রাচীন ও নবীন সাধুরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আনন্দময় শিবনৃত্যে মাতিয়া গেলেন।

নির্মলানন্দ বিদায় গ্রহণ করিবেন, সজল নয়নে বাবুরাম মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে উভয়ের মধ্যে দুইএকটি প্রীতিসূচক কথার বিনিময় হইল ও নির্মলানন্দ পুনরায় তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

১। অশোক মহারাজ।

২। সি দামোদার ও সি মধুরম্ (অম্বানন্দ) উভয়েই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য।

করিলেন। এইরূপে একই ব্যাপার পুনঃপুনঃ সংঘটিত হইতে লাগিল, একজন যেন অন্যজনকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছেন না। ষষ্ঠবার প্রণামান্তে নির্মলানন্দজী একপ্রকার জোর করিয়াই চলিয়া আসিলেন। তখন কে জানিত যে ইহজীবনে ইহাই তাঁহাদের পরস্পর শেষ চাক্ষুষ দেখা!

স্বে মহিম্নি

পূর্ববঙ্গে প্রচারকার্য বা প্রেমবিতরণ সম্পূর্ণ করিয়া প্রেমানন্দ মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন জুন মাসের মাঝামাঝি (১৯১৭)। মঠে ফিরিয়া তিনি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার মহাসমাধি পর্যন্ত বৎসরাধিক কালের মধ্যে তিনি আর একবারও তাঁহার পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। চিকিৎসকেরা তাঁহার কালাজ্বর হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

চিকিৎসা ও সেবাযত্নের গুণে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া সকলে আশান্বিত হইলেন। তাঁহাকে অন্নপথ্য দেওয়া হইল, এবং বর্ষাকালে মঠের জলবায়ু প্রায়শঃ অস্বাস্থ্যকর হয় বলিয়া তাঁহাকে উদ্বোধনে স্থানান্তরিত করা হইল। উদ্বোধনে আসিবার কয়েকদিন পরেই তিনি আবার জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দিল।

রোগের যন্ত্রণায় একদিন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—আর কেন, এবার গেলে হয়! পূজনীয়া যোগীন-মা সেই কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—অমন কথা বলতে নেই। তোমরা দেহ-মন-প্রাণ সর্বস্ব ঠাকুরকে দিয়েচ, নিজের বলতে কিছু রাখ নি, তবে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কী করে নিজের বলে প্রকাশ করচ? বাবুরাম মহারাজ হাত জোড় করিয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ যোগীন-মা, আপনি ঠিক বলেচেন, আমার বড়ই অন্যায় হয়েচে। আর কখনও এমন কথা মুখে আনব না।

১৫ই সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হইতে তিনি কোনও ভক্তকে লিখিয়াছেন: 'আমার দেহ অসুস্থ থাকায় এখানে দুচার মাস আছি। এখন ভাল।' ২৪শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছেন: 'আমার এই কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা ছিল না। এ যেন দৈব ব্যাপার। আমার মনে হয়, ভগবান ভক্তের প্রাণের প্রার্থনা শুনেন। তোমাদের মত অনেক ভক্ত আমার জন্য প্রভুর নিকট কাতরে ক্রন্দন করিয়াছিল বোধ হয়। দুচার দিন হইল আমি নীচে নামিতে সুরু করিয়াছি। গতকল্য গাড়ী করিয়া একটু ঘুরিয়া আসিয়াছিলাম। ক্রমশঃ সুস্থ বোধ করিতেছি, তবে এখনও অত্যন্ত দুর্বল।'

অতঃপর তিনি বসু-ভবনে চলিয়া যান। সেখান হইতে ৫ই অক্টোবর লিখিলেন: 'পুরীতে শ্রীযুক্ত হরি মহারাজের খুবই অসুখ যাচ্ছে। তাঁর আরোগ্য লাভের জন্য আপনারা সকলে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন। ...আমরা একরূপ মন্দ নাই।'

২০শে অক্টোবর, শনিবার। শান্তিরামবাবু আসিয়া খবর দিলেন, তাঁহাদের মায়ের শরীর খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সেবক সতীশকে[১] বলিলেন, তুই তো সেবাশ্রমে অনেক রোগী দেখেচিস, দেখ্ তো গিয়ে বুড়ী আজই যাবেন নাকি!

সত্যানন্দ বলেন:

আমি তখন শান্তিরামবাবুর সঙ্গে গিয়ে বৃদ্ধার হাত দেখলুম। নাড়ী প্রায় ছেড়ে গেছে। শান্তিরামবাবু খাটিয়া আনিয়ে তাঁকে গঙ্গায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। আমি শান্তিরামবাবু, হরেরামবাবু, রামবাবু প্রভৃতি খাটিয়া বয়ে নিয়ে গেলাম। গঙ্গার ভিতর খাটিয়া নামিয়ে জল থেকে এক ফুট উঁচুতে রাখা হল। গঙ্গায় এসেই কিন্তু বৃদ্ধা বেশ ভালভাবে কথা

১। বিপ্লবী দলের অন্যতম নায়ক সতীশ (সত্যানন্দ) বাবুরাম মহারাজের প্রেরণায় মঠে যোগদান করেন এবং ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মশক্তির গুণে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। মঠের সকল কাজে তিনি বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন, অসুখের সময় আপ্রাণ সেবায় পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন।

বলতে, আর জপের মালা হাতে নিয়ে জপ করতে লাগলেন। নিজ হাতে গঙ্গাজল তুলে মাথায় দিলেন। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা কাটল। শান্তিরাম-বাবু ব্যস্ত হয়ে আমাকে বল্লেন, এখন তো দেখচি ভালর দিকে যাচ্চেন! ভাল হলেও এঁকে এখন বাড়ী নিয়ে যাব না, দেখি গঙ্গাযাত্রীর ঘরখানি খালি আছে কিনা। হরেরাম দেখে এসে বল্লেন, খালি আছে। বৃদ্ধা তখনই তিনবার 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন! রাত্রি তখন বারোটা।

এই সময়ে কিছুটা ভাল থাকায় বাবুরাম মহারাজ দুর্গাপূজার তিন দিন (২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে অক্টোবর) নৌকায় করিয়া মঠে গিয়াছিলেন। কিছুদিন একটু ভাল থাকে, আবার খারাপ হয়, এইভাবে দীর্ঘকাল চলিয়া তাঁহার শরীর ক্রমশঃ কঙ্কালসারে পরিণত হইল ও দিনে দুইবার করিয়া জ্বর হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা জলবায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন।

তাঁহাকে দেওঘরে আনয়ন করা হইল। সঙ্গে আসিলেন তিনজন সেবক— সতীশ, মতিলাল (মহাদেবানন্দ) ও ছোট কানাই (অনন্তানন্দ); আর রামবাবু আসিলেন তাঁহাদের সকলের তত্ত্বাবধায়ক ও রসদ্দার হইয়া। দেওঘর ষ্টেশনের সন্নিকটে এক বৃহৎ বাড়ীতে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

দেওঘরে আসিবার পূর্বে, জনৈক সাধু বসু-ভবনে বাবুরাম মহারাজকে দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি মঠে চলুন, সেখানে আমরা আপনার সেবা করব। তিনি উত্তর দেন,—না, মঠে আর যাব না, মঠে কেউ চায় না। ঠাকুরের কাজ যা করবার ছিল, শেষ হয়ে গেছে।[১]

দেওঘর হইতে ২৯শে এপ্রিল (১৯১৮) তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'আমার শরীর এখানে এসে কয়দিন প্রথম প্রথম ভালই ছিল, তারপর প্রায় মাসাধিক শরীরের অবস্থা ভাল যাইতেছে না।...প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় জ্বর হয়। কবিরাজী ঔষধ বন্ধ করিয়া ডাক্তারি ঔষধ কয়েকদিন হয় খাইতেছি, ইহাতে পেটের অসুখটা কম আছে এবং জ্বরও বোধ হয় আজকাল হয় নাই।'

১। হরানন্দ-কথিত।

২০শে মে লিখিয়াছেন : 'আমার ইতিমধ্যে পেট খুব খারাপ হইয়াছিল, আজকাল একটু ভাল আছি।'

দেওঘরে আসিয়া, শরীরের অবস্থা যাহাই হউক, বাবুরাম মহারাজ এক বিষয়ে স্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, তিনি আবার নিজের ইচ্ছামত ভক্তসেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। রোজই বেলা এগারটার সময় সেবকদের একজনকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিতেন ও বলিতেন, দেখবি কোন ভক্ত এল কিনা, এলেই ডেকে নিয়ে আসবি। অন্য দুইজনকে বলিতেন,—ষ্টেশন থেকে সে ফিরে এলে তোরা খাবি। একটা হাঁড়িতে গরম জল বসিয়ে রাখ্, যদি কেউ এসে যায় তা হলে চারটি চাল চাপিয়ে দিবি।

একদিনের ঘটনা। বাগবাজারের কিরণচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার দাদা হরিপদ দত্ত সপরিবার তাঁহাদের মধুপুরের বাসা হইতে দেওঘর আসিয়াছেন, বাবা বৈদ্যনাথকে পূজা দিয়া সেইদিনই ফিরিবেন। কিরণবাবু খবর নিতে আসিলে বাবুরাম মহারাজ তাঁহাদের সকলকে প্রসাদ পাইয়া যাইতে বলিলেন। ছোট বড় মিলিয়া সংখ্যায় তাঁহারা ছিলেন সতের জন। অসময়ে এত লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা কষ্টসাধ্য, ইহাতে আশ্রমপীড়া ঘটিবে, আশ্রমপীড়া দিয়া তাঁহারা সুখী হইতে পারিবেন না, ইত্যাদি যত কথা কিরণবাবু বলেন, তিনি সকল কথাই উড়াইয়া দেন। কিরণবাবুকে প্রসাদ পাওয়ার আমন্ত্রণ স্বীকার করিতেই হইল। মন্দির হইতে তাঁহাদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ খবর নিতে লোক পাঠাইলেন, এবং ক্ষীণ শরীরে সেবকের সাহায্যে বারান্দায় আসিয়া স্বয়ং ভক্তসেবার তত্ত্বাবধান করিলেন।[১]

'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক, একে তিন' ইত্যাদি কথা বলিয়া সেবকগণের কাছে বাবুরাম মহারাজ ভক্তসেবার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছিলেন, নিজেদের অতীত জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িতেই কহিলেন : একবার আমরা চারজন—স্বামিজী, শরৎ মহারাজ, শশী মহারাজ ও আমি—গঙ্গার ধার দিয়ে মুর্শিদাবাদ যাব বলে বেরুলুম। প্রথমদিন বৈকালে কোন খাবার

১। ব্রহ্মগোপাল দত্ত-কথিত।

জুটিল না। পরদিন সকালে আমরা চাল ডাল ইত্যাদি জোগাড় করে একটা গঙ্গাযাত্রীর ঘরে রান্নাবান্না করে বসেচি। স্বামিজী একটি হিন্দুস্থানী সাধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে বল্লেন, দেখ্ বাবুরাম, আমার খাবার এই সাধুটিকে দে—দুইদিন খায় নি। সাধুটি খাইয়ে লোক, তিন থাবড়ায় সব খেয়ে ফেল্লে। তখন শশী মহারাজ বল্লেন, আমারটাও দাও। শরৎ মহারাজ বল্লেন, আমারটা তোমারটা কী, যা খেতে পারে তাই দাও, অবশেষে যা থাকে চারজনে খাওয়া যাবে। স্বামিজী বল্লেন, আমি গঙ্গায় স্নান সেরে নমস্কার কচ্ছিলুম, সামনে এই সাধুটিকে দেখলুম আর ওব অভুক্ত অবস্থার কথা শুনলুম। তাই তো ওকে নিয়ে এলুম।

দেওঘরে বাবুরাম মহারাজ যে বাড়ীতে ছিলেন তাহার কাছেই এক যক্ষ্মারোগী তাহার স্ত্রী ও ভাইকে নিয়া বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলা ভাই আসিয়া বলিল,—রোগীর এখন সঙ্কট অবস্থা, বোধ হয় শীঘ্রই শরীর যাবে। আমি ভয়ানক বিপদে পড়েচি, আপনাদের একটু সাহায্য চাই। বাবুরাম মহারাজ তখনই ছোট কানাইকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই এখুনি যা, সৌরেন ডাক্তারকে দেখিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করবি। তিনচারি ঘণ্টা অতীত হইলেও কানাই আসিয়া কোন খবর দিলেন না দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া মতিলালকে বলিলেন, তুইও যা, বেচারী কী বিপদে পড়েচে বুঝতে পাচ্চি না। খানিক পরে রামবাবুকে বলিলেন, আজ আমার শরীরটা মন্দ নাই, সতীশও যাক্—আমার আজ কাকেও দরকার হবে না। রামবাবু হাত জোড় করিয়া কহিলেন, সতীশকে ছাড়া যায় না, আপনার এই অবস্থা—উঠে বসতে পারেন না। এই সময় মতিলাল আসিয়া জানাইলেন, রোগী দেহত্যাগ করিয়াছে, সৌরেন ডাক্তার ও কানাই দুইজনে মিলিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বাবুরাম মহারাজ ও সতীশ একই চৌকীর উপরে ভিন্ন বিছানায় শয়ন করিতেন। কোন প্রয়োজন হইলেই তিনি সতীশের গায়ে হাত দিতেন ও সতীশ উঠিয়া পড়িতেন। এই সময়ে তিনি ঘুষঘুষে কাশিতে কষ্ট পাইতেছিলেন,

সেবকেরা রাত্রি বারোটা, একটা বা দুইটা পর্যন্ত তাঁহার গলায় নুনের সেক দিতেন। একদিন রাত্রি দুইটার পর জাগিয়া সতীশ দেখেন, তিনি একাকী উঠিয়া প্রস্রাব করিতে নীচে নামিয়াছেন। তজ্জন্য অনুযোগ করায়, চৌকীখানা খুবই উঁচু ছিল, কহিলেন, দেখ্ বাবা, তুই এইমাত্র ঘুমিয়েচিস, তোকে ওঠানো আমার অসাধ্য। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখে ধারা বহিতে লাগিল।

রামবাবুর আত্মীয় যোগেশ ঘোষ একদিন দেওঘরের সাধু বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারী অনেক দৈব ঔষধ জানিতেন, তিনি বাবুরাম মহারাজকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—মহাত্মা! সাধুর যদি শরীরের দিকে মন না থাকে তো শরীর থাকে না। আপনি দয়া করে শরীরটার উপর একটু নজর দিলেই শরীর সেরে যাবে। বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন,—এই শরীরের উপর আমার এখন একটুও মমতা নাই, এই শরীরটাকে একটা পচা কুমড়োর মত মনে হচ্চে, এর দিকে কিছুতেই মন দিতে পারি না। ব্রহ্মচারী ঔষধ দিলেন না, যাওয়ার সময় সেবকদিগকে বলিলেন, এ শরীর থাকবে না, শীঘ্রই যাবে।

ভারতবর্ষে এই সময়ে এনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। সৌরেনবাবু বাবুরাম মহারাজের দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া হচ্চে, ওঁকে যত শীঘ্র পারা যায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন,—ডাক্তারবাবু, শরীর তো আর থাকবে না, কেন আমাকে নিয়ে টানাটানি করেন? আমি এখানে বেশ শান্তিতে আছি, কলকাতা গেলে শান্তিতে মরতে পারব না। সেবকেরা ভয় পাইয়া মঠে তার করিলেন, তার পাইয়াই মহাপুরুষ ও শান্তিরামবাবু আসিলেন।

মহাপুরুষকে দেখিয়া জোড়হাতে নমস্কার করিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, শরীর তো যাবেই, কেন আপনারা কষ্ট করে এসেচেন আর আমাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কচ্চেন? মহাপুরুষ কহিলেন, তুমি সেরে যাবে, ওখানে ভাল ভাল ডাক্তার দেখালেই উপকার হবে। গাড়ী রিজার্ভ করা হইল, পরদিন যাত্রা করিতে হইবে, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ কেবলই বলিতেছেন,

'আমি যাব না।' জিনিসপত্র গাড়ীতে উঠিয়াছে ও গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়াছে, তখনও বলিতেছেন, 'আমি যাব না।' সতীশ তখন তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, চলুন, আমরা সবাই আছি। সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তুই বেটা অশান্তির কারণ হবি, তা আমি বুঝতে পারি নি। যাই হোক, তোর কথা ফেলতে পারব না—চল্!

২৭শে জুন, শনিবার। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষকে খবর দেওয়া হইল। বিপিনবাবু দেখিয়াই বলিলেন, এ তো সব শেষ করে এনেচ, আমার আর কিছুই বলার নাই।

বাবুরাম মহারাজের দেহের অবস্থা দেখিয়া মহারাজ বিচলিত হইলেন। ভক্তেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইয়া শুনিলেন, তিনি বলিতেছেন: এখন নারায়ণ বৈদ্য, গঙ্গাবারি ঔষধ! বাবুরামদাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছিলাম, ওঁকে প্রেসিডেণ্ট করে আমি অবসর নেব, তা আর হল না!

বসু-ভবনের উপরের বড় হলঘরে বাবুরাম মহারাজকে আনিয়া রাখা হইয়াছে। উহার সংলগ্ন পশ্চিম পাশের ছোট ঘরটিতে আছেন মহারাজ। আর নীচেকার একটি ঘরে আছেন হরি মহারাজ। পুরীতে হরি মহারাজের পায়ে অনেকগুলি অস্ত্রোপচার হইয়াছিল, এখনও চলাফেরা করিতে পারেন না। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন।

একখানি চেয়ারে বসাইয়া হরি মহারাজকে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। চেয়ার হইতে নামিয়া, বাবুরাম মহারাজের পাশে বসিয়া তিনি তাঁহার হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কেহই কোন কথা কহিলেন না। পরমহংসেরা মুখের ভাষায় পরস্পর ভাববিনিময় করেন না, করিবার প্রয়োজন হয় না; ইঙ্গিতে ইসারায় প্রকাশিত তাঁহাদের মৌনভাষাও অপরে বুঝিতে পারে না। বাবুরাম মহারাজ এই কথা বলিতেন। সকলে দেখিল, উভয়েরই চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু মুক্তাশুভ্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

তারপর দিন বাবুরাম মহারাজ মঠ হইতে ব্রহ্মচারী জ্ঞানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে অতিক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, জ্ঞান, একটা কাজ করতে পারবি ? তাঁহার মুখের কাছে কান রাখিয়া জ্ঞান মহারাজ উত্তর দিলেন, কী কাজ আজ্ঞা করুন। 'মঠে ভক্তসেবা।' 'তা পারব।' 'খেয়াল রাখিস, ভক্তের যেন কোনরূপ অবজ্ঞা না হয়।' ইহাই তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শেষ বাণী।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫ (৩০শে জুলাই, ১৯১৮), মঙ্গলবার। সকাল হইতেই বাবুরাম মহারাজের দেহের অস্বস্তি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকেন। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে নিজের এক সেবককে স্তবপাঠে নিযুক্ত করিয়া মহারাজ বিমর্ষগম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে থাকেন। একবার নিজের ঘর পর্যন্ত যান, আবার হলঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়ান, এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে থাকে। হঠাৎ একখানা ঠাকুরের ফটো লইয়া আসিয়া ও বাবুরাম মহারাজের কাছে বসিয়া তিনি বলিয়া উঠেন, 'বাবুরামদা, ঠাকুরকে দেখ।' বাবুরাম দেখিলেন কিনা বুঝা গেল না।

দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল। নেপাল ও সতীশ বাবুরাম মহারাজের পায়ের দিকে দুই পাশে বসিয়া। সতীশ মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল তাঁহার মুখে দিতেছেন। নিজের মুখে কাপড় চাপা দিয়া মহারাজ একবার করিয়া আসিতেছেন, আর দেখিয়াই চলিয়া যাইতেছেন কাঁদিতে কাঁদিতে। আপন মনে বলিতেছেন,—এবার আর শরীর রাখতে পারব না। স্বামিজী চলে গেলেন, বাবুরামদাকে দেখে শরীর রেখেছিলুম, এবার আর নয়। পরক্ষণেই বাবুরাম মহারাজের কানের কাছে মুখ নিয়া খুব জোরে বলিয়া উঠিলেন,—বাবুরামদা, বাবুরামদা, ঠাকুরকে মনে আছে ? বাবুরাম মহারাজ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়ালে লম্বিত ঠাকুরের তৈলচিত্রের দিকে তাকাইলেন। পরক্ষণেই আবার চক্ষু বুজিয়া আসিল, আর দুই চক্ষুর বাহিরের দুই কোণ দিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন। ঘড়িতে তখন চারিটা বাজিয়া চৌদ্দ মিনিট অতিক্রান্ত হইয়াছে।

'চল মুসাফির বাঁধো গাঁটরিয়া বহুদূর যানা হোয়েগা' এই কথাগুলি বলিতে বলিতে মহারাজ তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিলেন ও নিজের ঘরে গিয়া শিশুর মত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ধীরতার প্রতিমূর্তি শরৎ মহারাজ ততক্ষণ তাঁহাকে বাহুঃবেষ্টনে রাখিয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিতেছিলেন।

উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ পৌঁছিল। সেদিন সকাল হইতেই মা কাঁদিয়া আকুল হইতেছিলেন তাঁহার বাবুরামকে স্মরণ করিয়া। স্ত্রীভক্তদের কাছে তিনি কেবল তাঁহার বাবুরামের কথাই বলিতে লাগিলেন। বলিয়াছিলেন: 'বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল।' 'মঠের শক্তি ভক্তি মুক্তি—সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।' ওঁ শম্।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে

স্বামী নির্লে'পানন্দ: "প্রেমানন্দ-প্রেমকথার ভাষা সুন্দর সাবলীল স্বচ্ছ অনুবদ্য। মহাভাবময় নির্বিকল্পসম্বিৎময় ব্যক্তিত্ব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

P. Seshadri B.A., M.L : "Premananda-Premkatha, so very kindly and lovingly sent by you, reached me yesterday, giving me intense joy. I began to read at once and was led on and on by the excellence and exquisiteness of the treatment till I came to the last sentence. Many a time I felt so elevated and exalted that I was blessed to read such a work ; often I was so overpowered that tears rushed to the eyes. The concluding portion cannot be read by any one without deep emotion. Every sentence of the book is choice and charming. ...

"Your method of writing a biograply is unique and seems the best. You let others speak their experiences in their own words and you remain in the background.···The style is also so simple, clear and vivid. The meaning is revealed at once and a picture is seen in the mind. I shall read it again and again and translate it to Bhaktas and those interested. Sri Sri Thakur has made you give devotees so much of nector. Blessed, blessed are you."